

সানন্দা

১৫ অগস্ট ২০২২

রান্নাঘর
শেষ বর্ষার স্ন্যাক্স সেলিব্রেশন

বিশেষ রচনা
বাংলাদেশের পদ্মা সেতু

বেড়ানো
শিকাগো ভ্রমণ
ছোটা মাঙ্গোয়ার রূপকথা

মুখোমুখি
অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নারী

সানন্দা
প্রচ্ছদকাহিনি

ক্ষমতায়ন শুধু নয়, স্বাধীনতার ৭৫ বছরে মেয়েদের স্বাধীনতা কোথায় দাঁড়িয়ে? সাহিত্যে, শিল্পে, বিনোদনে, পারফর্মিং আর্টসে, কর্পোরেট সেক্টরে এবং সমাজ-সম্পর্কে তাঁদের অবস্থান ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করল সানন্দা। সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রের একঝাঁক মহিলা অনুপ্রেরণার সাক্ষাৎকার।

সানন্দা সূচিপত্র

৩৭ বর্ষ ১ সংখ্যা। ১৫ অগস্ট ২০২২। ২৯ শ্রাবণ ১৪২৯



প্রচ্ছদকাহিনি ১
সম্পর্ক, সমাজ ও নারী

এই সমাজের চোখে আজও নারীদের জীবনে বিয়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও অধ্যায় নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদিও বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানেও বিস্তর বদল এসেছে। সেই সব পরিবর্তন, বদলে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝার চেষ্টা করল 'সানন্দা'।



রান্নাঘর
মাছ, মিষ্টি & more

বর্ষার সন্ধে মানেই ধূমায়িত চায়ের পেয়ালায় তৃপ্তির চুমুক। আর সেই তৃপ্তিই আরও বেড়ে যায়, যদি চায়ের কাপের পাশে থাকে যোগ্য মুখরোচক। চিরন্তন চপ, কাটলেটের বাইরে দেশি-বিদেশি তেমনই কিছু লোভনীয় মুখরোচকের সন্ধান রইল এবার।

৩ চিঠিপত্তর
৩ সুদোকু
১০ প্রচ্ছদকাহিনি ২
১৮ প্রচ্ছদকাহিনি ৩
২২ প্রচ্ছদকাহিনি ৪
সৌন্দর্য থেকে ফ্যাশনের পরিসরে কতটা স্বাধীন হয়েছেন আধুনিক নারীরা? নিজের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, পছন্দ অপছন্দকে সত্যিই কি গুরুত্ব দিতে পারছেন? বিশেষ আলোচনা।
২৮ প্রচ্ছদকাহিনি ৫
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে আধুনিক নারীর ফ্যাশনের সংজ্ঞা। নারীর ক্ষমতায়নের উপর কতটা প্রভাব ফেলেছে পোশাক? বিশেষ ফ্যাশনফিচার।
৩৪ প্রচ্ছদকাহিনি ৬
এদেশের রাজনীতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে একাধিক নারীর নাম। সেই সব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করল 'সানন্দা'। একটি আলোচনা।
৪০ প্রচ্ছদকাহিনি ৭
বিনোদনে আজ অনেকটাই বদলেছে নারীদের চিত্রায়ণের ধরন। মেনস্ট্রিম সিনেমা থেকে হাল আমলের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, সর্বত্রই ছক ভাঙা নারীচরিত্রদের জয়জয়কার। এই বিবর্তনের শুরু কোথায়? হিন্দি, বাংলা, সিরিয়াল থেকে ওটিটি, নারীচরিত্রের বিবর্তন ফিরে দেখল 'সানন্দা'।
৪৬ প্রচ্ছদকাহিনি ৮
পারফর্মিং আর্টসের ইতিহাসের উজ্জ্বল নারীব্যক্তিত্বরা
৫২ প্রচ্ছদকাহিনি ৯
সাহিত্যের ছক-ভাঙা নারীরা
৫৭ সেক্সুয়াল
৫৮পেরেন্টিং
৬০ অসাধারণ ১
বিশিষ্ট ফিল্মমেকার পুতুল মাহমুদের সাক্ষাৎকার
৬২ অসাধারণ ২
৬৪ অসাধারণ ৩
৬৬ অসাধারণ ৪
৬৮ অসাধারণ ৫
৭০ অসাধারণ ৬
৭১ অসাধারণ ৭
৮০ বিশেষ রচনা
পদ্মাসেতু উদ্বোধনে দুই বাংলার আত্মিক উদ্‌যাপন
৮৪ মুখোমুখি
অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথন
৮৭ পরিচর্যা
৮৮ ধারাবাহিক
শ্রীমতী
তাপস রায়
৯৪ সৌন্দর্য
স্লো বিউটি রেজিম
৯৮ শেফস স্পেশ্যাল
বাড়িতেই বানান রেস্তরাঁর মতো কাবাব
১০০ বেড়ানো ১
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার শিকাগো
১০৮ ফ্যাশন ১
১১০ বেড়ানো ২
ছোটা মাঙ্গোয়ার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা
১১৮ ফ্যাশন ২
১১৯ নগরদর্পণে
১২০ বিনোদন
১২০ রিভিউ
১২১ বই
১২১ কেনাকাটা

মডেল: স্নেহা
মেক-আপ: অভিজিৎ চন্দ
ফোন: ৯৮৩০৬৮৮৮৯০
পোশাক ও স্টাইলিং: জ্যোতি খৈতান
ফোন: ৭৪৩৯৬৪৮৫৯৪
ছবি: সোমনাথ রায়

সম্পাদক: পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত
এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

15th August 2022, 37 years 1 Issue.



Be Yourself

সানন্দা-র ৩০ জুলাই সংখ্যাটি পড়ে খুব ভাল লাগল। প্রচ্ছদকাহিনিটি পড়ে নতুন করে নিজেকে খুঁজে পেলাম। সত্যি, আমাদের পরিবার ও সমাজ আমাদের মেয়েদের কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করে। সেই আশা পূরণ করতে, পরিবারের সকলকে ভাল রাখতে নিজের ভাললাগা, মন্দলাগা সব ভুলে সকলকে ভাল রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু নিজেকে ভাল রাখার দায়িত্ব নিজেরই। কারণ নিজে ভাল থাকলে, তবেই আমরা চারপাশের সকলকে ভাল রাখতে পারব। নিজেকে নতুনভাবে দেখার, জানার পথ দেখানোর জন্য 'সানন্দা'-কে অনেক ধন্যবাদ।

অঙ্কিতা সরকার, টলিগঞ্জ
ইমেল মারফত

সুন্দর থাকুন নিজের শর্তে

'সানন্দা' পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় আমরা অনেক নতুন নতুন বিষয়ে জানতে পারি। ৩০ জুলাই 'সানন্দা' সংখ্যার 'সুন্দর থাকুন নিজের শর্তে' প্রচ্ছদকাহিনিটি আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার কমপ্লেকশন ডার্ক, এই নিয়ে অনেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম কথা বলেছে। কালো রং ফরসা করার হরেক রকম উপায়ও বলেছে। এমন একটা সময় ছিল যখন আমি এইরকম কিছু কিছু উপায়ের সাহায্যও নিয়েছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, কোনও লাভ হয়নি। আপনাদের এই লেখা নিজেকে অন্যরকমভাবে দেখতে শেখাল আমাকে। সত্যিই খুব উপকৃত হলাম।

সুমনা সেন, নদিয়া
ইমেল মারফত

দুই বাংলার হেঁশেল থেকে...

'সানন্দা'-র ৩০ জুলাই সংখ্যায় রান্নাঘর বিভাগে যে রেসিপিগুলো দেওয়া হয়েছে, সবই দারুণ। বাঙাল ঘটির লড়াই চিরন্তন। সে রান্নায় হোক অথবা সংস্কৃতিতে। এই তর্ক-বিতর্ক অন্তহীন। তবে দুই বাংলার রান্নাঘর থেকে যে রেসিপিগুলো আপনারা তুলে ধরেছেন সেগুলো প্রশংসনীয়। 'আম তেলের ইলিশ লাউপাতা ভাতে' রেসিপিটি খুব ভাল লাগল। একদমই অন্যরকম। ইলিশ মাছের বিভিন্ন রকমের রেসিপি আমরা এর আগে পেয়েছি। তবে এটা একেবারেই ভিন্ন স্বাদের। এইরকম আরও নতুন রেসিপির অপেক্ষায় রইলাম।

মহুয়া মুখোপাধ্যায়, বারাসত
ইমেল মারফত

গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণ

সানন্দা-য় গল্প এবং উপন্যাস মনোনয়নের জন্য পাঠাতে চাইলে হাতে লিখে কিংবা প্রিন্টআউট করে আমাদের দফতরে পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠানো গল্প সানন্দা-র প্রিন্ট সংস্করণের জন্য গ্রাহ্য করা হবে না। অবশ্যই নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর যেন লেখা থাকে। গল্প বা উপন্যাস মনোনীত হলে আমরা ওয়ার্ড ফাইলটি চেয়ে নেব। গল্পের শব্দসংখ্যা ২৫০০ থেকে ৩০০০।

ঠিকানা:
সানন্দা গল্প বিভাগ,
এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১

যাঁরা সানন্দা-র ওয়েবসাইটের জন্য গল্প পাঠাবেন, তাঁরা ১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প মেল করবেন, হার্ড কপি পাঠাবেন না। মেল-এর সাবজেক্টে অবশ্যই লিখবেন 'সানন্দা ওয়েব গল্প'। ভ্রমণকাহিনির ক্ষেত্রে ইউনিকোডে টাইপ করে আমাদের ইমেল করতে হবে। ছবি ভাল রেজ়লিউশনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে হাতে লিখে পাঠানো ভ্রমণকাহিনি গ্রাহ্য হবে না। প্রিন্টেড ছবি পাঠাবেন না। ডিজিটাল ছবি পাঠাতে হবে। অন্য বিভাগে লেখা পাঠাতে হলে মেল-এ সাবজেক্ট অবশ্যই উল্লেখ করে দেবেন।

মেল আইডি:
sananda@abp.in

সু দো কু

১৪৭

২	৫						৭	
	৯	৩	৬			৫		
		৬			৫		২	
৮			৪		৩	২		
	৪	১		৫		৬	৮	
		২						১
	২		৫			১		
		৫			৪	৭	৬	
	৮						৪	৫

উপরের ছকগুলিতে মোট ৯টি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলিতে হিসেব করে বাকি সংখ্যাগুলো বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে উপরে-নীচে বা পাশাপাশি লাইনে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা দু'বার না বসে।

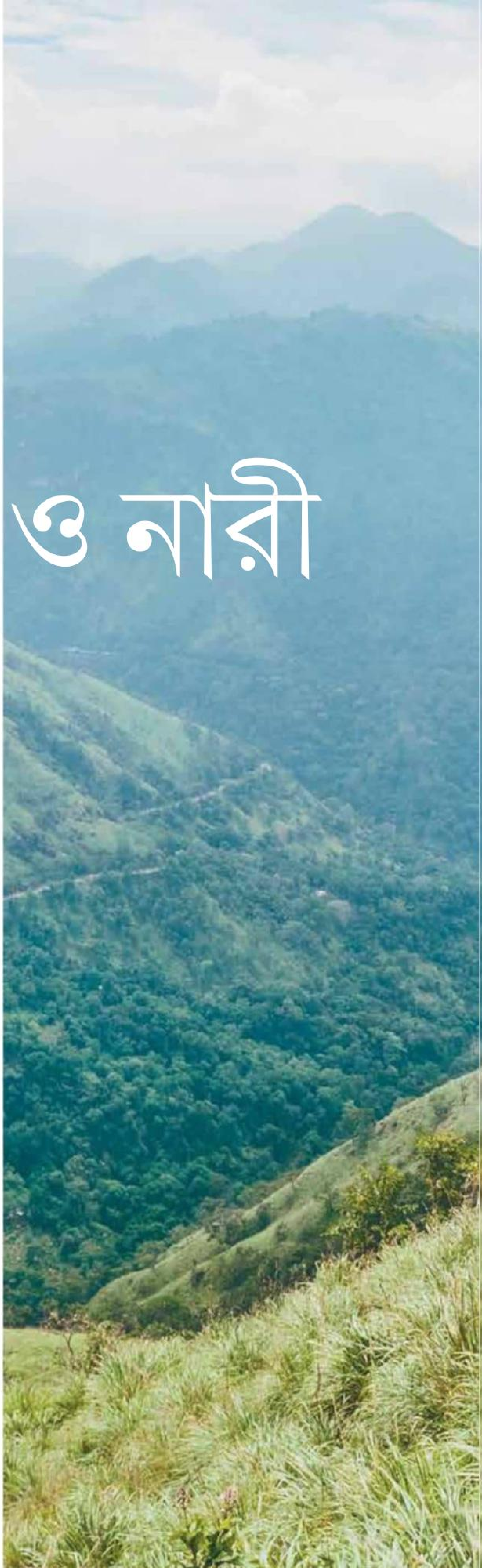
সমাধান আগামী সংখ্যায়

৩০ জুলাই সংখ্যার সমাধান

২	৫	৮	৩	৪	১	৯	৭	৬
৭	৯	৩	৬	২	৮	৫	১	৪
৪	১	৬	৯	৭	৫	৮	২	৩
৮	৬	৯	৪	১	৩	২	৫	৭
৩	৪	১	৭	৫	২	৬	৮	৯
৫	৭	২	৮	৯	৬	৪	৩	১
৬	২	৪	৫	৩	৭	১	৯	৮
৯	৩	৫	১	৮	৪	৭	৬	২
১	৮	৭	২	৬	৯	৩	৪	৫

মেয়েদের অগ্রগতি

সম্পর্ক, সমাজ ও নারী



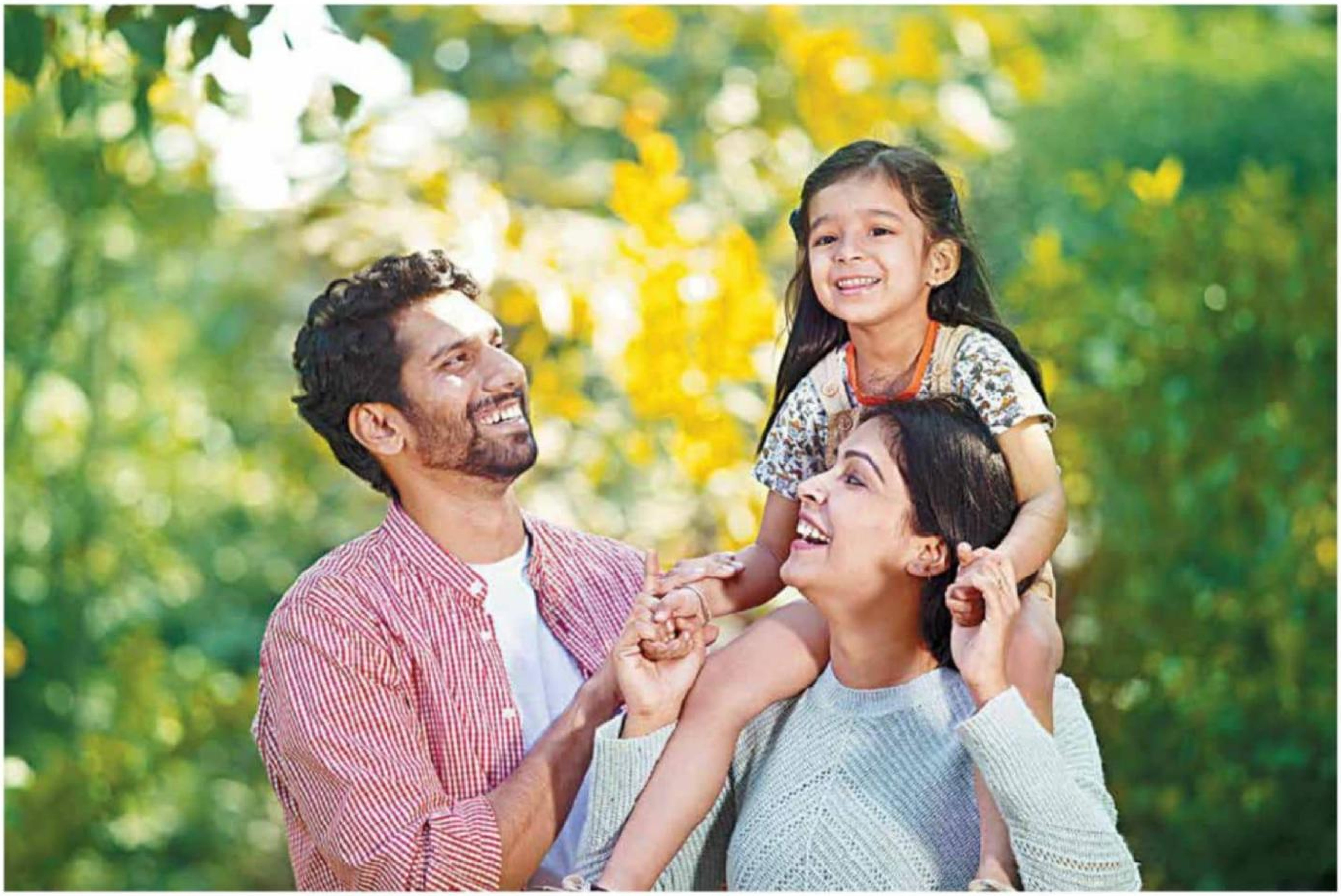
ক্ষমতায়ন শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও নারীরা কি তার অর্থ বোঝে? বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনে এই বিশেষ শব্দটির প্রয়োগ কি নিজেদের জীবনে করতে পেরেছে? তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন ঋষিতা মুখোপাধ্যায়।

কোনও আলোচনায় ঢোকার আগে একটি সমীক্ষার ব্যাপারে কথা বলা যাক। ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পপুলেশন সায়েন্সের ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে প্রতি পাঁচবছর অন্তর সমগ্র ভারত জুড়ে সার্বিক পরিস্থিতি, সমাজ ও নারী উন্নয়নের বিষয়ে একটি করে সমীক্ষা চালিয়ে থাকে। আগের বছরই তাদের পঞ্চম সমীক্ষাটি প্রকাশিত হয়েছে। সেই সমীক্ষায় কিছু বিষয় রাখা হয়েছে নারীর ক্ষমতায়নকে মাথায় রেখে। যেমন কত সংখ্যক বাড়ির মহিলারা পরিবারের কোনও বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্তে নিতে পারেন, বা কত সংখ্যক মহিলাদের নিজের নামে বাড়ি, মোবাইল ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। কত সংখ্যক মহিলা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হয়েছেন। সমীক্ষার ফল কিন্তু বেশ আশাপ্রদ। দেখা যাচ্ছে গত কয়েক বছরে নারীরা বেশ খানিকটা এগিয়েছে, তারা অনেকটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু খাতায়-কলমে তো অনেক কিছুই হয়, বাস্তবের চিত্র কতটা বদলায়? আজও কি মেয়েরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে? জীবনের গতিপথ কতটা নির্ধারণ করতে পারে?

ছোটবেলা থেকেই বঞ্চনা সঙ্গী

নয়ের দশকের শুরুতে নারী-পুরুষ সমতা বোঝানোর জন্য সরকারি চ্যানেল দূরদর্শনে একটি বিজ্ঞাপন চালানো হত, সেখানে মা তাঁর পুত্র সন্তানকে বেশি খাবার দিচ্ছেন আর কন্যাকে কম। তৎকালীন সমাজে ধারণা ছিল পুরুষ সব জায়গায় অগ্রাধিকার পাবে। সেটা যাতে না করা হয়, তাই বলা হত বিজ্ঞাপনে। তবে আমরা কিন্তু তারপর অনেকটা পথ হেঁটে ফেলেছি। এখন আর খাবার নিয়ে পুত্র-কন্যা সন্তানে বৈষম্য করেন না মায়েরা। সমাজকর্মী ও অর্থনীতির শিক্ষক শাশ্বতী ঘোষের বক্তব্য হল, "এখন তো প্রতিটি পরিবারেই একটি কি দু'টি সন্তান, তাহলে খাবার নিয়ে আর এই বৈষম্য থাকবে কী করে! তবে পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছুটা আছে। মানে ছেলেকে যে অর্থ খরচ করে প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ানোর কথা ভাবে, মেয়ের ক্ষেত্রে সে ভাবনাটা আসে না। তখন দ্বিতীয় অপশনের কথা ভাবতে শুরু করা হয় বাড়ি থেকে। আর মেয়েদের জন্য তো চিরকালই 'সানসেট ল' মানে সূর্য ডোবার আগেই বাড়ি ঢুকতে হবে এমন আইন যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে। বছরের পর





বছর কেটে গেলেও তার অন্যথা হয় না।” পুরোপুরি না হলেও প্রায় একই সুর মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন ও ধারাবাহিকের প্রযোজক-লেখিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠেও। “এখনও মেয়েদের একটু বেশি বাধা পেরতে হয়। পড়াশোনায় ছেলেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কারণ ধরেই নেওয়া হয় পুত্রসন্তানই বাবা-মাকে দেখবে, কন্যা নয়। সব পরিবারে হয় সেটা বলব না। তবে এটাও ঠিক, বৃহৎ ভারতে এই চিত্রের খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি।” অন্যদিকে অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্যর মতে এখনও পরিবারে কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তানের মধ্যে ফারাক করা হয়। “শুনুন, শহরের খুব কম সংখ্যক পরিবারে হয়তো সেই ফারাকটা মুছেছে। একবার সারা শহর ঘুরে, মফফসল ঘুরে এসে বলুন তো কটা পরিবার এটা মানে?” অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই স্বীকার করেন বহু অভিভাবক তাঁদের কন্যাসন্তানকে পড়াশোনা করান বিয়ের বাজারে ভাল পাত্র পাওয়ার জন্য। তাহলে হিসেবটা কী দাঁড়াল...মেয়েদের পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়েছে কিছুটা। এরপর বিবাহপর্ব।

মেয়েদের বিয়ে ‘হয়’ না ‘করে’...

একসময়ের প্রচলিত একটি কথা ছিল ‘মেয়েদের বিয়ে হয় আর ছেলেরা বিয়ে করে।’ ভাবছেন তো আমি কী অবলীলায় ‘একসময়ে’, ‘ছিল’, শব্দগুলি ব্যবহার করে চলেছি। আসলে আজকে দাঁড়িয়ে সেই সাহসটা যে একেবারে আসেনি, তা কিন্তু নয়। মেয়েরা বিয়ের ক্ষেত্রে, কোথাও গিয়ে এখন ‘হয়’ আর ‘করে’র মধ্যের ব্যবধানটি ক্রমশ কমিয়ে আনছে। না, তাতে খুব বেশি আনন্দিত হওয়ার দরকার নেই। বিয়ের পরের কিছু সামাজিক নীতি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে, বা বলা ভাল, তালিকায় কয়েকটি নতুন নীতিও যোগ হয়েছে। যাই হোক বিয়ের কথায় আসি। চারপাশে দৃষ্টি বোলালে মনে হয় মেয়েরা এখন আর সেভাবে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নন। তাঁরা বরং আর্থিকভাবে স্বাধীন হয়ে নিজের মতো করে জীবন কাটাতেই পছন্দ করেন। অপরাজিতা তো বলেই ফেললেন, “আজকাল মেয়েরা নিজেদের মতো করে বাঁচতে চায়।” শাশ্বতী মনে করেন মেয়েরা বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছে। তিনি আবার এই বিয়ে প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্যের অবতারণা করে বললেন, “অনেকে ভাবেন পণপ্রথা বোধহয় কমে এসেছে। আমার মনে হয় চেহারাটা বদলেছে। আজকাল দেখি সকলে মেয়েকে ‘সাজিয়ে’ দিতে চায়। সেটা কিন্তু অন্যভাবে পণ দেওয়া। কেন একটি সফল মেয়ে বা ছেলে কি নিজেদের সংসার সাজাতে পারে না! হয়তো বাবা-মায়ের মনের মধ্যে আশঙ্কা কাজ করে যে, জিনিস না দিলে ওই সংসারে তাদের মেয়ের গুরুত্ব কমে যাবে।” এই প্রসঙ্গ বোঝাতে গিয়ে এই সমাজকর্মী আরও একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, শিক্ষার সঙ্গে পণপ্রথার কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিত রাজ্য কেরলে পণপ্রথা দিব্যি জাঁকিয়ে রাজত্ব করছে। পণের প্রাবল্য সহ্য করতে না পেরে কেরলে মেয়েদের আত্মহত্যাও বিরল ঘটনা নয়। লীনাও জানালেন, মেয়েদের মধ্যে বিয়ের প্রবণতা কমেছে। কেউ-কেউ লিভ ইনের কথাও ভাবছে। “দায়িত্ব না নিয়ে পরিযায়ী পাখির মতো থাকার ভাবনা থেকে লিভ ইনের ব্যাপারে অনেক মেয়েই উৎসাহী।” তবে এই মানসিকতা ভাল না খারাপ সে বিষয়ে ঢুকলেন না লীনা। লিভ ইনের প্রবণতা যে বেড়েছে তা পরিষ্কার। তার কারণ হিসেবে একদিকে আছে মেয়েদের আর্থিকভাবে সবল হওয়া এবং কর্মসূত্রে বাড়ি থেকে দূরে থাকা। নাগরিক সমাজ এই বিষয়ে খানিক উদার হয়েছে বইকি। কিন্তু নাগরিক সমাজই... বৃহত্তর ভারত সেই তিমিরেই আছে।

সফল নারীর সঙ্গে অসফল পুরুষের বিয়ের স্থায়িত্ব

এই বিষয়ে এখনও সমাজ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। স্বামী স্ত্রীয়ের চেয়ে সফল হবে এটাই নাকি প্রচলিত মত। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়? এক সফল স্ত্রী কেন তার চেয়ে পিছিয়ে পড়া স্বামীকে নিয়ে সংসার করতে পারে না? লীনার মতে সেই ক্ষেত্রে একটি ক্ল্যাশ অবশ্যসম্ভাবী। একটি অসম্মানের

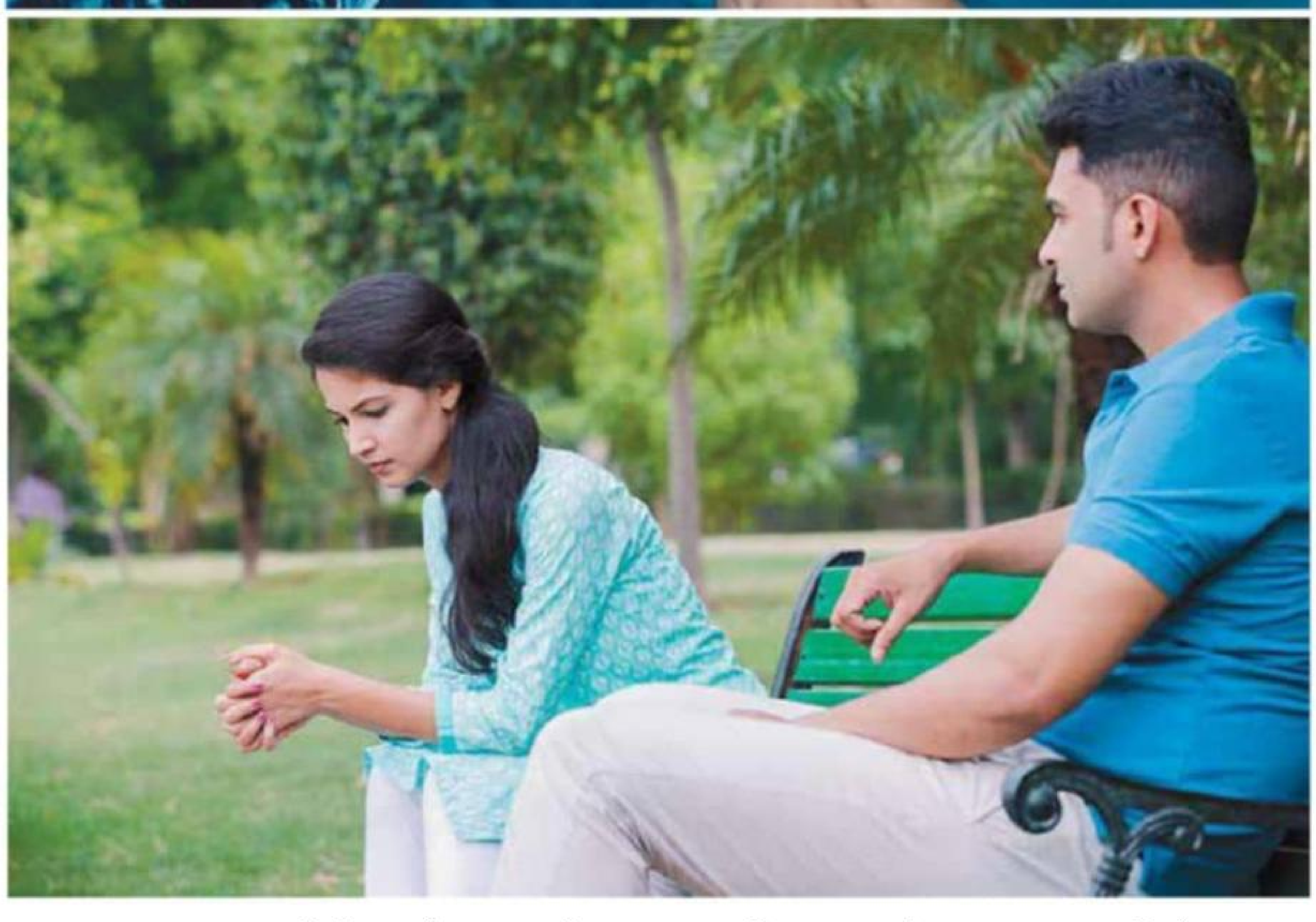


স্বামী স্ত্রীয়ের চেয়ে সফল হবে এটাই প্রচলিত মত। কিন্তু যদি এর বিপরীত হয়? এক সফল স্ত্রী কেন তার চেয়ে পিছিয়ে পড়া স্বামীকে নিয়ে সংসার করতে পারে না? এখনও পুরুষদের একটু কোথাও গিয়ে বুকে লাগে তাদের চেয়ে সফল নারীকে মেনে নিতে।



আবহ তৈরি হয়। শাশ্বতী বললেন, "সেদিন একটি পোর্টালে পড়লাম। দেবশ্রী-প্রসেনজিতের বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ নাকি দেবশ্রীর সাফল্য। আমি এই খবরের সত্যতা বিচার করতে যাচ্ছি না। আমার জিজ্ঞাসা, যদি পাবলিক ডোমেনে এমন কথা উঠতে পারে, তাহলে প্রাইভেট ডোমেনে পুরুষটি কি চেষ্টা করবেন না, সফল মেয়েটিকে আড়াল করতে? বিয়ের কথা ছেড়ে দিন। মেয়ে প্রিন্সিপাল বা এইচওডি হলে এখনও তাঁর নীচের পুরুষকর্মীরা একটু অবহেলা করেই। ব্যঙ্গ করে। এখনও পুরুষদের একটু কোথাও গিয়ে বুকে লাগে তাদের চেয়ে সফল নারীকে মেনে নিতে। এখানে বলতে হয় হাইপারগ্যামির কথা। সমাজতত্ত্ব বলে হাইপারগ্যামি হল, একজন নারীর তার চেয়ে উচ্চতর আয় ও সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষকে বিয়ে করার প্রথা। দুঃখের ব্যাপার হল ভারতে যে বিয়েতে হাইপারগ্যামি প্রথা মান্যতা পায়নি, সেখানে গার্হস্থ্য হিংসার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের উপার্জন বেশি হওয়া উচিত, পরিবার চলা উচিত — পুরুষের রোজগারে এমন ভাবনা ধাক্কা খেয়েছে বলেই গার্হস্থ্য হিংসা বেড়েছে বলেই সমাজবিদদের ধারণা। মেয়েদের নিয়ে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়ে না এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মিম প্রায়শই চোখে পড়ে। সেখানে নারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন





করা হয়, সফল নারী কি ব্যর্থ পুরুষকে বিয়ে করতে রাজি হবে? প্রশ্নটার আড়ালে যে তির্যক ব্যঙ্গ আছে তা বোঝাই যায়। কিন্তু সত্যিই কি এমন হয়! যদি বলি হয়... এই উদাহরণও কিন্তু পাওয়া যায়। বহু নারীই আছে যারা নিজেরা চাকরি করে তার সঙ্গের পুরুষটির শুধু রাজনীতি করাকে মেনে নিয়েছে। নারী মানেই আবেগপ্রবণ, সেই আবেগের ভর দিয়ে সে যে পুরুষের দায়িত্ব নেবে না এমন কথা জোর গলায় কিন্তু বলা যায় না। তবে প্রশ্ন হল নারী নিতে চাইলেও, পুরুষ সেই দায়িত্ব দিতে চাইলেও, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কি সেটা মুখ বুজে মেনে নেবে? বলা হবে স্বামী ‘ভাল’ বলেই স্ত্রীর চাকরি মেনে নিয়েছে। এটা কখনই ভাবা হয় না যে, ভাল নয়, মেয়েটি নিজ অধিকারে সেটি ছিনিয়ে নিয়েছে। এই সমাজ কেন ভাবে না, স্ত্রী ‘ভাল’ বলেই সফল পুরুষটির সংসার গুছিয়ে রাখছে নিজের আমিত্বকে বর্জন করে!

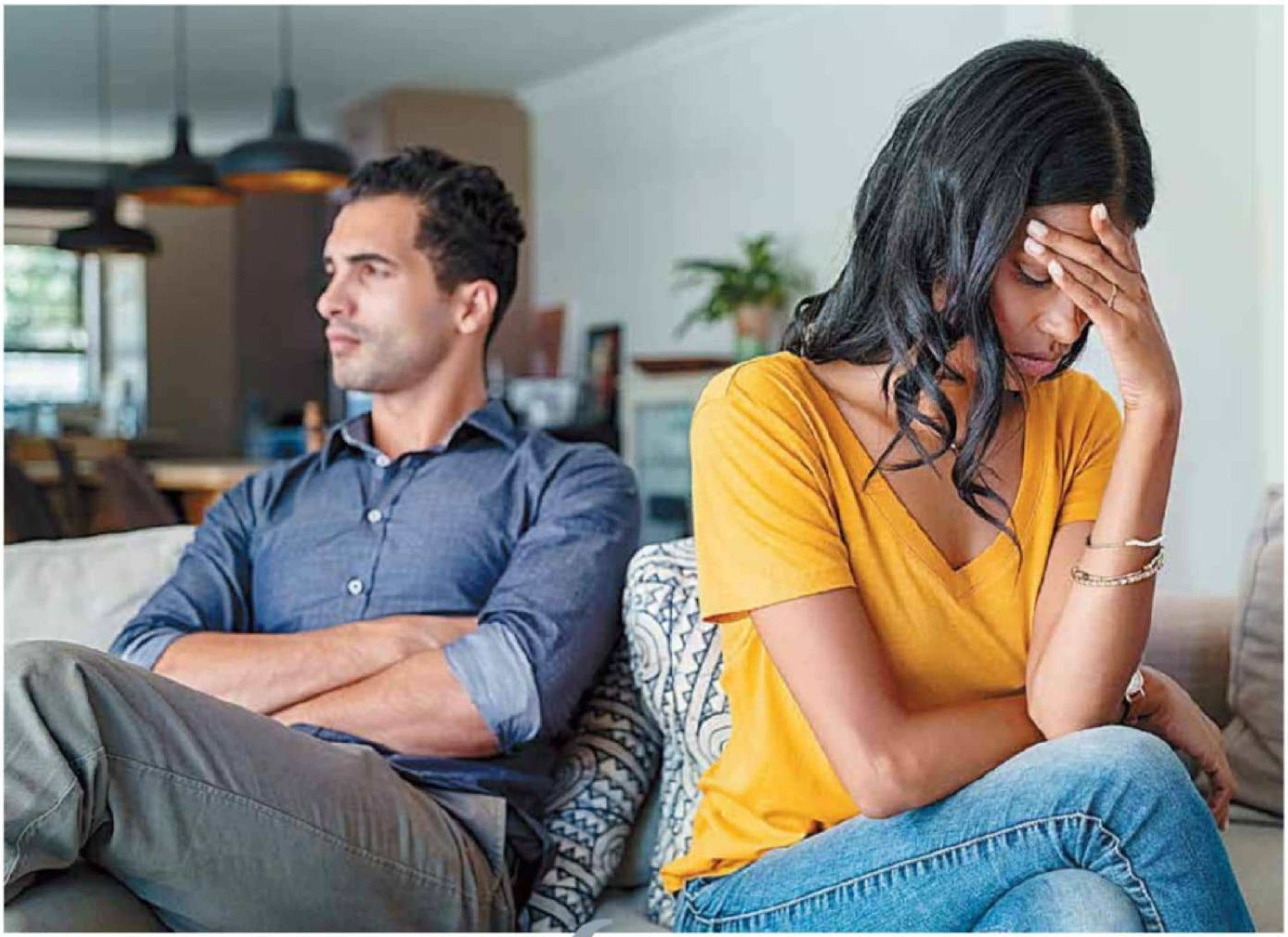
সন্তান কার দায়িত্ব...

কর্মরতা নারীদের বা বলা ভাল মায়েদের মধ্যে সবসময় একটি দ্বন্দ্ব কাজ করে— সন্তানের দায়িত্ব নাকি চাকরি। শাশ্বতী জানালেন, “মায়ের উপর বেশি দায়িত্ব থাকে ছেলে-মেয়ে সফল হচ্ছে কিনা। এটা একটা নতুন ডিসএমপাওয়ারমেন্টের জায়গা শুরু হয়েছে যে মাকে বেশি দায়ী করা। মেয়েদের মধ্যেও গিল্ট ফিলিং হয়, আমি কর্মরতা বলে বোধহয় বেশি সময় দিতে পারি না। নজর রাখতে পারছি না। এই ভাবনা থেকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভাবে। একে অর্থনীতির ভাষায় ট্রেড অফ বলে। চাকরি ছেড়ে কী পাব, না ছাড়লে কী পাব। চাকরি ছাড়লে মানসিক শান্তি পাব, ফুল টাইম মা হব, সংসার করব... আসলে বাকি সাপোর্ট সিস্টেমগুলো যথেষ্ট নয়। যদি বিদেশের মতো ক্রেশ, ট্রান্সপোর্ট যথাযথ হত, খাবার পাওয়া সহজ হত তাহলে কী চাকরি ছাড়ত মেয়েরা? আসলে চাকরি ছেড়ে ভাল স্ত্রী হওয়ার ইচ্ছেটা জিতে যাচ্ছে, ট্রেড অফে।” তবে সাইকিয়াট্রিস্ট শ্রীময়ী তরফদার আবার উলটো ভাবেন, “এখন মেয়েরা কোনও গিল্ট ফিলিংয়ে ভোগে না। বরং তারা ভাবে সন্তান মানুষ করা বাবা-মা, দু’জনের দায়িত্ব। বাবারাও এগিয়ে আসছেন বইকি। এখানে অবশ্য একটি ইন্টারেস্টিং তথ্য শেয়ার করি, অনেক সময়ে পরিবারও কিন্তু ভীষণভাবে এগিয়ে আসছে কর্মরতা মায়ের সন্তানকে মানুষ করার ক্ষেত্রে বা মেয়েটি যাতে ঠিক করে চাকরি বজায় রাখতে পারে তা নিশ্চিত করতে। তবে সেই চাকরিটা অবশ্যই সরকারি হতে হবে। সরকারি চাকরি হলেই পরিবারের সকলে মিলে সেটাকে রক্ষার চেষ্টা করেন। এরজন্য আর্থ-সামাজিক কাঠামো বলুন বা চাকরির স্থায়িত্বই বলুন , দুটোই দায়ী। বেসরকারি অফিসে কর্মরতা মেয়েটির কপাল এত ভাল হয় না।” আসল কথা হল মেয়েদের বাইরেটা খুলেছে কিন্তু সংসার পিছু ছাড়েনি।

শারীরিক সম্পর্ক ও মেয়েরা

এ প্রসঙ্গে শ্রীময়ীও বললেন, বর্তমানে বিবাহিত মহিলারা সম্পর্কের ক্ষেত্রে শারীরিক চাহিদার কথাটা বলে এবং বেশ খোলাখুলি ভাবেই বলে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা যদি সেই সম্পর্ক উপভোগ করতে না পারে, সেই সূত্র ধরেই দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। তবে সেটি বিবাহবিচ্ছেদ অবধি গড়ায় কিনা তা একমাত্র আইনজীবীদের পক্ষে বলা সম্ভব। তবে নিঃসন্দেহে এটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি সঠিক এবং বড় পদক্ষেপ তো বটেই কারণ তারা নিজেদের অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটি বিষয়ের কথা সরাসরি সকলের সামনে বলছেন যা কিনা কয়েক বছর আগেও ভাবা যেত না। এটাও ঠিক যে, সমাজের একাংশ এই বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি ভাবে কথা বলছে। তবে ওই, ‘একাংশ’-ই। কারণ





এই স্বাধীনতাটুকু সম্ভবত শুধু আর্থিকভাবে সফল নারীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ।

নারী তুমি কী বা চাও

সমাজ নারীকে কী চোখে দেখে, সংসার তাঁকে নিয়ে কী ভাববে? এই সব আলোচনার মাঝে অবধারিতভাবে প্রশ্ন উঠে আসে, একটি সফল নারীর চাহিদা কী থাকে সংসারের কাছ থেকে? শাশ্বতী মনে করেন, "মেয়েটি অ্যাপ্রিসিয়েশন চায় আর নারী-পুরুষের সমতা চায়। তবে সমতা কতটা সেটা ব্যক্তিবিশেষে নির্ভর করবে।" লীনা মনে করেন, "অ্যাপ্রিসিয়েশন তো নারী-পুরুষ উভয়েরই চাহিদা, আসল দরকার পরিবারের সাপোর্ট।" শ্রীময়ীর কাছে আবার এমন অনেক কেস এসেছে সেখানে সাপোর্টের চেয়ে অ্যাকনলেজমেন্ট জরুরি হয়ে উঠেছে। যদিও অপরাজিতা মনে করেন একজন সফল নারী তার পরিবারের কাছ থেকে কিছুই চায় না। কারণ সে সফল এই ভাবনা থেকেই নিজেকে প্রিভিলেজড ভেবে ফেলে। তখন কিছু দিতে পারলে বেশি খুশি হয়। অথচ সেটা যে নারীর অধিকার, সেটা ভেবেই উঠতে পারে না। আর এটা ভাবতে পারে না বলেই এই অধিকার বা ক্ষমতায়ন প্রশ্নটিও বেশ ধোঁয়াশা নারীর কাছে। এমন প্রচুর উদাহরণ আছে যেখানে নারীর সমাজের নিম্নস্তর থেকে উপরের ওঠার লড়াইয়ের সাক্ষী সমাজ। কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম হিসেবেই মান্যতা পায়। কর্মরতা নারীই আগ বাড়িয়ে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে এই ভাবনা থেকে, যাতে স্বামী তাকে ভুল না বোঝে। নিজের আয়ের হিসেব সে দেয় স্বামীকে। হয়তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজই তাকে এমন ভাবতে বাধ্য করেছে। আজকে ভারতীয় মেয়েরা কোভিড যুদ্ধবিমান চালাচ্ছে, কুস্তি-ব্যাডমিন্টনে সোনা আনছে অথচ নারীর ক্ষমতায়নের ব্যাপারে বিশ্বের ১৯০টি দেশের তালিকায় ভারত ১১৭তম স্থানে রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিজ সুরক্ষার দাবিতে আজ পর্যন্ত নারী কী করে উঠতে পেরেছে? লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যা হাতে গুনে শেষ করে দেওয়া যাবে। অপরাজিতা তো বললেন, "সিরিয়ালের নায়িকাদের প্রথমে অত্যাচারিত দেখাতে হবে তারপর সেই চরিত্রের উত্তরণ হবে।" তাঁর প্রশ্ন, কেন এমন চরিত্র দেখানো হয় না, যেখানে উত্তরণের পর থেকে গল্প শুরু হবে? নিজেই জবাব দিলেন, "মানুষ মেয়েদের উপর অত্যাচার দেখতে ভালবাসে।" লীনা অবশ্য নিজের চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন বোঝানোর চেষ্টা করেন। "আমার সব নায়িকা মানসিকভাবে শক্তিশালী ও ব্যতিক্রমী হয়। ওদের মাধ্যমে সমাজের মেয়েদের মধ্যে লড়াইয়ের বার্তা পাঠাতে চাই।"

কর্মরতা নারীই আগ বাড়িয়ে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে এই ভাবনা থেকে, যাতে স্বামী তাকে ভুল না বোঝে। নিজের আয়ের হিসেব সে দেয় স্বামীকে। হয়তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজই তাকে এমন ভাবতে বাধ্য করেছে।

আসলে, নারীকে ক্ষমতায়ন বোঝার আগে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে। নিজের সিদ্ধান্ত নিজেকে নিতে হবে। দাসী বা দেবী নয়, মানুষ হিসেবে লাইনের প্রথমে এসে দাঁড়াতে হবে, পুরুষের পাশে, সামনে বা পিছনে নয়।

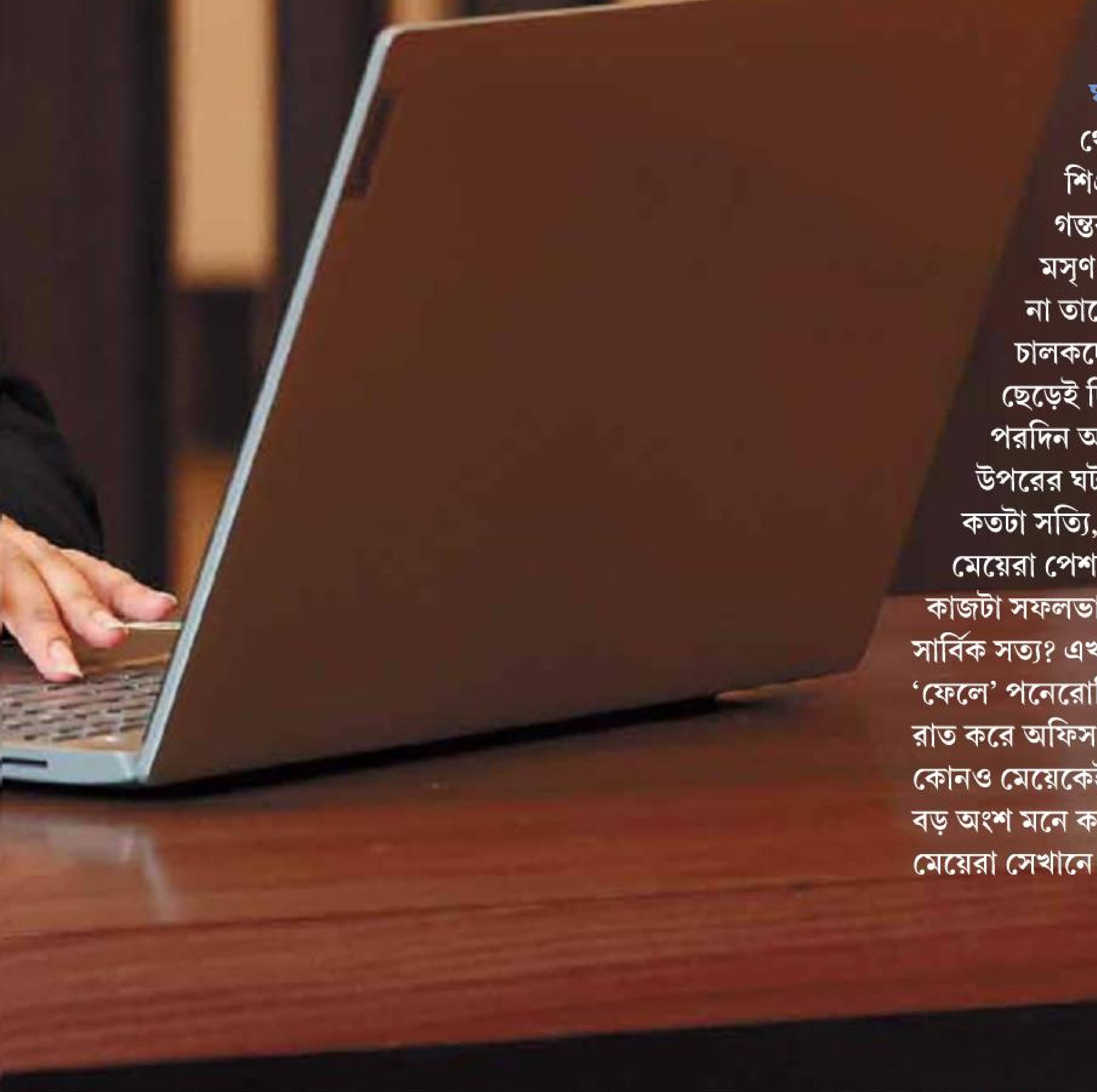
ছবি: আইস্টক



মেয়েদের অগ্রগতি

পথ হাঁটা বাকি?

পেশাজগতে মেয়েদের উপস্থিতি এখন হিরের দ্যুতির মতো! কিন্তু কর্মক্ষেত্রে রোজ এগিয়ে যাওয়ার পথ কতটা মসৃণ হয়েছে মেয়েদের জন্য? আলোচনায় সোশ্যাল অন্ত্রপ্রনরশিপ কনসালট্যান্ট চন্দ্রাণী গঙ্গোপাধ্যায়। জেনে নিলেন তিতাস চট্টোপাধ্যায় ও সংবেত্তা চক্রবর্তী।



ঘটনা ১: সকাল ৯.৩০টা। উর্ধ্বশ্বাসে অফিসে ঢুকছে মহুল। ১০টায় ক্লায়েন্ট মিট, তার আগে প্রেজ়েন্টেশনের সবকটা পয়েন্টে চোখ বুলিয়ে নিতে হবে আর একবার। ক্লায়েন্টের সামনে গড়বড় হলে কলিগদের থেকেই শুনতে হবে, 'সারাক্ষণ বাচ্চার স্কুল, শাশুড়ির অসুখ, বরের অফিসটুর মাথায় ঘুরলে আর নিজের কাজটা করবে কী করে?' আবার বাড়িতেও যদি কোনও কাজে একটু ঢিল পড়ে তো সক্কলের মুখ হাঁড়ি হয়ে যাবে!

ঘটনা ২: একটা পি.আর এজেন্সিতে চাকরি করে মধুশ্রী। রোজ ইভেন্ট, প্রমোশন, লঞ্চ পার্টি লেগেই রয়েছে। কাজ শেষ হতে হতে রাত বেড়ে যায়, বাবা-মায়ের মুখ থমথম করে! মা তো প্রায়ই বলেন, ''কাজের নামে রোজ রোজ পার্টি না করে তো স্কুলে পড়ালে পারতিস!'' কাজের জগতে সাফল্যের সিঁড়ি তরতরিয়েই চড়ছে মধুশ্রী। কিন্তু তার আপনজনেরাই তার পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেয় না।

ঘটনা ৩: গাড়ি চালানোর ইচ্ছে ছিল ছোটবেলা থেকেই। বড় হয়ে সেটাকেই পেশা বানিয়েছে শিপ্রা। অ্যাপ-ক্যাব নিয়ে রোজ কত যাত্রীকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয় সে! কিন্তু তার নিজের যাত্রাটা মসৃণ নয় মোটেই। 'মেয়ে' বলে সব যাত্রীরা ভরসা করে না তাকে। রাস্তার লোকেরা বা অন্যান্য গাড়ির পুরুষ চালকদের থেকে উড়ে আসা বাঁকা মন্তব্যের কথা তো ছেড়েই দিলাম। মাঝে মাঝে হতাশ লাগে শিপ্রার। কিন্তু পরদিন আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে বেরয় কাজে।

উপরের ঘটনাগুলোর শুধু নাম কাল্পনিক। উদাহরণগুলো যে কতটা সত্যি, সে তো চারদিকে চোখ চালালেই বোঝা যায়! মেয়েরা পেশাজগতে, যাকে 'গ্লাস সিলিং ভাঙা' বলে, সেই কাজটা সফলভাবে করছেন বহুদিন ধরেই। কিন্তু, সেটাই কি সার্বিক সত্য? এখনও কি সব মেয়ের জন্য বর-বাচ্চা-শ্বশুরবাড়ি 'ফেলে' পনেরোদিনের জন্য টুরে চলে যাওয়া সমান সহজ? অনেক রাত করে অফিস থেকে ফিরলে প্রতিবেশীদের বাঁকা চাউনি কি কোনও মেয়েকেই সহ্য করতে হয় না? এখনও কি সমাজের একটা বড় অংশ মনে করে না, যে কিছু পেশায় ছেলেদেরই মানায়, মেয়েরা সেখানে অনাহুত? গ্লাস সিলিং ভাঙতেই বা হচ্ছে কেন



মেয়ে মানেই অনেকে মনে করেন, তার পড়ানোর সঙ্গে যুক্ত থাকাটা সবচেয়ে নিরাপদ, নয়তো সরকারি চাকরি। সেখানে রাতবিরেতে ফেরা নেই, জানলার বাইরে দিয়ে পড়শির উৎসুক চাহনি নেই। খাঁটি দশটা-পাঁচটার চাকরি।

এখনও? সভ্য সমাজে তো গ্লাস সিলিং থাকারই কথা নয়! কিন্তু রয়েছেই যখন, তখন বিভিন্ন আঙ্গিকগুলোকে ভাল করে চিনে নেওয়া দরকার।

একদম প্রাথমিক সোশ্যাল ইউনিট, অর্থাৎ পরিবার থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক। ২০১৯-এ অক্সফ্যাম একটা রিপোর্ট বের করেছিল, যার নাম ছিল 'মাইন্ড দ্য গ্যাপ'। সেটাতে ধরা পড়েছিল, ভারতীয় পুরুষরা মাত্র ৫৬ মিনিট বাড়ির কাজে দেয়। আর মেয়েরা সেখানে ৩৫৩ মিনিট সময় দেয়। এই কাজের হিসেবটা যদি ধরা হয়, তাহলে মেয়েদের 'লেবারফোর্স পার্টিসিপেশন'এর হার বেড়ে হয়ে যায় ৮১ শতাংশ! কিন্তু বাড়ির কাজ তো 'কাজ' হিসেবে স্বীকৃতিই পায় না! নিজের লোকেরাই যদি মেয়েদের পরিশ্রমের মূল্য স্বীকার না করেন, বাইরের লোকেরাই বা কেন করবেন? তাঁরা তো এই ধারণাই বয়ে চলেছেন যে মেয়েরা আসলে কোনও কাজই করে না! হয় 'বাড়িতে বসে থাকে' আর না হলে অফিসে 'স্রেফ আসে, মনটা থাকে বাড়িতেই!' অর্থাৎ সমস্যার শিকড়টা অনেক গভীরে। এবং সেটা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, দুই ক্ষেত্রেই রয়েছে।

বাহ্যিক সমস্যা

বাইরের দুনিয়ায় এগিয়ে চলতে গিয়ে অনেক বাধার মুখোমুখি পড়তে হয় একটি মেয়েকে। কী সে সব সমস্যার স্বরূপ?

বাড়ির আপত্তি

মেয়েরা চাকরি করবে মানেই একটা তথাকথিত 'নিরাপদ' চাকরির দিকেই প্রাথমিক ঝোঁক থাকে। যদিও এমন কোনও পেশা নেই, যেখানে মেয়েরা নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেননি। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে প্রথম বিরোধটা আসে বাড়ি থেকেই। মেয়ে মানেই অনেকে মনে করেন, তার পড়ানোর সঙ্গে যুক্ত থাকাটা সবচেয়ে নিরাপদ, নয়তো সরকারি চাকরি। সেখানে রাতবিরেতে ফেরা নেই, জানলার বাইরে দিয়ে পড়শির উৎসুক চাহনি নেই। একদম খাঁটি দশটা-পাঁচটার চাকরি। এখনও মনে-মনে অনেক অভিভাবকই মেয়েদের আদর্শ চাকরি বলতে এটাই বোঝেন। এবং মেয়েদের 'ভালর জন্য' সেই ধরনের পেশাতে যেতেই জোর করেন তাকে। মেয়েটির কাজের প্রতি ভালবাসা, তার সাফল্য সেখানে মূল্যহীন হয়ে যায়।

পেশা ও পরিবার

আমাদের সমাজটা তো পিতৃতান্ত্রিক। পেশা ও পরিবার সামলানো মেয়েদের পক্ষে যতটা কঠিন, পুরুষদের জন্য ততটাও নয়। ধরা যাক, একজন মহিলা কর্পোরেটের শীর্ষে বসে রয়েছেন। তাহলেও বাড়ির কাজটা তাঁকে কোনও-না-কোনও ভাবে করতেই হয়। হয়তো তাঁর একজন হেল্পিং হ্যান্ডও রয়েছে। তবুও তাঁর উপর স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, সন্তান সবারই একটা প্রত্যাশা থেকে যায়। মেয়েরা যতই চেষ্টা করুক, এই ব্যাপারটা থেকে সহজে বেরতে পারে না। এমনকী সকলে যে এ ব্যাপারে স্বামীর ভালমতো সাপোর্টও পায়, এমনও নয়। এর পাশাপাশি সামাজিক প্রত্যাশারও একটা চাপ থেকেই যায়। অনেকেই মনে করে বাচ্চা হওয়ার পর, মেয়েরা বাচ্চা মানুষ করুক, চাকরি ছেড়ে দিক। এই জন্য কেউ-কেউ বাচ্চা হওয়ার পর চাকরি ছেড়েও দেয়। অনেকে আবার সেটা করে না, কিন্তু একটু ব্রেক নেয়। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে ৯০ শতাংশ মেয়েরা ভাবছে, বাচ্চা হওয়ার পর চাকরি থেকে সরে আসবে। আর মাত্র ১০ শতাংশ ছেলেরা ভেবেছে চাইল্ড কেয়ার ইসুর জন্য বাড়িতে থেকে বা কোনওভাবে সাহায্য করবে। মানসিকতার

তফাতটা এখান থেকেই ধরা যায়। বোঝা যায়, আসল দায়িত্বটা মেয়েদের ঘাড়েই এখনও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরা কিন্তু জন্ম দিয়েই বাকি দায়িত্ব ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়। তবে এর মধ্যেও কি ব্যতিক্রম নেই? অবশ্যই আছে। এমনও কেউ-কেউ আছে, যেখানে স্বামী-স্ত্রী পালা করে এই সব ব্যাপার সামলে নেয়। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে এই ধরনের সচেতনতা সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কাজেই একটা মেয়ের পরিবার আর কর্মক্ষেত্রের ব্যালান্সটা আজও ঠিক হয়নি।



মাইনের তারতম্য

একজন মেয়ের সঙ্গে একজন পুরুষের মাইনের তফাতটাও ভীষণ চোখে পড়ার মতো। যতই একজন যোগ্য হোক, যতই তার দক্ষতা থাকুক, এখনও যখন একটা মেয়ের মাইনের প্রশ্ন আসে, তখন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় একজন সমান যোগ্যতার পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে তার মাইনে কম। কেন সমতা নেই? দেবা না জানন্তি!

যৌন হেনস্থা

একজন মহিলা যেখানে কাজ করবেন, সেই জায়গাটার পরিবেশ তো তাঁর কাজের অনুকূল হওয়া চাই। এখনও কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার ঘটনা প্রতিনিয়তই সামনে আসে। তাই 'নিরাপদ কাজ'-এর পক্ষে সওয়াল করতে দেখা যায় আশপাশের মানুষকে। আবার মেয়েদের স্বভাবচরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলার মানুষও আশপাশেই প্রচুর রয়েছে। কোনও মেয়ে যদি কাজ সেরে রাত করে বাড়ি ফেরে, তা হলেও সেটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। ঠিক একই ঘটনা একটি ছেলের ক্ষেত্রে হলে কারওই কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই!

কোভিডের পরে

২০০৫-এ ভারতে সংগঠিত, অসংগঠিত সব ক্ষেত্রেই মেয়েদের লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন ছিল ৩৬.৭ শতাংশ। ২০১৮-তে, কোভিডের ঠিক আগে, সেটা কমে দাঁড়িয়েছিল ২৬ শতাংশে। আর কোভিডের পর সেটা আরও কমে দাঁড়িয়েছে ১৯ শতাংশে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে কোভিডের পর, বিশেষ করে এগ্রিকালচার-ফ্যাক্টরিতেও মেয়েদের সংখ্যাটা ক্রমেই কমে আসছে। আমাদের যদিও একটা খুব সেকেলে ধারণা আছে যে, পুরুষদের টাকাটাই বাড়ির উপার্জন। তাতেই সংসার চলে। কিন্তু একটু গ্রামীণ অঞ্চলে গেলে বোঝা যায়, সাংসারিক দায়দায়িত্বের অনেকটাই একটা মেয়ের কাঁধে থাকে। আর এই জায়গাটা থেকেও মেয়েরা অনেকটা সরে এসেছে।



‘ও কি পারবে?’

আমাদের অনেক সময়ই সামাজিক স্তরে এটা শুনতে হয় যে, মেয়েদের দ্বারা এটা হয় না, ওটা হয় না। কিন্তু শুধুই সামাজিক স্তরে কি? কর্মক্ষেত্রেও একজন মেয়েকে এ রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এখন অনেক ক্ষেত্রেই একজন ছেলে আর একজন মেয়ে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে প্রফেশনাল সেক্টরে কাজ করছে, কোনও ইভেন্ট কভার করছে। সবই ঠিক আছে। কিন্তু প্রাথমিক যে মানসিকতাটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ছড়িয়ে গিয়েছে তা হল, মেয়েরা খুব অবলা, তার সুরক্ষার দায়িত্ব পুরুষের। ধরা যাক, কোনও সহকর্মী মেয়েটিকে কোনও রাতের ইভেন্ট কভার করতে দিল না। হয়তো তার ভাল চেয়েই, কিন্তু এতে তার ওই মানসিকতাটা প্রকাশ পায়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, ভিতরে-ভিতরে ছেলেটি একটু নাক কুঁচকে রয়েছে আর ভাবছে সহকর্মী মেয়েটি আমার সমান-সমান? এটা কিন্তু তার বেড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িত। ছোট থেকে সে হয়তো তার বাবাকে কিংবা দাদুকে দেখে এসেছে তার মায়ের সঙ্গে এই ভাবে আচরণ করতে। সে-ই যখন অফিসে গিয়ে কোনও মহিলা টিম-লিডের আন্ডারে কাজ করছে, মেনে নিতেই পারছে না। সুতরাং, যদি আমরা চাই যে একজন পুরুষ একটি মেয়ের সঙ্গে সমান-সমান আচরণই করবে, তা হলে সেই শিক্ষাটা তাকে ছোটবেলা থেকেই দিতে হবে— মুখে বলে নয়, আচরণের মাধ্যমে।

আভ্যন্তরীণ সমস্যা

বাইরের যে-যে সমস্যাগুলো আছে, সেগুলো তো এক রকম। কিন্তু এর পাশপাশি মেয়েদের নিজেদের ভিতরের কিছু সমস্যা, কিছু অদ্ভুত ধ্যান-ধারণাও তথাকথিত নারী স্বাধীনতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মেয়ে মানেই ‘হোমমেকার’?

শুনতে খুব অবাক লাগবে, তবে এখনও অনেক মেয়েই মনে করে, ছেলেদের উপার্জনেই যদি সংসার চলে যায়, তা হলে তাদের আর

পরমা রায়চৌধুরী



সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কর্পোরেট কমিউনিকেশন অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার

দু’তিনটে জিনিস আমি সবসময় মেয়েদের বলতে চাই। প্রথম হল, কমফর্ট জ়োনে নিজেকে আটকে রেখো না। নিজেকে স্ট্রেচ করো। নতুন জিনিস শেখো, নতুন কাজ করো। তার জন্য যে ঝুঁকিটুকু নেওয়া দরকার, সেটা নেওয়ার মতো সাহস রাখো মনে। দ্বিতীয়ত নিজের উপর, নিজের শিক্ষার উপর এবং ক্ষমতার উপর আস্থা রাখো। এবং নিজের জ্ঞান ও দক্ষতাকে নিরন্তর বাড়ানোর চেষ্টা করে যাও। তার জন্য কোর্স করো, ওয়র্কশপ করো, লেকচার অ্যাটেন্ড করো... এই ‘প্রফেশনাল ইনভেস্টমেন্ট’টা প্রয়োজন, কারণ তোমার উন্নতির দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। তোমার সংস্থা বা ম্যানেজার নেবে না। কাজের জায়গায় সম্মান বা গুরুত্ব কেউ দেয় না, ওটা আদায় করে নিতে হয়। আর কর্মক্ষেত্রে তোমার দাবি যদি ন্যায্য হয়, তার জন্য নেগোশিয়েট করায় কোনও লজ্জা নেই। মেয়ে বলে যদি মনে করো কেউ তোমায় আলাদা করে কোনও সুবিধা দেবে, তাহলেই মরেছ! আর চামড়াটা একটু মোটা করতে হবে। ঝেড়ে ফেলতে জানতে হবে। বাড়ি হোক বা অফিস, সবসময় সকলে তো পাশে থাকবেন না! আবার অন্যায় দেখলে স্পষ্ট কথা বলতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। ওয়র্ক-লাইফ ব্যালান্সের ক্ষেত্রে পরিবার এবং সঙ্গীকে পাশে পাওয়া খুব জরুরি। আর সন্তান যদি থাকে, তাহলে দেখতে হবে বাড়িতে যাতে তারা ঠিকঠাক কেয়ার পায়। বাড়িতে বা বাড়ির কাছাকাছি যদি বড়রা থাকেন, তাহলে তো কথাই নেই! না হলে ভাল গৃহ-সহায়কদের পিছনে ইনভেস্ট করতে হবে। আর কেরিয়ারকে প্রাধান্য দিতে শেখো। যদি কাজে উন্নতি হয়, তার জন্য বাইরে চলে যেতে হয়, অপরাধবোধে ভুগো না। একটাই তো জীবন! পরে আফশোস করার মানে রয়েছে কি?



উপার্জন করে কী লাভ! বরং এতে ভাল করে তারা ঘরটা সামলাতে পারবে। দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু এইটাই সমাজে একটা প্রথার মতো ছিল, তাই এটা এখনও অনেকেরই মাথার মধ্যে রয়ে গিয়েছে। দুঃখের বিষয়, অনেক মেয়েরা এটা বিশ্বাসও করে। হোমমেকার শব্দটা যেন মেয়েদের সঙ্গেই যায়! 'ঘর' তো দু'জনে মিলেই গড়ে। মেয়েরাই সামলাবে, এরকম কোথায় লেখা রয়েছে? আর বাইরে কাজ করলেই বা কেন মেয়েরা সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে, বাড়িতে কী হচ্ছে, বাচ্চা কী করছে— সেদিকে সে নজর দিতে পারছে না ভেবে? এই সঙ্কোচ থেকেই আসে মেয়েদের ওয়র্ক-লাইফ ব্যালান্সিংয়ের সমস্যা। ধরা যাক, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করেন। বাচ্চার স্কুলের পেরেন্টস-টিচার মিটিং। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্বামী বলছেন, 'অফিস ম্যানেজ করতে পারব না'। কিন্তু স্ত্রীকে যেভাবেই হোক অফিস সামলে বাচ্চার স্কুলের মিটিংয়ে যেতে হয়। স্ত্রীয়ের অফিস মানেই কি সেটা 'ম্যানেজ' করা যায় চাইলেই? এই ধারণাই কি পুষে রেখেছি আমরা? কিন্তু দুর্ভাগবশত এই ধারণাকেই জিইয়ে রাখেন অনেক মেয়েও। সারাদিন অফিস করছেন বলে তাঁরা বাচ্চাকে সময় না দেওয়ার 'অপরাধবোধ' কাটাতে দামি-দামি উপহার এনে দিচ্ছেন তাকে। সঙ্গী এবং তাঁর বাবা-মায়ের কাছে যেন নত হয়ে থাকছেন মনে মনে! কই, পুরুষটির তো সঙ্কোচ হয় না কাজের জন্য গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে বা বাইরে টুরে যেতে! এই মাইন্ডসেটগুলো ভাঙার ক্ষেত্রে মেয়েদের দায়িত্বও কিন্তু অনেকটা। নিজের মূল্য নিজে না বুঝলে অন্য কেউ বুঝবে, এমন আশা করাও কি ঠিক?

'ছেলেদের পেশা'য় মেয়েরা

তবে আশার কথা এটাই যে, এতকিছুর পরেও মেয়েরা কিন্তু থামছে না। পেশাদার জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। সমাজ এখনও অনেক পেশাকে 'ছেলেদের পেশা' বলে দাগিয়ে রেখেছে— যেমন ড্রাইভিং বা বাউন্সারের কাজ। এ সব পেশায় মেয়েরা এলে এখনও অনেকেরই ভুরু কুঁচকে যায়। অনেকেই মনে করেন মেয়েরা শারীরিকভাবে 'দুর্বল', ফলে এগুলো 'তাঁদের কাজ নয়'। তাঁদের জন্য তো শিক্ষকতা বা নার্সিংয়ের মতো পেশা রয়েইছে! তারা সেবা করুক, কারণ ওতেই তারা সবচেয়ে পারদর্শী। যুগযুগান্তর পুরনো 'সেবাদাসী'র ধারণার বীজ এখনও উপ্ত হয়ে রয়েছে অনেকের মনেই। কিন্তু মেয়েরা বিভিন্ন পেশাকে বেছে

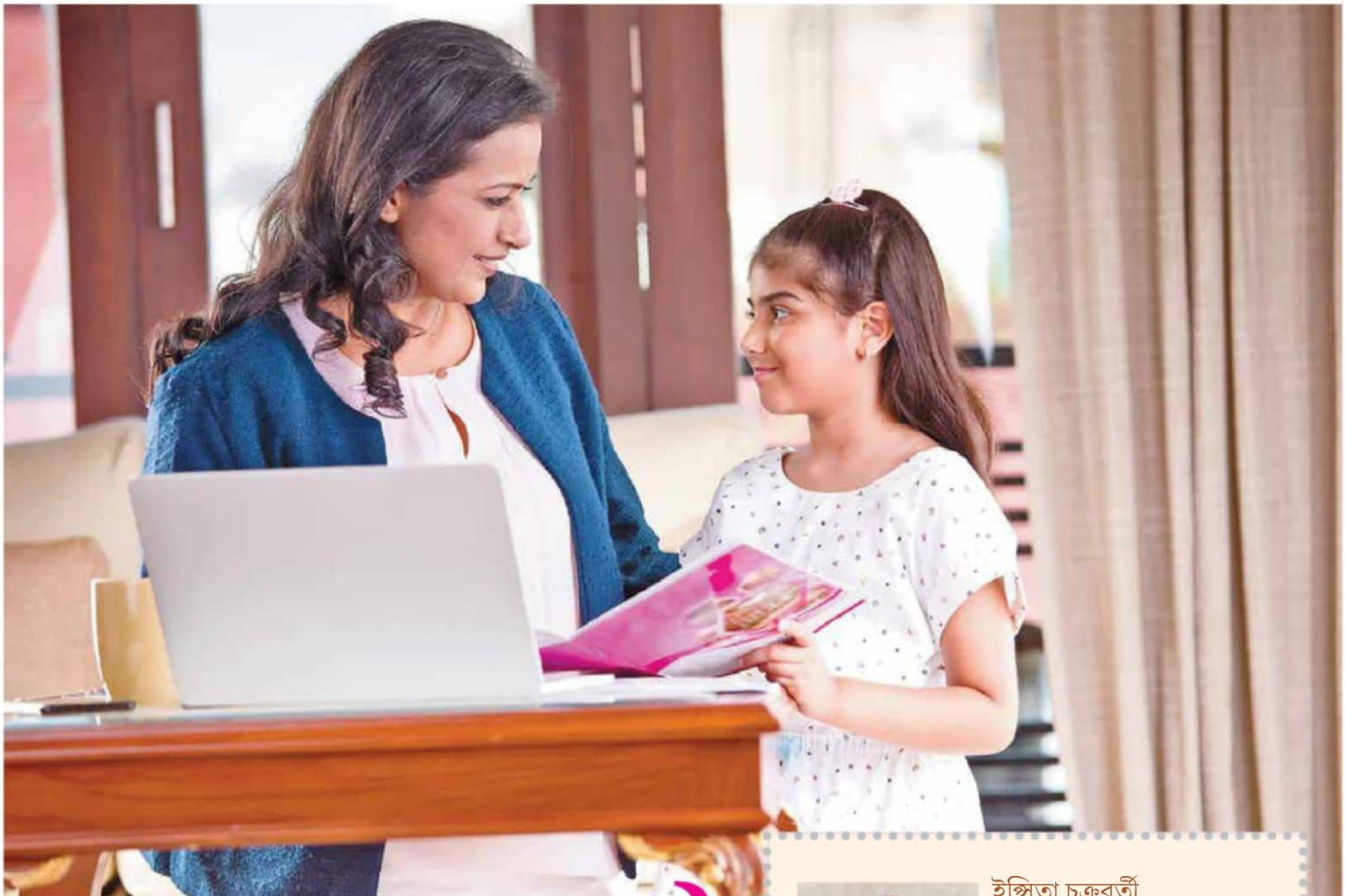
মৈত্রী চৌধুরী

ব্যাঙ্ক আধিকারিক



আমার চাকরিজীবনে আমায় কখনও লিঙ্গবৈষম্যের শিকার হতে হয়নি। পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই কাজ করেছি বরাবর। কর্মসূত্রে যখন কোনও স্বীকৃতি পেয়েছি আরও সহকর্মীদের সঙ্গে, হয়তো দেখেছি তাঁদের মধ্যে দশজনই পুরুষ, আমরা দু'জন মহিলা। পুরুষরা কিন্তু সেখানে স্বীকৃতি দিতে কোনও কার্পণ্য করেননি। বেশিরভাগ মেয়ের মধ্যে আমি কাজের ক্ষেত্রে একশো শতাংশ দেওয়ার চেষ্টাটা দেখতে পাই। অনেক বেশি ফোকাসড তাঁরা। পরিবারকেও তাঁরা অনেক বেশি পাশে পান আগের তুলনায়। সকলেই বুঝতে শিখছেন যে পুরুষ এবং নারী যদি হাত মিলিয়ে এগিয়ে না যান, তাহলে সংসার নামক গাড়িটা চলবে না। এ জন্যই বিভিন্ন পেশায় মেয়েদের আমরা আগের তুলনায় অনেক বেশি দেখতে পাই— তথাকথিত 'পুরুষদের পেশা'তেও।





কোভিডের পর অর্থনীতির অবস্থা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখানে সংসারে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীর রোজগারটা কিন্তু আর বিলাসিতা নয়। এটা প্রয়োজন। চারটে হাত রোজগার না করলে সংসারের চাকা মসৃণভাবে ঘুরছে না...।

নিচ্ছেন, পেশার প্রতি তাঁদের প্যাশন থেকেই। তাঁদের হয়তো সবসময় মাথাতেও থাকে না যে পুরুষদের পাশাপাশি নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। এখানেও চলে আসে পরিবারের প্রসঙ্গ। একজন পুরুষ ছোট থেকে নিজের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে যে ব্যবহার হতে দেখছেন, বড় হয়ে যে ব্যবহারটা নিজেও করছেন— বাড়ির বাইরেও মেয়েদের প্রতি তাঁর সেই মনোভাবই থাকছে। তাই তো মেয়ে ড্রাইভার হলেই তাঁরা বলতে থাকেন, ‘এই রে, ঠুকে দেবে’! বা কোনও বার-এ মহিলা মিক্সোলজিস্ট দেখলেই মনে হয়, এর সঙ্গে তো ফ্লার্ট করাই যায়! এতদিকে, এত কিছুর সঙ্গে রোজ লড়ে, কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হয় মেয়েদের। মুখের কথা?

কতটা পালটেছে অবস্থা?

এখনও অনেক সমস্যা থাকলেও বেশ কিছু জিনিস নিশ্চয়ই পালটেছে। কোভিডের পর অর্থনীতির অবস্থা যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেখানে সংসারে স্বামীর পাশাপাশি স্ত্রীর রোজগারটা কিন্তু আর বিলাসিতা নয়। এটা প্রয়োজন। চারটে হাত রোজগার না করলে সংসারের চাকা মসৃণভাবে ঘুরছে না, এটা সকলেই বুঝতে পারছেন। ফলে সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকতে গেলে রোজগার করাটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে, পুরুষ-নারী দু’ক্ষেত্রেই।

মানসিকতাও বেশ খানিকটা বদলেছে। ধরা যাক, একজন মা, যিনি সারা জীবন বাইরে বেরতে পারেননি, ঘর-সংসার দেখতে হয়েছে। তিনি কিন্তু চাইছেন তাঁর মেয়ে যেন আগে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হয়, তারপর বিয়ে করে। পরবর্তীতে কোনও সমস্যা হলে যেন নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মতো সংস্থানটুকু তার থাকে। সমাজের প্রতিটা স্তরেই এই



ইপ্সিতা চক্রবর্তী

বেভারেজ কনসালট্যান্ট

মিক্সোলজিকে পুরুষদের পেশা কখনওই বলা যায় না, কারণ অনেক মেয়েই কাজ করছেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে। তবে পুরুষপ্রধান পেশা তো বটেই। এবং একটা মেল ইগোও রয়েছে, যেটা এ দেশে একটু বেশি বলেই আমার মনে হয়। একজন মেয়ের থেকে কাজের ব্যাপারে নির্দেশ নেব, নতুন আইডিয়া নেব— অনেক পুরুষই এটা মানতে পারেন না। মিক্সোলজির ‘পুরুষদের পেশা’ হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ আমার মতে হল, এই পেশায় যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে গভীর রাত, কখনও ভোরও হয়ে যায়। কলকাতায় একটা সময় এক্সাইজ় রুল ছিল, একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর মেয়েরা ‘বিহাইন্ড দ্য বার’ থাকতে পারবেন না। ফলে মেয়েরা খুব বেশি কাজ করতে পারতেন না। তা ছাড়া অনেকেই বার-এর পিছনে মেয়েদের দেখলে ফ্লার্ট করতে চান। মেয়েরা সবসময় এগুলো হ্যান্ডল করে উঠতে পারেন না। আমার বাড়িতে একটা চিন্তার কারণ ছিল অত দেরি করে অ্যাপ-ক্যাবে বাড়ি ফেরা। যদিও মা-বাবা সবসময় শহরে থাকেন না বলে আমার দেরি করে বাড়ি ফেরা নিয়ে ততটাও সমস্যা হত না। তা ছাড়াও মা প্রথমে চাইতেন ন’টা-পাঁচটার চাকরি করি। কিন্তু বাবা সবসময় পাশে থেকেছেন। বন্ধুবান্ধবরা, পারিবারিক বন্ধুরাও অনেক সাপোর্ট করেছেন। কাজ শেষ হতে লেট নাইট হলে তাঁদের বাড়িতে থেকে যেতে পেরেছি। পরে মা-ও বোঝেন যে, আমার কাজটা শুধু অ্যালকোহল নিয়ে নয়, পানীয় নিয়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গির বদলটা প্রয়োজন।

সচেতনতা দেখা যাচ্ছে। ধরা যাক, কারও বাড়ি কাজ করে যাঁর দিনযাপন হয়, তিনিও চাইছেন না তাঁর সন্তানের জীবন তাঁর মতো হোক। তাই তিনি সন্তানকে পড়াশোনা করিয়ে, নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন— এটা এখন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। সুতরাং, বদল আসছে। তবে এখনও অনেকটা পথ পেরোনো বাকি।

কিন্তু সব শেষে একটা প্রশ্ন মনে আসেই। রোজগার করলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? না বোধহয়! অনেক তথাকথিত শিক্ষিত পরিবারেও দেখা যায়, পুরুষ-নারী দু'জনেই রোজগার করছেন। কিন্তু সংসারের জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এখনও পুরুষটিরই! এই সম্মানবোধের অভাবটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক— এবং এরই প্রভাব পড়ে গিয়ে কর্মক্ষেত্রে, পুরুষ-নারীর পেশাদার সম্পর্কেও! সুতরাং, এই মানসিকতা ধুয়ে ফেলার অভ্যেস অত্যন্ত জরুরি। আর প্রয়োজন স্বীকৃতি। মেয়েরা যে পেশাদার জগতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, তার স্বীকৃতি যদি সমাজ ঠিকভাবে দেয়, তবেই তো তাঁরা আরও ভাল কাজ করার মনের জোর ও সাহস পাবেন! এই স্বীকৃতিও কিন্তু সমাজের 'প্রাইমারি ইউনিট' পরিবার থেকেই আসা প্রয়োজন। আর পিতৃতান্ত্রিক না হলেই পরিবার বা সমাজের পাল্লা মাতৃতান্ত্রিকতার দিকে ঝুঁকে যাবে, এটাও তো কাম্য নয়! সমান সমান হোক না! যেখানে পারস্পরিক সম্মান থাকবে। বন্ধুত্ব থাকবে। একে অপরকে ভরসা করার, আনন্দের পাশাপাশি কঠিন মুহূর্তগুলোও ভাগ করে নেওয়ার পরিসর থাকবে। হাত বাড়ালেই যদি বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া যায়, সংসার বা জীবনের চড়াই-উতরাইগুলো পেরোতে অতটাও কষ্ট কিন্তু হবে না!

যোগাযোগ: ganguli333@gmail.com

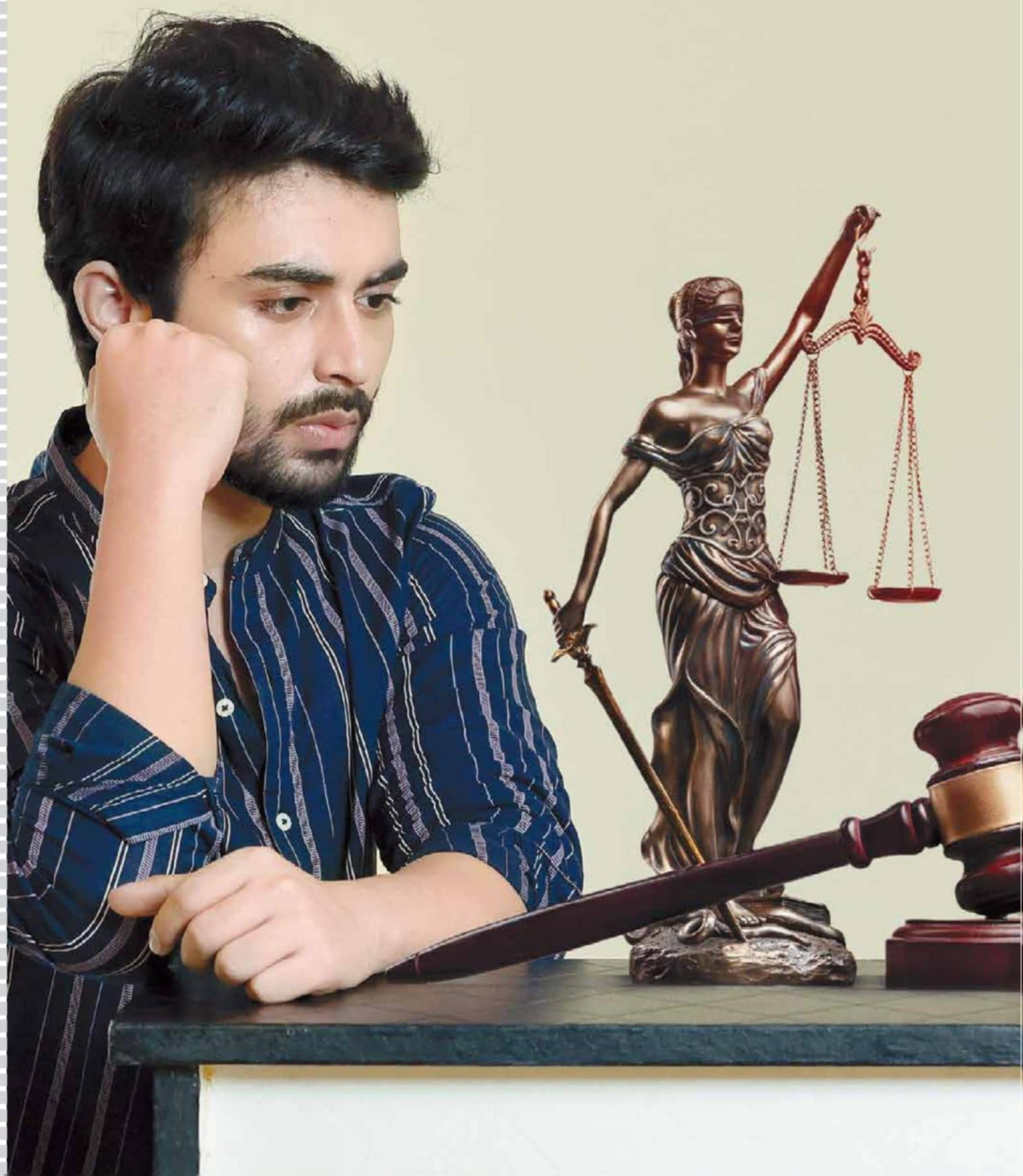
প্রথম ও শেষ পাতার ছবি: মডেল: দেবলিনা
মেক-আপ: প্রীতম দাস
লোকেশন: দ্য স্ট্যাডেল,সল্টলেক স্টেডিয়াম, গেট নং. ৩, সেক্টর-৩
ফোন: ৮৬২১০২০০৬১
ছবি: সুদীপ্ত চন্দ
অন্যান্য ছবি: আইস্টক

শৈবা সর্দার
ড্রাইভার



ছোট যখন ছিলাম, কোনও মেয়েকে গাড়ি চালাতে দেখলেই মনে হত, আমিও যদি পারতাম! কিন্তু ভাবিনি কখনও স্বপ্ন সত্যি হবে। আমি নার্সিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছি, পার্লারেও কাজ করেছি। হঠাৎই একটা জায়গার খোঁজ পাই, যারা মেয়েদের গাড়ি চালানো শিখিয়ে কাজেরও ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে বিভিন্ন ভাল ভাল ক্লাস হত। পার্লার থেকে ছুটি নিয়ে যেতাম। পরীক্ষায় পাশ করে গিয়েছিলাম এক চান্সে! চাকরিও পেয়ে গিয়েছিলাম এক বছরের মধ্যে। আমার মা এবং দাদা সবসময় পাশে ছিলেন। মা সবসময় বলতেন, 'মেয়েরা কোনও কাজে পিছিয়ে নেই।' কিন্তু বাইরের লোকেরা নানা কথা বলে শেখার সময় থেকেই। বলে, 'ড্রাইভারির লাইনে গিয়েছে, ওর স্বভাবচরিত্র কি আর ভাল থাকবে?' রাতে যখন ফিরি, তখন কত বাঁকা কথা শুনতে হয়! গাড়ি নিয়ে যখন রাস্তায় বেরোই, তখনও মেয়ে বলে নানা কথা বলে লোকে। আমি নাকি হালকাভাবে গাড়ি চালাচ্ছি। কেউ আবার ইচ্ছে করে গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। কিন্তু বাইরের লোকের কথা কানে নিলে কি চলে? আমার পরিবার আমার পাশে আছে, যাঁর জন্য গাড়ি চালাই তিনি আমাকে ভরসা করেন। আমি নিজেও কাজ করে ভালভাবে সংসার চালাতে পারছি। নিজের কাজটাই খালি মন দিয়ে করতে চাই।







নারী, আইন ও ‘স্বাধীনতা’

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরে সমাজে নারীর অবস্থান ঠিক কী? সমাজে লিঙ্গসাম্য কোথায় দাঁড়িয়ে? আলোচনায় সমাজতত্ত্ববিদ রুচিরা গোস্বামী। লিখছেন অনিকেত গুহ।

নারী ও নর এখন সর্বার্থেই পরিপূরক। ‘ঘরে বাইরে’ এখন তাঁদের খ্যাতি। দেশের পঁচাত্তরটা বসন্ত পেরনোর পরও মেয়েদের রক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন হয়। লিঙ্গসাম্যের জন্য পথে নামতে হয়। আরও একটা ১৫ অগস্ট উদ্‌যাপনের সঙ্গেই আসুন নারী ক্ষমতায়ন ও আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ-তৃতীয় লিঙ্গের রিল বনাম রিয়্যালিটির হিসাবটা একবার দেখে নিই।

অধিকারের আলো

‘ক্ষমতায়ন’ অর্থাৎ ক্ষমতা প্রদান। এখন প্রশ্ন হল নারীদের ক্ষমতা কি সত্যিই কম? এর উত্তরটা সহজ। ফুলের সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে ছোট্ট একটা কুঁড়িতে। নারীসমাজও ঠিক তাই। সময়ের বিভিন্ন বাধা তাদের কুঁড়ি থেকে ফুল হতে দেয়নি। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়েও তাই সাংবিধানিক রক্ষাকবচ জরুরি হয়ে পড়েছে। পুরাণের দুর্গা আখ্যান থেকে শুরু করে বর্তমানের তিলোত্তমা-- কণ্ঠ তোলার সুযোগ আগের তুলনায় অবশ্যই অনেকগুণ বেড়েছে। তবে ফারাক রয়েছে জেন্ডার গ্যাপে। ন্যাশনাল বা গ্লোবাল স্তরের বিভিন্ন রিপোর্টে সহজেই চোখে পড়বে সেই বিস্তর ব্যবধান। ১৯৭৪-৭৫ সাল নাগাদ বের হয় ‘টুওয়ার্ডস ইকুয়ালিটি’ শীর্ষক একটি রিপোর্ট। যেখানে ভারতীয় সমাজে নারীদের ভূমিকা ও স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে তাদের অবস্থানের এক লার্জ স্কেল পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। দেখা যায় ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থান শুধুই অন্দরমহলে, তার সার্বিক বহিঃপ্রকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। বর্তমানে নারীকণ্ঠ অনেক জোরালো হলেও সমাজের মরচে পড়া মানসিকতার বদল হয়নি। এবার দেখা যাক ২০১১ সালের সেনসাস, যেখানে বলা হচ্ছে ভারতে এজ-সেক্স রেশিও বা বয়স-লিঙ্গ অনুপাত প্রতি হাজারে ৯৪৩ জন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতেই পারে

> নারীবাদের যে বোল্ড রূপ আগে কাগজে কলমে দেখা যেত এখন তার পরিসর বিস্তৃত হয়েছে; দু’হাতেই আজ তারা দশভুজা



এই পরিসংখ্যানে ভারতে নারীদের অবস্থান ও তার উত্তরণ রীতিমতো তাকলাগানো। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলোর দিকে তাকালে তবেই বোঝা যাবে এই প্রগ্রেস 'যাহাই বাহান্ন তাহাই তিপান্ন' ভিন্ন কিছু নয়। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এগিয়ে গেলেও সমাজনীতি সেই তিমিরেই। তাই সামাজিক পরিকাঠামোও বিশেষ ফ্লারিশ করেনি। নারীসত্তা একমাত্রিক বা মনোলিথ নয়। চোখের সামনে থাকা সমাজের উচ্চস্তরের নারীরা কিন্তু কখনই সমগ্র নারীজাতির প্রতিনিধি হতে পারেন না। যিনি থ্রি.বি.এইচ.কে ফ্যাট থেকে বেরিয়ে ক্যাব বুক করে পার্টিতে যাচ্ছেন তিনিও নারী। আবার যিনি একরাশ কালো অন্ধকার বুকে নিয়ে খনিতে নেমে স্বামীর হাতে কাঠের কোদাল এগিয়ে দিচ্ছেন তিনিও নারী। এঁরা দু'জনেই লিঙ্গে সমকক্ষ। কিন্তু যাপনে যোজন দূরত্বে। তাই নারীস্বাধীনতা বা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি শুধুই লিঙ্গের উপর নির্ভর করে না। তাঁর আর্থসামাজিক অবস্থান নির্ধারণ করে তাঁরা কতটা অধিকারের আলো পাবেন। তাই শহুরে আধুনিক নারীসমাজ আর দলিত সম্প্রদায়ের নারীদের মধ্যে চিরাচরিত ফারাকটা রয়েই গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

একুশে আইন

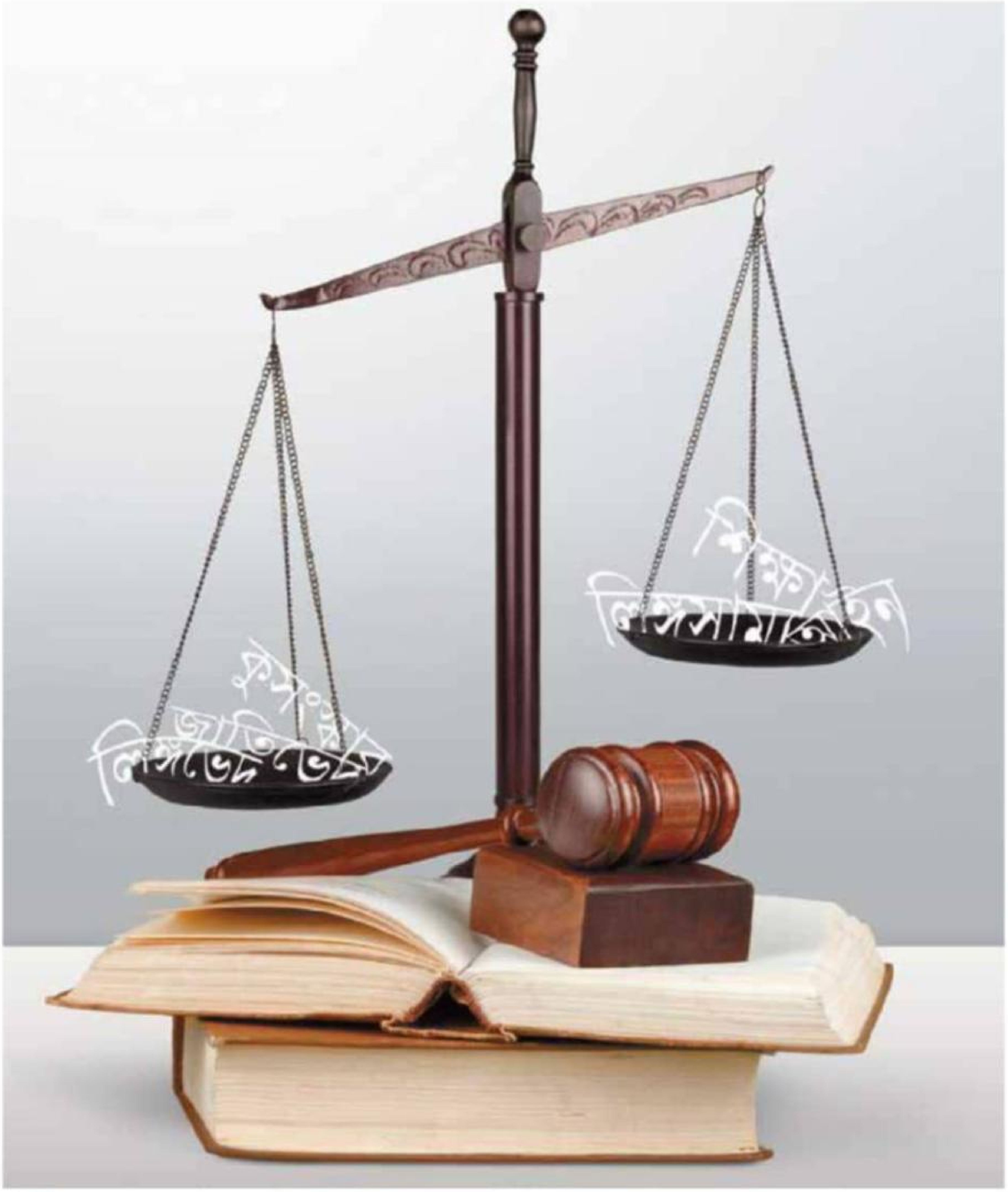
নারীস্বাধীনতার জয়যাত্রায় আইনি পরিকাঠামোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভারতীয় সংবিধানে নারীস্বাধীনতা বিষয়টিকে রাখা হয়েছে 'কংকারেন্ট লিস্টে'-এর আওতায়। সহজে বললে দাঁড়ায় ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্ট বিষয়টি রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারের অধীনস্থ। একটু ইতিহাসের পাতা ওল্টালে চোখের সামনে পরতে পরতে উঠে আসবে আমাদের দেশের নারী ক্ষমতায়নের জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমবারের জন্য ওম্যান ওয়েলফেয়ার ও ডেভেলপমেন্টের সুপারিশ করা হয়। দেশের চরম রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও মানুষ নারীস্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সেই শুরু। তারপর একে একে 'চাইল্ড ম্যারেজ রিস্ট্রেন্ট অ্যাক্ট' (১৯৭৯), 'সতী প্রহিবিশন অ্যাক্ট' (১৯৮৮), 'ন্যাশনাল কমিশন ফর ওম্যান' (১৯৯০), পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যাল ভোটে সিট রিজ়ার্ভেশন, সাম্প্রতিককালে মহিলাদের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স আঠেরো থেকে বাড়িয়ে একুশ করা— এই সবই ওম্যান এম্পাওয়ারমেন্টের বিভিন্ন দিক। মনে করা হচ্ছে এর ফলে সমাজে লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস পাবে। প্রশ্ন হল সমাজে কি আজকে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠিত? শিশু নির্যাতন কি লুপ্তপ্রায়? ওয়েভলেংথের গতিতে ছুটতে থাকা মানুষের জীবনে লিঙ্গ কি সত্যিই কোনও প্রভাব ফেলছে না? এ রকমই কিছু প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে।

অনেকাংশেই দেখা গিয়েছে নারীসুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন আইন-কানুন থাকলেও তার প্রয়োগ নামমাত্র। আপনারাই ভাবুন না, যে মহিলা আপনার বাড়িতে কাজ করেন বা যিনি রোজ সকালে রাস্তা পরিষ্কার করেন তাঁদের কি বিন্দুমাত্রও ধারণা আছে নারী ক্ষমতায়ন সম্পর্কে? দেশের সংবিধানে ক'টা আইনে তাদের কথা বলা হয়েছে বা বিপদে পড়লে কোন ইমার্জেন্সি নাম্বারে ডায়াল করতে হয়— এ সব তাঁদের কাছে এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। আমাদের দেশের সামাজিক পরিকাঠামো এই অজ্ঞানতার অন্যতম অনুঘটক। কথায় বলে এডুকেশন ইজ় দ্য থার্ড আই। কিন্তু অর্থোডক্স ধ্যান-ধারণার রক্তচক্ষু এখানেও সজাগ। আইন বিষয়ক যে কতিপয় সাবজেক্ট ইন্ডিয়ান এডুকেশন সিস্টেমে রয়েছে তার মধ্যে পলিটিক্যাল সায়েন্স, সিভিকস্, ল বা আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে সবকটি বিষয় মোটামুটিভাবে মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষার অন্তর্গত। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে, যেখানে সাক্ষরতার হার ৭৪.০৪ শতাংশ (২০১১ সেনসাস) সেখানে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আইন সংক্রান্ত কোনও বিষয়ই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই আইন নিয়ে জনমানসে কোনও ধারণা তৈরি হয়নি। যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমরা দেখতে পাই আমাদেরই চারপাশে।

লিঙ্গসাম্যের দাঁড়িপাল্লা

আইনের লিঙ্গভেদ? তা-ও আবার হয় নাকি! তা সত্ত্বেও 'সব আইন-ই তো মেয়েদের, ছেলেরা পাবে কী'— এরকম ধারণা সমাজমানসে এখনও রয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতীয় আইনও কি জেন্ডার বায়াসের ঊর্ধ্বে নয়? আসলে আইনের লিঙ্গভেদ একটা সামাজিক স্তরায়ন মাত্র। আইন সকলের জন্য— সেখানে পুরুষ-নারী বাছবিচার নেই। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, মৌলিক অধিকার থেকে মৌলিক কর্তব্য, লিগাল রাইট থেকে সিভিল রাইট প্রতিটা ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ ধারা(বিবাহিত মহিলা শ্বশুরবাড়িতে নিষ্ঠুরতার শিকার ও শাস্তির বিধান), ৩৫৪ ধারা (শ্লীলতাহানি বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগে শাস্তির বিধান), ৫০৯ ধারা (আপত্তিকর ইঙ্গিত, উক্তি বা শব্দ করায় ব্যাক্তির শাস্তির বিধান) ইত্যাদি অনেকরকম আইনের পসরা রয়েছে ভারতীয় সংবিধানে। আবার এই আইন অপব্যবহারের উদাহরণও মেলে বিস্তর। এর বাস্তবভিত্তি কতটা নাকি নারীসমাজের উদ্দেশ্যে ভিন্ন প্রচার--সত্যতা প্রশ্ন চিহ্নের সামনে। কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গ? এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের অধিকার? নাগরিকত্বের মান্যতা পেলেও তৃতীয় লিঙ্গ সংক্রান্ত ধারণায় তেমন স্বচ্ছতা নেই। নারী-পুরুষ বাইনারির বাইরেও যে একটা ইন্সটিটিউশন আছে তা মনে রাখে কতজন? সম্প্রতি ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৭ ধারায় কিছু পরিমার্জন হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক সমলিঙ্গের ব্যক্তি যদি সমকামী সম্পর্কে থাকেন, তবে তা অপরাধ নয়। এই পরিমার্জন নিঃসন্দেহে উন্নত সামাজিক মানসিকতার পরিচায়ক। কিন্তু আইনের বাস্তবতা আজও 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। বিবাহের অধিকার, পেরেন্টিং-এর অধিকার, উত্তরাধিকার সমস্ত বিষয়টাই অমীমাংসিত। হয়তো ভবিষ্যতে এর সদুত্তর পাওয়া যাবে। লিঙ্গ-আইন-অধিকার-- একে অন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত। এ নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা যেমন থাকবে, তার সমাধানও আসবে। 'আধুনিকতা'কে ক্লাউড স্টোরেজে সাজিয়ে না রেখে রোজকার জীবনে অ্যাপ্লাই করে দেখুনই না। ২০২৩-এর স্বাধীনতা দিবসের আগে যাতে নারী-পুরুষ নয়; প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় লিঙ্গ নয়; সকলে একসঙ্গে বলতে পারি, আমরা মানুষ! আমরা ভারতীয়!



> আইন নারী-পুরুষের নয়, মানুষের কথা বলে। প্রাচীন সময় থেকে চলে আসা বিভিন্ন ঘৃণ্য ও অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে নারীকেন্দ্রিক কিছু আইন আনা হয়েছে। নারীর আব্রু রক্ষায় আইনের এই ঢাল বারবার ব্যবহৃত হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।



যোগাযোগ: ৯৮৩০৫৫০০৮০
ইমেল: ruchira.goswami@gmail.com

মডেল: দেবলিনা, কুণাল, **মেক-আপ:** প্রীতম দাস, **ফোন:** ৮৬২১০২০০৬১, **লোকেশন:** দ্য স্টেডল, সল্টলেক স্টেডিয়াম, গেট নং ৩, সেক্টর-৩, **ফোন:** ৯৮৭৪১৪০৭১২, **ছবি:** সুদীপ্ত চন্দ



শাড়ির বর্তমান পাওয়ার স্টেটাসের অনেকটা কৃতিত্বই ইন্দিরা গান্ধীর



ছোট চুলের গ্লোবাল ট্রেন্ড আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এদেশে

মেয়েদের অগ্রগতি

ছক ভাঙছে পোশাক-তন্ত্র?

মেয়েদের সৌন্দর্যের ধারণা থেকে পোশাক নির্বাচনের স্বাধীনতা... গত কয়েক দশকে বদল এসেছে প্রচুর। কিন্তু তথাকথিত 'মেয়েলি' সাজগোজ বা 'চোখ টানা সুন্দরী'র কনসেপ্ট থেকে প্রকৃতই কি পুরো বেরতে পারছি আমরা? লিখছেন সায়নী দাশশর্মা ও মধুরিমা সিংহ রায়।

উনবিংশ শতকের শুরুর দিক। তখন কেরলের শাসনভার ছিল ত্রিভাঙ্কুরদের হাতে। ভারী অদ্ভুত এক নিয়ম ছিল তাঁদের শাসনকালে। সেসময় মহিলাদের স্তনের উপর 'মুলাক্করম' নামক একরকম শুল্ক প্রযোজ্য ছিল। নিয়ম ছিল এরকম যে, ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণি, বিশেষত দলিত মহিলারা স্তন আবৃত রাখতে চাইলে তাঁদের কর দিতে হবে। এই শুল্কের পরিমাণ আবার নির্ভর করত স্তনের আকারের উপর। নগদ অর্থ নয়, সাধারণত কলাপাতায় মুড়ে চাল আদায় করা হত কর



হরনাম কউর

সহ একাধিক অবৈধ শুল্ক তুলতে বাধ্য হন রাজপরিবার। ইতিহাস ঘাঁটলে নাঙেলির মতো বীরাঙ্গনাদের নাম হয়তো আরও মিলবে, যাঁরা সমাজের একপেশে নিয়ম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীদের প্রতিবাদ করতে শিখিয়ে গিয়েছেন, মনে বপন করে দিয়ে গিয়েছেন ব্যক্তিস্বাধীনতার বীজ। তাঁদের আত্মত্যাগের কাহিনি সময়ের আবর্তে চাপা পড়ে গেলেও আশার আলো এই যে, নারীদের বাহ্যিক উপস্থিতি, তাঁদের সাজপোশাকের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি আজ অনেকটাই বদলেছে। আধুনিক নারীদের ক্ষমতায়নে যার ভূমিকা অনেকটাই...

বিউটি স্ট্যান্ডার্ড: অবাস্তব থেকে বাস্তবমুখী

সময়ের শুরু থেকেই মহিলাদের সৌন্দর্যকে এক অবাস্তব ছকে বেঁধে রেখেছে এই সমাজ, যার পরিণামস্বরূপ, এই একবিংশ শতাব্দীতেও মহিলাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে বিতর্কের কোনও অন্ত নেই। নিটোল মুখ, টানাটানা চোখ, ধবধবে গায়ের রং, কোমর ছাপানো চুল, তন্বী চেহারা, এই মাপকাঠিগুলোতেই এখনও বিচার করা হয় নারীসৌন্দর্যকে। এই ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরেও যে কেউ সুন্দর হতে পারেন, তা ভাবতে শেখায় না সমাজ। কিন্তু তার মধ্যেও ছক ভাঙার নজির যে একেবারে নেই, তা নয়। গায়ের রং সংক্রান্ত গোঁড়া মানসিকতাই যেমন এখন অনেকাংশে ভাঙতে সফল হয়েছেন নারীরা। তথাকথিত ফর্সা হওয়ার প্রসাধনীর

বাবদ। সেই সময় কেরালার এক উপকূলবর্তী গ্রামে বাস করতেন নাঙেলি নামক এক দলিত মহিলা। স্তন আবৃত রাখার অপরাধে একদিন তাঁর বাড়িতেও এসে হাজির হন শুল্ক সংগ্রাহকরা। অনেক জোরাজুরির পর কর দিতে রাজি হন নাঙেলি। সংগ্রাহকদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। কিছুক্ষণ পরই টলতে টলতে বেরিয়ে আসেন দু'খানি কলাপাতার পুটুলি নিয়ে। তুলে দেন দরজায় অপেক্ষারত কর-আদায়কারিদের হাতে। শুল্ক সংগ্রাহকরা উৎফুল্ল হয়ে কলাপাতা সরিয়ে দেখেন, তাতে রাখা রয়েছে দু'খানি রক্তমাখা মাংসপিণ্ড। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে নাঙেলির দিকে তাকিয়ে সংগ্রাহকরা বুঝতে পারেন, তিনি নিজের স্তন দু'খানিই শরীর থেকে আলাদা করে তিনি তুলে দিয়েছেন তাঁদের হাতে। তাঁদের চোখেমুখের আতঙ্ক মৃত্যুর আগমুহূর্তেও নাঙেলিকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তাঁর এই আত্মত্যাগ বৃথা যাওয়ার নয় এবং সত্যিই এই ঘটনার পর মুলাক্করম



সুপারমডেল উইনি হার্লো অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন এদেশের ইউথের



শাড়ির ছকভাঙা স্টাইলিং সেযুগেও হত



মহারানি গায়ত্রী দেবীর 'শাড়ি স্টেটমেন্ট' এ যুগেও ফ্যাশনেবল



দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বদলে যেত শাড়ি পরার ধরন

বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া হোক কিংবা বেস মেক-আপের শেড বৃদ্ধি করা, আপাতদৃষ্টিতে এই বদলগুলো যতই ক্ষুদ্র মনে হোক, অবাস্তব বিউটি স্ট্যান্ডার্ড ভাঙার পথে এদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না কখনওই। সৌন্দর্যে অন্তর্ভুক্তিকরণকে এই মুহূর্তে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় বা তা যতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, তা-ও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিনোদন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে হলেও সমাজ আজ বুঝতে শিখেছে, বাহ্যিক উপস্থিতির নেপথ্যে শুধু পরিচর্যা নয়, জিন, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থানের মতো একাধিক শর্তের ভূমিকা থাকে, যা কোনওভাবেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার জন্ম তো মাত্র কয়েক বছর আগে। তার অনেক আগে থেকেই কি এই পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেনি? সভ্যতার শুরুর দিকে যেমন, মহিলাদের চুল লম্বা রাখারই চল ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে ধীরে ধীরে সেই ছবিটা বদলাতে শুরু করে। মূলত শ্যাম্পু, সাবানের মতো প্রসাধনীর অভাব থেকেই প্রথমে বর্হিবিশ্বে এবং সেই সূত্র ধরে ধীরে ধীরে এদেশেও লম্বা চুল কাটতে শুরু করলেন মহিলারা। সমাজের বাঁধাধরা নিয়মের উর্ধ্বে নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং পছন্দকে এগিয়ে রাখার শুরুও সেখান থেকেই। কানের নীচ অবধি চুল, যাকে সকলে 'বব কাট' বলে চেনেন, তার প্রথম মহিলা প্রবর্তক ছিলেন



তোশাদা উমা

আইরিন কাসল নামক এক আমেরিকান নৃত্যশিল্পী। এরপর একে শিনন, রোম্যান্টিক কার্লস হয়ে প্রিন্সেস ডায়ানার যুগান্তকারি হেয়ারকাট এবং আটের দশকের রক-সংস্কৃতির হাত ধরে এজি হেয়ার স্টেটমেন্টে অভ্যস্ত হতে শিখেছে এই সমাজ। এদেশে সেই ছক ভেঙেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী, কিরণ বেদি, রিনি সাইমন খন্নার মতো ব্যক্তিত্বরা। আর তাদের উত্তরসূরী হয়ে শেভড টেম্পল এমনকী ক্লিন শেভড স্ক্যাল্পও স্বচ্ছন্দে ফ্লন্ট করছেন আধুনিক নারীরা। একটা সময়ে শ্যামলা রঙের মেয়েরা উজ্জ্বল বোল্ড রঙের লিপস্টিক পরবে, এমনটা ভাবাই যেত না! গায়ের রংয়ের নিরিখে সাজগোজ করতে হত। গায়ের রং কালো, কিন্তু বোল্ড ফুশিয়া লিপস্টিক? ওমনই সমাজের কটূ কথা কানে ভেসে আসতে বাধ্য। এখনও যে সে ট্রেন্ড পুরো বদলেছে তা নয়। কিন্তু অনেকটাই বদলেছে। গায়ের রং যেমনই হোক, সাম্প্রতিক কালে নুড লিপস্টিক পরছেন অনেকেই। শুধু হেয়ারস্টাইল বা কমপ্লেকশনই নয়, বর্তমানে আর্মপিট হেয়ার, আনশেভড বডিহেয়ার, প্লাস সাইজ় ফিগার, ফ্রন্ট টিথ গ্যাপের মতো অসংখ্য নতুন 'ট্রেন্ড'ও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন মহিলারা। শ্বেতী, জরুলের মতো 'বিশ্রী' বিশেষত্বগুলো আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ক্যারি


ম্যাডোনার মতো একাধিক ভারতীয় সেলেব আর্মপিট হেয়ার শো-অফ করেছেন

করছেন। অবাস্তব, সেকেল বিউটি স্ট্যান্ডার্ডকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন উইনি হারলো, সোফিয়া হাজিপ্যান্টেলি, হরনাম কউর থেকে এদেশের তোশাদা উমা কিংবা সাম্প্রতিক সময়ে ভাইরাল হওয়া কেরালার শৈজা। বদল এসেছে মডেলিং এবং বিজ্ঞাপনের জগতেও। নিঁখুত, তন্বী চেহারা না থাকলেও যে বিলবোর্ডের মুখ হয়ে ওঠা সম্ভব, বা র‍্যাম্প আলো করা সম্ভব, সেই আত্মবিশ্বাস দেখানোর সাহস করছেন অনেকেই। এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা বাকি হলেও, ধীরে ধীরে যে নারীসৌন্দর্য বাস্তবমুখী হয়ে উঠছে, তা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক।

শাড়ি: নিছক বারো হাতের কাপড় নয়

ইতিহাস অনুযায়ী, এদেশের শাড়ির প্রচলন সেই সিন্ধু সভ্যতার সময়ে। যদিও শাড়ির বর্তমান আভিজাত্য বা গ্ল্যামার, কোনওটাই তখন ছিল না। স্রেফ নারীদের শালীনতা বজায় রাখতে যে পোশাকের প্রচলন, তা স্টেটমেন্টে পরিণত হতে শুরু করে এদেশে বিদেশিদের আগমনের সময় থেকে। সমাজের বিত্তশালী পরিবারের মহিলারা শাড়ি বুননকারীদের দিয়ে বিভিন্ন নতুন ফ্যাব্রিকের ব্যবহার শুরু করান, যাতে অন্যান্য স্তরের নারীদের থেকে তাঁদের আলাদা করা যায়। শুরু হল সুতো, জ়রির নকশা দিয়ে শাড়িকে গ্ল্যামারাইজ় করার চল। বাংলা-সহ বেশ কিছু অংশে আবার প্রথমদিকে এলো গায়েই শাড়ি পরতে অভ্যস্ত ছিলেন মহিলারা। কিন্তু ব্রিটিশরা এদেশে আসার পর ধীরে ধীরে ব্লাউজ়ের চল শুরু হয়। ঠাকুরবাড়ির মহিলাদের হাত ধরে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল শাড়ির ইতিহাসে। রবিঠাকুরের দাদা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তৎকালীন শাড়ি পরার ধরন ছেড়ে বেছে নিলেন পার্সি ধারাকে। শিল্পায়নের জোয়ারে ভেসে এল কৃত্রিম রং। ফুল, পাতা, পাখির মোটিফে সুসজ্জিত শাড়ি হয়ে উঠল প্রথম ভারতীয় পোশাক, যার খ্যাতি দেশের সীমানার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই সময়। আজ শাড়ি এদেশের ঐতিহ্য এবং আভিজাত্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেও, দৈনন্দিন পোশাক হিসেবে তার ব্যবহার অনেকটাই কমে এসেছে। অথচ একটা সময় শাড়ি পরেই মহিলারা অশ্বারোহণ করতেন, মাঠে লাঙল চালাতেন। প্রাক-স্বাধীনতার সময়ে শাড়ির গরিমায় এসে মিশেছিল দেশাত্মবোধের স্রোত। পিটার গনসালভেস তাঁর ২০১২ সালে প্রকাশিত বই 'খাদি: গান্ধী'জ় মেগা সিম্বল অফ সাবভার্শন'-এ শাড়িকে 'ইকো-পলিটিক্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্স, সাইকো-কালচারাল ডিগনিটি অ্যান্ড সোশিও-রিলিজিয়াস হারমনি'-র প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সে যুগে গোটা দেশেই মহিলাদের আত্মনির্ভরশীলতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল শাড়ি। সেই থেকে এখনও অবধি সময়ের বিভিন্ন পর্বে নারীদের ক্ষমতায়নেরই সাক্ষী থেকেছে এই বারো হাতের বস্ত্র। রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের মারাঠি নৌভেরি ধাঁচের ড্রেপিং থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে ইন্দিরা গান্ধী কিংবা আরও পরে জয়ললিতার মতো রাজনীতিবিদের সিগনেচার স্টাইলিং, কখনও শাড়ি নারীদের বিদ্রোহী মনোভাবের ধ্বজা উড়িয়েছে, কখনও তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নারীশক্তি এবং তাঁদের আধিপত্যের সিম্বল।

পোশাকে নারী-পুরুষ অসাম্য

২০২১-এর জুলাইতে উত্তর প্রদেশে এক টিনএজ মেয়ে তাঁরই আত্মীয়দের হাতে খুন হয়েছিলেন বলে খবরে বেরিয়েছিল। তাঁর অপরাধ? এক জোড়া ডেনিম পরেছিলেন তিনি। পারিবারিক অনুষ্ঠানে পাশ্চাত্য পোশাক পরার সাহস তাঁকে কে দেয়! শুধু পাশ্চাত্য পোশাক নয়, ওই ডেনিমজোড়ার মধ্যে দিয়ে তো তাঁর পোশাক পরার, পোশাক নির্বাচন করার স্বাধীনতাও স্পষ্ট। শুধু এই ঘটনা নয়, পোশাকের উপর রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বা সামাজিক বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া নতুন কিছু নয়। কখনও মেয়েদের পা-দেখানোয় আপত্তি, কখনও কলেজে কী পোশাক পরা হবে তা নিয়ে ফতোয়া জারি। তবে এসবের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষ অসাম্যের ধারাবাহিকতা। সময়ের সঙ্গে সেই অসাম্য অনেকটাই বদলেছে ঠিকই, তবে এখনও অনেকটাই পথ পেরনো বাকি। পুরুষতন্ত্র বরাবরই মেয়েদের শরীরের উপর একধরনের অধিকারবোধ ফলিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, 'honour of a woman is situated in her body'... এই তত্ত্ব ধরলে মেয়েদের শারীরিক আবরণের উপরেও একধরনের নিয়মনীতি ফলানোর অধিকারবোধ জন্মায়। আর তা থেকেই অসাম্য। যেমন ধরে নেওয়া হত 'প্যান্ট' শুধুমাত্র পুরুষদের পোশাক। 'পকেট' নাকি স্বাধীনচেতা মনোভাবের প্রতীক। কলোনিয়াল সময়ে 'কনসেপ্ট অফ ফেমিনিনিটি' জড়িয়ে ছিল ভারতীয়ত্ববোধের সঙ্গে। একধরনের 'পলিটিক্স অফ কালচারাল অথেনসিটি'র সঙ্গে সমার্থক হয়ে যায় মহিলাদের পোশাক পরার ধরন। বিশেষত বনেদি বাড়ির মেয়েদের পোশাকের মধ্যে দিয়ে দেশের 'আধ্যাত্মিক পবিত্রতা'কে তুলে ধরার এক তাগিদ ছিল সেসময়ে। ভারতীয়দের মতোই, সেসময়ে


এদেশের শাড়ি-সংস্কৃতিতে চিরউজ্জ্বল গায়ত্রী দেবীর নাম

ব্রিটিশরাও ভাবত যে একজন মহিলার আচার-ব্যবহার ও তাঁর স্টেটাস সরাসরি একটি দেশের 'মরাল ক্যারেক্টার'-কে সংজ্ঞায়িত করে। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কাজ করার সুবাদে কিছু পুরুষকে কেতাদুরস্ত বিলিতি পোশাক পরতেই হত। অতএব, ভারতীয়ত্ব বজায় রাখার দায়টা ছিল মূলত মেয়েদের উপরে (তথ্যসূত্র: জেনিফার লিন কোয়েস্টার)। ঐতিহাসিক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, অভিজাত বাঙালি মহিলারা সে সময়ে বাইরে বেরতে পারতেন যদি নির্দিষ্টভাবে পোশাক পরতেন। অর্থাৎ, পাবলিক ডোমেনে মেয়েদের এমন কিছু পরা শোভা পেত না, যা 'ফেমিনিনিটি'র ধারণাকেই ভেঙে দেয়! পোশাক আসলে ছিল সামাজিক 'মার্কার' বা চিহ্নবিশেষ। কে কোন পোশাক পরছেন, তার উপর ভিত্তি করে বোঝা যেত কে ভারতীয়, কে কলোনিস্ট, কে কোন শ্রেণীর, কে কোন অঞ্চলের। ব্রিটিশ আমলে যেমন মেয়েদের পোশাক ভারতীয় 'আইডেন্টিটি'র কেন্দ্রে ছিল, পোস্ট-লিবারালাইজেশন পিরিয়ডে 'মর‍্যালিটি'র সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার দায়ও বর্তাল মেয়েদের পোশাকে। আমেরিকান স্টাইলেন ডেনিম বা মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক স্টাইলের সালওয়ার কামিজের চল বাড়ল। তবে কুর্তা, সালওয়ার কামিজের মতো পোশাক কিন্তু এদেশে প্রাথমিকভাবে মধ্যবিত্ত বা কর্মরতা মহিলারাই পরতেন। পোশাকে জেন্ডার বাইনারি অনেকটা ভাঙল খেটে খাওয়া, কর্মরতা মহিলাদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তার সঙ্গে পপুলার কালচার ও গ্লোবালাইজেশনের প্রভাব তো ছিলই। ধীরে-ধীরে বদলাতে শুরু করল 'ফেমিনিনিটি' ও 'মডেস্টি'র ধারণা। তবে এখনও তো মেয়েদের পোশাকে বিধিনিষেধ রয়েছে, যে প্রসঙ্গ আগেই বললাম! বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে জেন্ডার ফ্লুইড পোশাকের ট্রেন্ড শুরু হয়েছে।



এদেশেও আজ সমান জনপ্রিয় 'ফ্রন্ট টিথ গ্যাপ'-এর ট্রেন্ড



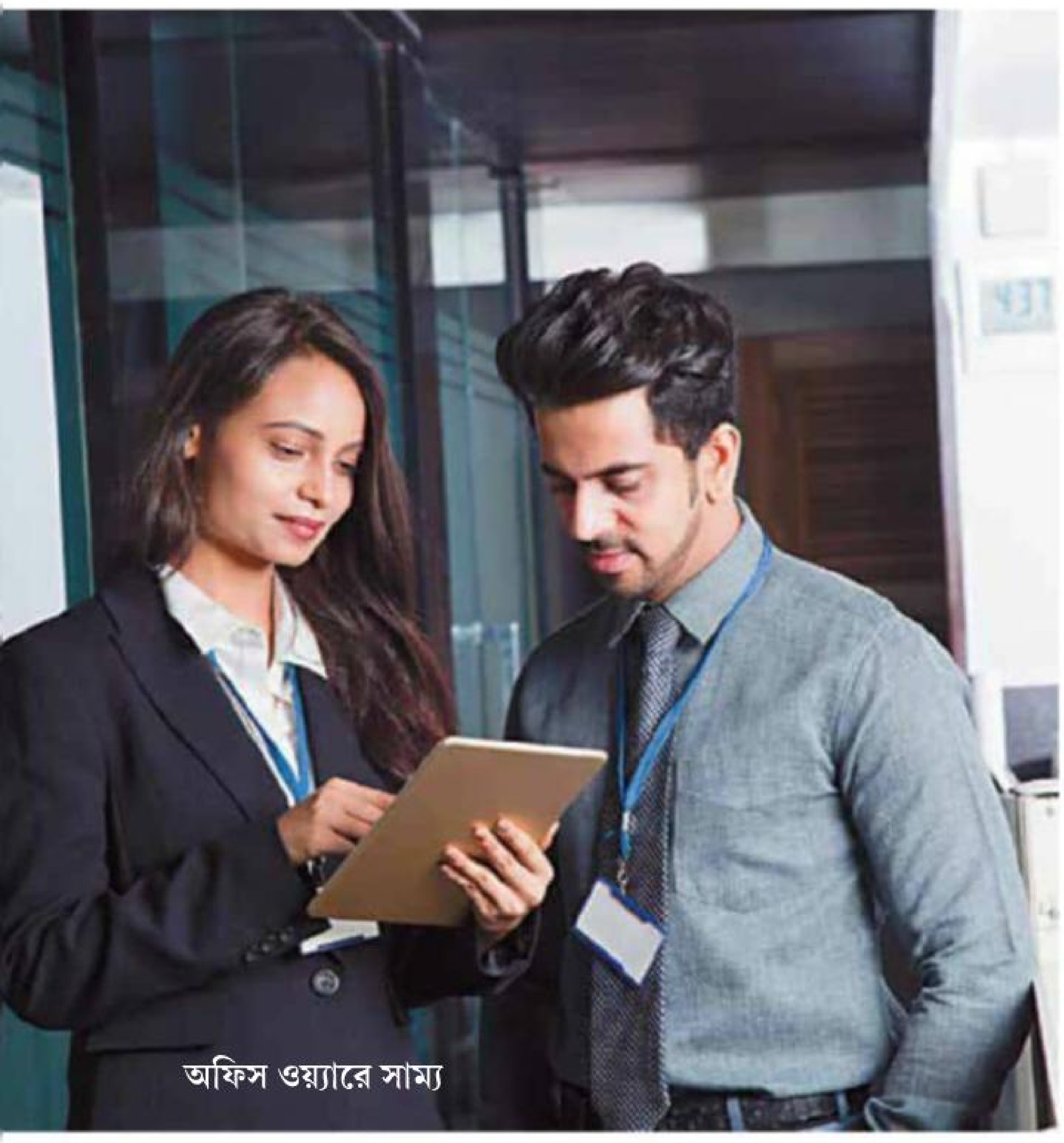
সোফিয়া লোরেন থেকে মালাইকা অরোরা, আর্মপিট হেয়ার ফ্লন্ট করেছেন অনেকেই

পোশাকের উপর রাষ্ট্রীয় ফতোয়া বা সামাজিক বিধিনিষেধ নতুন কিছু নয়। এসবের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষ অসাম্যের ধারাবাহিকতা।

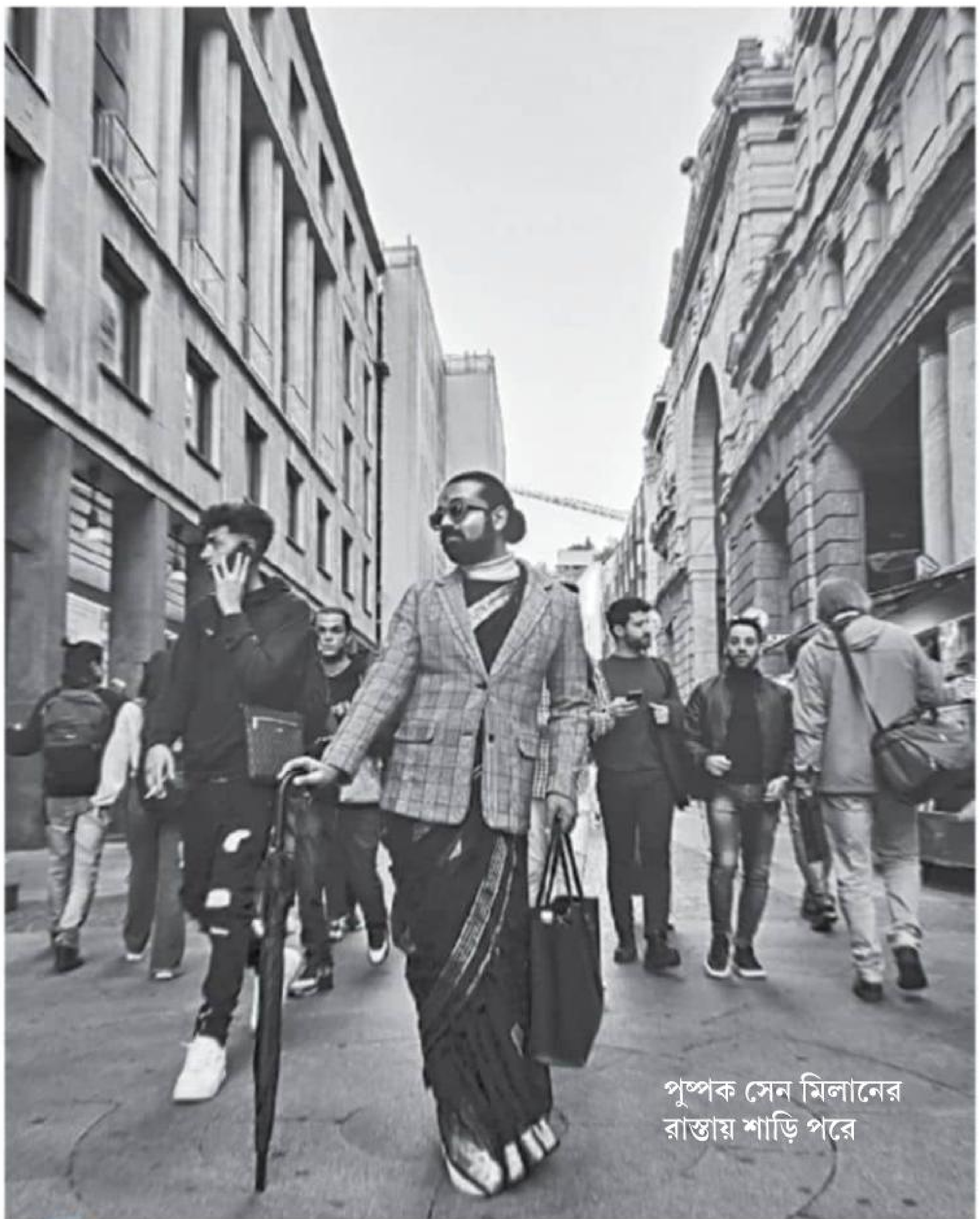
অর্থাৎ, যৌন-পরিচিতির সঙ্গে পোশাককে সমার্থক না করার ট্রেন্ড। ছেলেরাও এখন অবলীলায় শাড়ি, স্কার্ট পরছেন। মেয়েরা তো ট্রাউজ়ার্স, শার্ট পরছেনই। 'সেক্সুয়ালিটি' ও 'জেন্ডার আইডেন্টিটি'র সঙ্গে পোশাককে সমার্থক করে দেখছেন না তাঁরা। তবে এই ট্রেন্ড সারা বিশ্বে ক্রমশ নজর কাড়লেও, সাধারণ মানুষের মধ্যে কি এই ট্রেন্ড ততটা সচেতনভাবে সংক্রমিত হচ্ছে? নারী-



রিনি সাইমন খন্নার 'শর্ট হেয়ার' ট্রেন্ড



অফিস ওয়্যারে সাম্য



পুষ্পক সেন মিলানের রাস্তায় শাড়ি পরে



পোশাক পরার ধরনেও কি লুকিয়ে ক্লাস ডিস্টিংকশন?

> ছেলেরাও এখন অবলীলায় শাড়ি, স্কার্ট পরছেন। মেয়েরা তো ট্রাউজ়ার্স, শার্ট পরছেনই। 'সেক্সুয়ালিটি' ও 'জেন্ডার আইডেন্টিটি'র সঙ্গে পোশাককে সমার্থক করে দেখছেন না তাঁরা।

পুরুষের পোশাক-সাম্য তখনই সম্ভব, যখন সে স্বাধীনভাবে পোশাক নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আর স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা শুধু শহুরে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তিনি যেভাবে চাইবেন, ঠিক সেভাবেই সাজবেন। যেমন ধরুন, 'ঘোমটা' প্রথা বা 'হিজাব'-এর ক্ষেত্রে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় এগুলো সামাজিকভাবে 'রিগ্রেসিভ'। কিন্তু কোনও মহিলা ঘোমটা বা হিজাবকে তাঁর 'আইডেন্টিটি'র অংশ বলে মনে করতেই পারেন। তাতে তো কোনও বিরোধ নেই। একইভাবে, কেউ যদি বিকিনি পরেন বা শর্ট স্কার্ট পরেন, তাহলে তাঁকে নিরন্তর ট্রোলড হতে হয় কেন? পোশাকের সঙ্গে শারীরিক কাঠামোকেও কি সমাজনির্দিষ্ট হতে হয়? কেউ হয়তো একটু গোলগাল চেহারার, তাঁর যদি বিকিনি বা শর্ট স্কার্ট পরার আত্মবিশ্বাস থাকে, তাহলে তাঁকেই বা স্লাট শেমড হতে হয় কেন? মানে, একরকম বলেই দেওয়া হয়, ভারী চেহারার অমুক পোশাক, রোগা চেহারার একরকম পোশাক। আর সেজন্যই তথাকথিত 'ফ্যাশনেবল' পোশাক পরতে গেলে নির্বিচারে ওজন কমানো, ছিপছিপে থাকার তাগিদ তৈরি হয় অনেকের মধ্যেই। আমাদের দেশে টিনএজ মেয়েরা অনেকেই অ্যানেরক্সিয়ায় ভোগে। সবই ওই 'ফেক' বিউটি স্ট্যান্ডার্ডের পিছনে দৌড়নোর ফল। একটা সময়ে সিঁদুর পরে প্রকাশ্যে বেরনোয় রেখাকেও ট্রোলড হতে হয়েছিল। বিবাহিত নন, অথচ বিবাহিত মেয়েদের 'ইনসিগনিয়া' হিসেবে সিঁদুর পরবেন, এ আবার হয় নাকি! আসলে, পোশাক নির্বাচন থেকে সাজগোজ পুরোটাই নিজের ইচ্ছেয় হওয়া উচিত। আমাদের দেশে এখনও অনেক মেয়েই নিজের ইচ্ছেয় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে দু'বার ভাবেন...ওই যে পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের 'সম্মান'-এর দায় তাঁর!

তবে শুধু ভারতে নয়, মেয়েদের পোশাকের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন পাশ্চাত্যেও বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। সেখানেও মেয়েদের প্রতিনিয়ত লড়তে হয়েছে স্টিরিওটাইপ ভাঙার জন্য। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার এক জিম থেকে এক মহিলাকে বের করা দেওয়া হয়েছিল স্পোর্টস ব্রা ও টাইটস পরার অভিযোগে। তিনি নাকি বড্ড বেশি স্কিন শো করছিলেন! আবার পাশ্চাত্যেও প্যান্টকে পুরুষদের পোশাক হিসেবে ধরে নেওয়ার রীতি সেই প্রাচীন আমল থেকেই। মেয়েদের পোশাক-সংস্কৃতির সঙ্গে তা নাকি বড্ড বেমানান ছিল। প্যান্টের চল বাড়ে তার কমফর্টের কথা মাথায় রেখেই। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে আমেরিকাতেও একটা সময়ে প্যান্ট ছিল ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সাম্যের চিহ্ন। এদেশেও তাই।

ছবি: আইস্টক

পোশাকের নতুন সংজ্ঞা

পোশাক যেমন ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক, তেমনই তা বদলে যাওয়া সময়ের প্রতিচ্ছবিও। দশকান্তরে পোশাকের কাট, স্টাইল, ডিজ়াইন, পরার ধরন ইত্যাদি হয়ে উঠেছে উইমেন এমপাওয়ারমেন্টের সমার্থক। মেয়েদের পোশাক ঠিক কেমন, তার সংজ্ঞা বদলেছে বারবার। সেই নতুন সংজ্ঞাকেই ফ্যাশন ক্যানভাসে তুলে ধরলেন সায়নী দাশশর্মা এবং মধুরিমা সিংহ রায়।



মেয়ে মানেই তথাকথিত মেয়েলি পোশাক পরতে হবে? মোটেও না! আদ্যিকালের সেই ধারণা ভেঙে মেয়েরা দিব্যি সাজছে অ্যান্ড্রোজেনাস লুকে। পেস্তা রঙের ব্লেজ়ার-ফর্মাল ট্রাউজ়ার্সে কর্মরতা মহিলার জেন্ডার ফ্লুইড লুক।

পোশাক: বম্বে বাই আয়েশা



একটা সময়ে মেয়েদের পোশাকে পকেটের চল ছিল না। টাকাপয়সা বা জরুরি জিনিস আবার মেয়েদের পকেটে গচ্ছিত থাকবে নাকি! এখন ড্রেস থেকে ট্রাউজ়ার্স, সবেতেই পকেট মাস্ট। পার্পল নি লেংথ পকেট ড্রেসে স্মার্ট লুক।

পোশাক: অরণ্য,
ফোন: ৯৮৩১০৩৯৮২২,
গয়না: করিশ্মা, গোলপার্ক,
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭



কয়েক প্রজন্ম আগে মেয়েদের বাড়ির বাইরে পা রাখাই নিষেধ ছিল। তারপরে বলা হল, চাকরি করলে বড়জোর দশটা-পাঁচটার চাকরি। সেসব ছাপিয়ে মেয়েরা প্রতিনিয়ত গ্লাস সিলিং ভাঙছে। সাদা শার্ট আর কালো স্কার্টে ফর্মাল বিজ়নেস লুক।

পোশাক: বম্বে বাই আয়েশা



ছয় বা সাতের দশকের সিনেমায় নায়িকারা সবসময় ফিটেড পোশাক পরতেন, মনে আছে? একটা সময়ে মেয়ে মানেই ফিটেড, স্ট্রাকচারড পোশাক...এমনটাই ভাবা হত। ফ্যাশনের বিবর্তনে অ্যান্টি ফিপোশাক ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। সাদা কাফতান স্টাইল ড্রেসে অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রিন্ট। এও কিন্তু একধরনের নিয়মভাঙা।

পোশাক: BYYB,
ফোন: ৯৮২৩৯৫৮৯৪০
গয়না: অ্যাডরস জুয়েলরি,
ফোন: ৮৯৮১০১১৯৮৭



মেয়েদের ক্ষমতায়নের চিত্র স্পষ্ট শাড়ির বিবর্তনে। সাহসী ড্রেপিং, শিয়ার ফ্যাব্রিক বা স্টাইলিশ ব্লাউজ়...শাড়িতে তাঁদের সেক্স অ্যাপিল ধরা পড়েছে বারবার। এখানে লাল ড্রেপড শাড়িও ব্যতিক্রম নয়।

পোশাক: সাস্যা, ফোন: ০৩৩ ২২৮৯২৩২৩, গয়না: অ্যাডরস জুয়েলারি



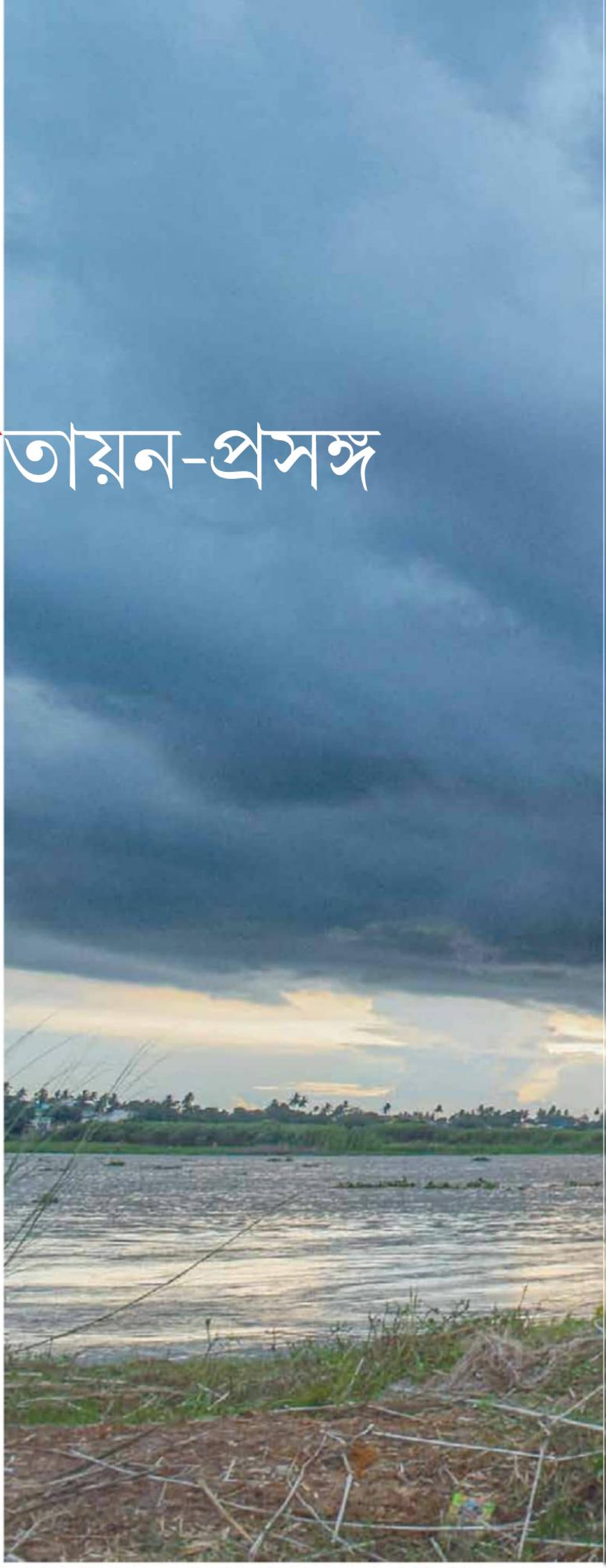
পোশাকের দৈর্ঘ্য দিয়ে চরিত্র বিচার...হ্যাঁ, এখনও মেয়েরা স্লাট শেমড হন। কিন্তু সেসব তোয়াক্কা না করে শর্ট রিভিলিং ড্রেসে একইসঙ্গে ব্যক্তিত্বময়ী ও গ্ল্যামারাস হয়ে ওঠা যায়। ছবিতে পার্পল মিনি ওয়ান শোল্ডারড ড্রেসে তাই ফুটে উঠেছে।

মডেল: ডিম্পল, অনন্যা
মেক-আপ: প্রীতম দাস
ফোন: ৮৬২১০২০০৬১
স্টাইলিং: বম্বে বাই আয়েশা দেশমুখ
ফোন: ৮৩৩৫৯৬৫৯৬৮
সহযোগী: দীপশিখা রায়
লোকেশন: দ্য স্টেডেল, সল্টলেক স্টেডিয়াম, গেট নং. ৩, সেক্টর-৩
ফোন: ৯৮৭৪১৪০৭১২
ছবি: সুদীপ্ত চন্দ

শুটিং কো-অর্ডিনেশন ও রূপায়ণ:
মৌমিতা সরকার ও বৈশালী সরকার

পোশাক: ফোমো,
ফোন: ৭০০৩৯৮৯৮৩৬

পোশাকের ট্রেন্ডে বিবর্তন ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন... বিশেষ ফ্যাশন ফিচার



মেয়েদের অগ্রগতি

রাজনীতি ও ক্ষমতায়ন-প্রসঙ্গ

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রান্তিক জায়গায় মেয়েদের যা অবস্থান, তার সঙ্গে রাজনৈতিক পদে ক্ষমতাসীন মেয়েদের কতটা মেলানো যায়? ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে কোথাও তাঁরা কি এক? লিখছেন যশোধরা রায়চৌধুরী।

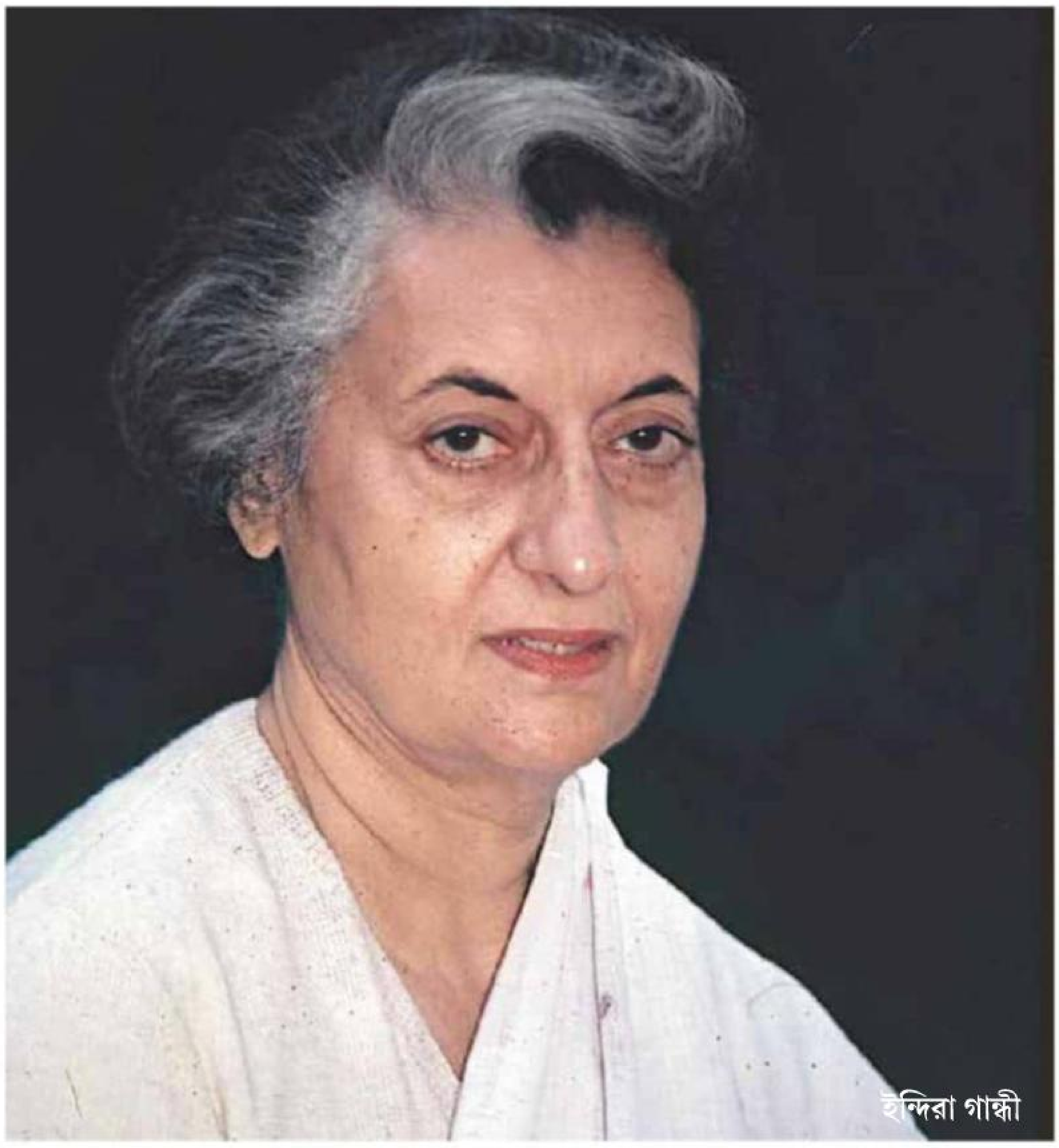
আমার মেয়ের যখন আড়াই বছর বয়স, এক পশ্চিমা শহরে থাকতাম। সেখানে প্লেস্কুলে একটা ছড়া শিখেছিল সে— ''চন্দা মামা গোল গোল। সূরজ মামা গোল গোল। বাবা কা পয়সা গোল গোল। মা কী রোটি গোল গোল।''

হাত দিয়ে গোল আকার দেখাতে দেখাতে ছোট্ট মেয়ে বলত। এটা স্পষ্টতই, একেবারে সদ্য বুলি ফোটা বাচ্চাদের জন্য ছড়া। কিন্তু কী কাণ্ড, সেখানেও লিঙ্গ-রাজনীতি! পয়সা রোজগার করেন বাবা। আর মা বাড়িতে বসে রুটি বানান। এটাই সামাজিকীকরণ, এই প্রক্রিয়াতেই আজন্মকালের লিঙ্গবিভেদশিক্ষা ঢুকে যায় রক্তে, নাড়িতে।

আড়াই বছরের মেয়েকে অবশ্য অতি সহজেই বলা গিয়েছিল, তোর তো মা-ও চাকরি করে, পয়সা রোজগার করে। বাবা রুটি বানাবে না কেন? তা-ও তো পারে। তাই এই ছড়ায় ওগুলো ঠিক বলা নেই। কিন্তু এই যে শেখানো, সমাজ এটা পারে, করে। আজও। গল্পে শোনা চিনে মেয়েদের পায়ের মাপ জুতো দিয়ে ছোট করে না-রাখলেও সমাজ 'এটা কোরো না ওটা কোরো না' বলে, ছোট থেকে 'ঠিক হয়ে বসো, লক্ষ্মী মেয়ে হও' এই সব বলে বলে, মেয়েদের শিখিয়ে দেয়, তুমি শাসক হবে না, শাসিত হবে। সে সব শিক্ষা মনকে ছোট করে দেয়। সাহসকে খোঁড়া করে দেয়। এবং বাইরের পৃথিবীতে তার বেরনোর কোনও পথ আর রাখে না। সে মানুষ হিসেবে না, 'মেয়ে' হিসেবে বেড়ে ওঠে। অসম্ভব এক লড়াইয়ে সে ক্রমশ হয় হেরে যায় নয়তো ধূর্ত হয়। কারণ সে জানতে শেখে যে, সহজে কারও কাছে প্রশংসা পাওয়া যাবে না। সে মেয়ে। তার কোনও গুণ গুণ নয়। বাঁকা আঙুল ছাড়া ঘি উঠবে না। তখন মেয়েরা বুদ্ধি খরচ করে শর্টকাটের রাস্তা ধরে। শাসিত হতে হতে তারা হয়ে যায় এক-একজন স্বৈরাচারী মারি আঁতোয়ানেত ('রুটি নেই তো কেক খাও'-খ্যাতা) অথবা এক-একজন মিলাডি (থ্রি মাস্কেটিয়ার্সের ভয়ানক ক্ষমতাধর অবিস্মরণীয় ভিলেন নারী)।

গল্পগাঁথার মেয়ে-শাসকেরা হয় ক্লিওপেট্রার মতো নাকউঁচু ও




ইন্দিরা গান্ধী


শেখ হাসিনা

আত্মগর্বী, নয়তো রানি রাসমণির মতো দয়াপ্রাণ। এই দুই মেরুর মধ্যে বিচলন করে মেয়েশাসকের প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা, যা সচরাচর ভয়মিশ্রিত।
তথাপি, মেয়ে ভিলেনের যেমন ভয়াবহ মৃত্যু গল্পের শেষে অনিবার্য— পুরুষ ভিলেনের তুলনায় অনেক বেশি দৃশ্যসুখদায়ী, তেমনই মহিলাশাসক সচরাচর সমাজে গৃহীত হন না। তাঁর ন্যূনতম বিচ্যুতিও ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করে।
মেয়েশাসক আজও ইতিহাসে থেকে যান ব্যতিক্রম হিসেবেই।

স্রোতের বিপরীতে

সুলতানা রাজিয়া সম্পর্কে মিনহাজ-ই-সিরাজ (১২৬০) পর্যন্ত লিখেছিল, "এক মহান সম্রাট ছিলেন। সুলতানি আমলের সেরা। বুদ্ধিমান, নিরপেক্ষ, উদার, রাজ্যের ভালর কথা চিন্তা করতেন, প্রজাদের কল্যাণের চেষ্টা করতেন, সৈন্যদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন। ভারতের সেরা সম্রাট হওয়ার সব গুণ তাঁর মধ্যে ছিল, একটা দোষ বাদে। তিনি ছিলেন মহিলা। তাই দেশের পুরুষদের কাছে তাঁর বাকি সব গুণ মূল্যহীন বলে বিবেচিত হত।"
এই তো সেদিন, শুনলাম এক রাগী ইতিহাস দিদিমণির কথাও... বলছিলেন, "কেন যে রাজিয়া ভুলটা করল। বিয়ে করতে গেল কেন মেয়েটা? দেশের মানুষকে সন্তানের মতো শাসন করতে গেলে কি আর বিয়ে করা সাজে?"
এ-ও এক দেখা আমাদের। আমাদের দৃষ্টি মেয়ে-শাসকের বিয়ে বা প্রেম স্বীকার করে না।
একদা চিতোরের রানি পদ্মিনীর গল্প মুখে মুখে ফিরত। আগুনে ঝাঁপ দেওয়াই একমাত্র বীরত্ব তখন মেয়েদের। সঙ্গে জড়িত দেশ ও দশের ইজ্জত! মান সম্মান। আবার মুখে মুখে ফিরত কাশ্মীরের রানি যশোমতীর গল্প, গড়মণ্ডলের রানি দুর্গাবতীর গল্প। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই তো অতি পরিচিত। এঁদের বিচক্ষণতা, লড়াকু মানসিকতার গল্প একদিকে থেকে গেলেও, মূলত তাঁদের 'পুরুষালি' ক্ষমতার জন্যই যেন তাঁদের আমরা মনে রাখি! তা হলে, নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে শুধু মর্দানি বা মর্দাঙ্গি দিয়েই কি সেকালে এক নারী তাঁর রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করতে পারতেন? সম্প্রতি 'মণিকর্ণিকা' নামের হিন্দি ছবিতে রানি লক্ষ্মীবাইয়ের মুখে স্বাধীনতার যে ভবিষ্যদ্বাণী বসানো হয়েছে, আর ঘোড়ায় চাপা রানির যে চিত্র আমাদের মনের মধ্যেই ধরা, তা-ই আরও রং চড়িয়ে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন পরিচালক, তা সেই মর্দানিরই পরিচায়ক— যা বারবার মানুষ দেখতে চায় শাসক নারীর ভিতরে।

একদিকে অস্বাভাবিক এক কঠোর, এক কট্টর নিষ্ঠুরতাই যেন যুগে যুগে নারী শাসকদের কাহিনিকে আরও বেশি বর্ণময়, আলোচ্য করে তুলেছে। স্বৈরাচারী শাসক হিসেবে জ্ঞাত হয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী একদা... জনপ্রিয়তা অর্জন করেও যিনি এক সময় গদি হারিয়েছেন ১৯৭৫-এর ইমার্জেন্সির ভুল সিদ্ধান্তের ফলে। পরবর্তীকালেও, ১৯৮৪ সালে ইন্দিরার বেদনাদায়ক হত্যা তাঁর খালিস্তানি দমন, বা অপারেশন ব্লু স্টারেরই ফল বলে মনে করা যায় । অন্যদিকে, তুমুল বিতর্কিত হয়েছেন উত্তর প্রদেশের নেত্রী মায়াবতী থেকে শুরু করে আরও অনেকে। তাঁদেরও সরে যেতে হয়েছে লড়াইয়ের ময়দান থেকে।
পশ্চিমের ছবি এত রংদার নয়। তবুও, পশ্চিমের অধিকাংশ নেত্রীই একটা অদৃশ্য গ্লাস সিলিংয়ের ফলেই আটকে যান একটা স্তরে, অ্যাঞ্জেলা মার্কেল হয়ে উঠতে পারেন অতি সামান্য সংখ্যকই। আয়রন লেডি মার্গারেট থ্যাচারের মর্দানি প্রকৃতিও অতি খ্যাত ও কুখ্যাত হয় তাঁর ব্যতিক্রমী স্বভাবের জন্যই। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক দুঃসময়ে প্রধানমন্ত্রী হয়ে একের পর এক অ-জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছেন থ্যাচার। শক্ত হাতে চেয়েছেন নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী দেশ চালাতে। জনমোহিনী নীতিগুলো ত্যাগ করে কঠোর হতে চেয়েছেন। কর বাড়ানো থেকে শুরু করে আরও অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের শীর্ষে উঠেছেন বারবার।

প্রাইভেটাইজ়েশন, ডিরেগুলারাইজ়েশনের পথে হেঁটেছেন। আশির দশকে এমনকী, ব্রিটেনের সম্মানরক্ষার্থে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের অধিকার নিয়ে যুদ্ধঘোষণাও করেছেন তিনি।
অন্যদিকে আরও সাম্প্রতিক, একেবারে হালের জার্মানির প্রথম মহিলা শাসক অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। ষোলো বছর ধরে জার্মানির হাল ধরে ছিলেন। সফল বিদেশনীতি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ছাতার তলায় সব ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিয়ে আসার সাফল্য এবং শরণার্থী সমস্যার সমাধান— নানা পালক তাঁর টুপিতে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিনি অন্যতম সফল এক রাজনীতিক হিসেবেই পরিচিত।
অন্যদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অধিকাংশ নারী শাসকই নিজের বাবা বা স্বামীর ছত্রছায়া থেকেই রাজনীতির ময়দানে এসেছেন, এবং অনেক সময়েই এসেছেন সিমপ্যাথি ওয়েভে ভর করে। রাজনীতির গুরুরাও অনেক সময় বাবা বা স্বামীর মতোই মেয়েদের পিছনে চালচিত্র গড়ে দিয়েছেন। পারিবারিক পরম্পরা ছিল বেনজির ভুট্টো, ইন্দিরা গান্ধী বা সিরিমাভো বন্দরনায়েকের ক্ষেত্রে। শেখ হাসিনার পিতৃদেব শেখ মুজিবর রহমানের পরিচিতি তাঁকে যে গ্রহণীয়তা দিয়েছে, তা অনন্য।
দেশের এক বিশেষ দুঃসময়ে ইন্দিরা গান্ধী হাল ধরেছিলেন। আর নিজেকে গড়েপিটে করেছিলেন এক লৌহমানবী। ইন্দিরা গান্ধী নিজেই এক প্রতিষ্ঠান— বললেও কিছু ভুল বলা হয় না। বিচক্ষণতা, রণনীতি, দূরদর্শিতা... ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশক অবধি টলমলে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি



বেনজির ভুট্টো


রাজীব গান্ধীর সঙ্গে কোরাজ়ন আকুইনো


অ্যাঞ্জেলা মার্কেল

অত্যাচারী স্বৈরাচারী শাসক মার্কোসের শাসন শেষ শুধু করেননি, তাঁর তৈরি অনেক অন্যায় বা ভুল নীতিকে আবার বদলে সঠিক পথে চালিত করাও ছিল আকুইনোর সাফল্যের উদাহরণ। জনবিরোধী আইন পরিবর্তন, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সবই করেন আকুইনো।

সামাল দেওয়া। ইন্দিরার ঐতিহ্য অনেক। তাঁর শিরস্ত্রাণের সবচেয়ে উজ্জ্বল মণি হয়ে বিরাজ অবশ্যই করবে বাংলাদেশ যুদ্ধ। ১৯৭১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সবল প্রতিবেশীর সমর্থন দেওয়ার ইতিহাস সবার জানা। সদ্য এই মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছরের জয়ন্তী উৎসবে আবারও স্মরণ করা হল ইন্দিরার সেই সিদ্ধান্তকে।
ফিলিপিনসে মার্কোস বিরোধী বেনিনো আকুইনো রাজনীতির বলি হয়ে প্রাণ দেওয়ার পর কোরাজ়ন আকুইনোর যে উত্থান, তা-ও ভাবাবেগের ঢেউয়ে সওয়ার হয়েই। অত্যাচারী স্বৈরাচারী শাসক মার্কোসের শাসন শেষ শুধু করেননি, তাঁর তৈরি অনেক অন্যায় বা ভুল নীতিকে আবার বদলে সঠিক পথে চালিত করাও ছিল তাঁর সাফল্যের একটি উদাহরণ। জনবিরোধী আইনগুলোকে পরিবর্তন করা, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দান... এসবই করেছিলেন আকুইনো। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯২— এই ছ'বছরের জন্য আকুইনোর শাসন ফিলিপিনসের মোড় ঘুরিয়েছিল তাই।
এত ব্যক্তিগত সাফল্যের পরও নারীকে ভাবা হয় পুরুষের উপর নির্ভরশীল বলেই। ফলত এই ভূখণ্ডে, নারীর জয়কেও তাঁর প্রয়াত স্বামী বা প্রয়াত পিতার ছায়া থেকে বের করে দেখা আমাদের অনভ্যস্ত। যেভাবে মনে করা হয় যে তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার উত্থানও তাঁর ভাবগুরু এম জি



মায়াবতী



মার্গারেট থ্যাচার ও ইন্দিরা গান্ধী

অনমনীয় শিরদাঁড়াই তাঁদের প্রাথমিক লড়াইয়ের অস্ত্র। পরবর্তীকালে অবশ্য প্রশ্ন ওঠেই। একজন নারী যদি শাসক বা নেত্রী হয়ে ওঠেন, তাঁর দেখাদেখি কি আশপাশে কোনও সামাজিক পরিবর্তন আদৌ ঘটে?

আর-এর হাত ধরেই।

একজন আউং সান সু কি, একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার আলোচ্য হয়ে ওঠেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বহু দিনের সংগ্রামের জন্যই। পারিবারিক ছত্রছায়ার বাইরে এঁদের গণ-আন্দোলনের সাফল্য। পরবর্তীকালে এ বিতর্ক চলতেই পারে যে, নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে এক ক্ষমতার মুখ হয়ে উঠে, এঁরা নারীদের জন্য ঠিক কী করে উঠতে পারলেন। একটাই বিশেষ বিষয় এখানে আমরা তুলে আনতে চাইব, তা হল, স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটা দিয়েই এই সব শাসকের শুরু। অনমনীয় শিরদাঁড়াই তাঁদের প্রাথমিক লড়াইয়ের অস্ত্র। পরবর্তীকালে অবশ্য প্রশ্ন ওঠেই। একজন নারী যদি শাসক বা নেত্রী হয়ে ওঠেন, তাঁর দেখাদেখি কি আশপাশে কোনও সামাজিক পরিবর্তন আদৌ ঘটে? বিপ্লব দূরে থাক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীদের ক্ষমতায়নের সার্বিক পরিমণ্ডলটাও এঁদের উপস্থিতিতে তৈরি হয়ে উঠল না। নারীকে ব্যতিক্রম হিসেবে ক্ষমতায় দেখতে অভ্যস্ত শুধু আমরা না, হয়তো তাঁরাও। তাই, নারীসত্তা সেখানে গৌণ, ক্ষমতায়িত সত্তাই প্রধান।

পালাবদলের দিন

সিস্টেমে বদল আনা সোজা নয়। তাই তো লোকসভায় নারীর সংরক্ষণ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করেন না বছরের পর বছর। আবার একটু একটু করে সিস্টেম পালটাচ্ছে— এই ছবিটাও ভারতে দেখছি আমরা। একেবারে তলার দিক থেকে। সেখানে নারীর ক্ষমতায়নের ছবিটা একেবারেই আলাদা। পিরামিডের উপরের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীদের নয়, আমাদের দেখা দরকার পঞ্চায়েতের স্তরে, সাধারণের ভিতর থেকে উঠে আসা আঞ্চলিক, স্থানীয় রাজনীতির মুখেদের। যাঁরা সত্যি করেই নির্বাচনের ময়দানে লোকতন্ত্রের প্রতিভূ শুধু না, মাটির মানুষের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। কাজও করছেন মাটির স্তরেই। পঞ্চায়েতের ত্রিস্তর সিস্টেম। ১৯৯২ সালের ৭৩তম সংশোধনে সংবিধানে ঢুকে পড়ল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদের এক তৃতীয়াংশ মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ। মেয়েদের জন্য সংরক্ষণ বাড়ানোর অঙ্গীকার বহাল থাকল তার পরেও। পরবর্তী সময়ে অনেক রাজ্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের পথে হাঁটলেও শুরুর দিকে মেয়েদের এই স্থানীয় স্তরের রাজনৈতিক নেতৃত্বে পদচারণাটা ছিল হাঁটি হাঁটি পা পা-র বেশি কিছু নয়। আমরা গল্প-কথায় দেখেছি ডামি প্রধান হিসেবে জাঁতা ঘুরিয়ে চলেছেন মেয়েরা গৃহে, স্বামী পা তুলে বসেছেন কাছারির হাতলওয়ালা চেয়ারে। জেনেছি গ্রামাঞ্চলে অনেক মেয়ে পঞ্চায়েত প্রধান খাতায়-কলমেই শুধু। তাঁরা বাড়িতে বসে রুটি পাকাচ্ছেন বা ভাত রাঁধছেন, পারিবারিক ব্যবসার কাজেও হাত লাগাচ্ছেন, দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছেন। কিন্তু পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে বসছেন তাঁর স্বামী। আরও বড় কথা— পঞ্চায়েতের বরাদ্দ টাকা কী কী খাতে ব্যয় হবে সে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন পুরুষেরাই, আগের মতো। রাজনীতির পোক্ত নেতাই সংরক্ষণের দাবিতে নিজের স্ত্রীকে ভোটে দাঁড় করিয়েছেন যে! আসলে বকলমে স্বামীই চালান পঞ্চায়েতের সব কাজ। স্ত্রীর ক্ষমতায়নের কোনও নামই নেই সেখানে।



শপথকালে
নিজের অধিকারের
চিনিটুকু খুঁটে নিতে
আর পিছপা নন এই
পুরুষ পুঙ্গবেরা!
হায় গণতন্ত্র!

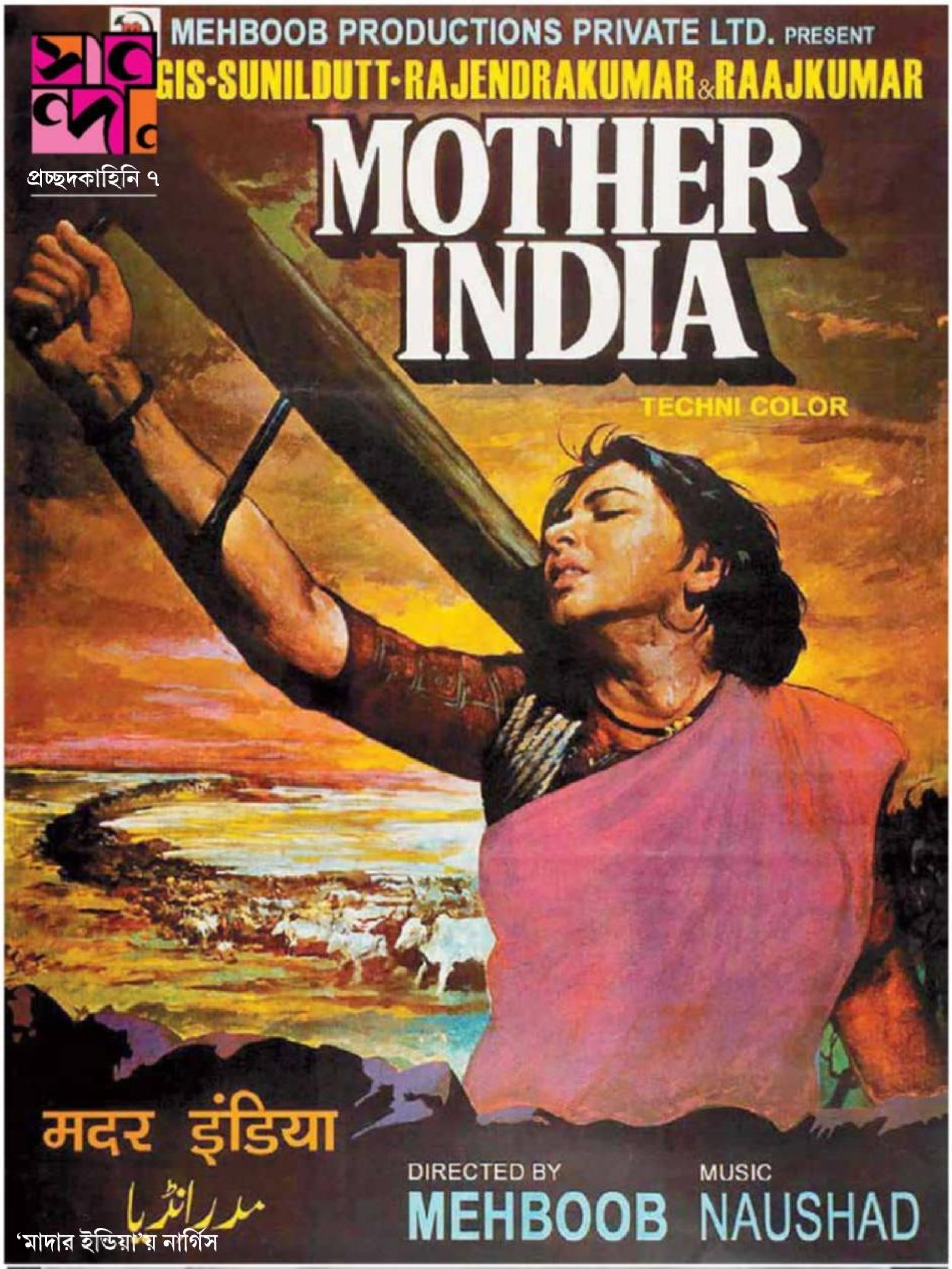
এই জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পদ্ধতি খুবই ধীর। কারণ সমাজ পালটানো এক দিনে হওয়ার নয়। তবু ডেমনস্ট্রেশন এফেক্ট নামে একটা কথা তো আছে। পাঁচজনের কাছে এক জন নারীর কোনও রাজনৈতিক সাফল্য আরও কিছু নারীকে মানসিক শক্তি জোগায়, এটুকু ভেবে নিয়েই এগোনো যাক। সম্প্রতি রঘুবীর যাদব-নীনা গুপ্তা অভিনীত 'পঞ্চায়েত' নামের ওটিটি সিরিজ়ে এই গল্পটাই দেখানো হয়েছে, যেখানে ধীরে ধীরে পঞ্চায়েত প্রধানের পতিদেবতাটির নিষেধ অগ্রাহ্য করেও, ক্রমশ পঞ্চায়েতের নারী-প্রধান নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাচ্ছেন। গল্প-কাহিনি ছায়াছবিতেও কল্পনাকে বেশি করে ছুটিয়ে দেওয়া মন্দ নয়। তা থেকেই আমরা চাই অন্তত কিছু ভগ্নাংশকে বাস্তবায়িত তো হোক! কারণ শেষমেশ তো বিষয়টা দেখা বা পারসেপশনের। আগে দেখা পালটালে পরে হয়ে ওঠাটাও সম্ভব।

আমাদের আশপাশের অনেক সমীক্ষাও বলে দিচ্ছে হরিয়ানা থেকে উত্তর প্রদেশে... নানা রাজ্যেই, মেয়েদের পঞ্চায়েতের ভিতরে ৫০ শতাংশ পদ ধরে রাখার ফল ধীরে ধীরে বোঝা যাচ্ছে। দিনগত পাপক্ষয়ের সামান্য উন্নতির জন্য জরুরি যেসব সেবামুলক বিষয়, জলের জোগান বা পরিচ্ছন্নতা... সেগুলোর ব্যাপারে মেয়েদের বাস্তববুদ্ধি, প্রয়োজনের বোধ অনেক ক্ষেত্রেই কাজে দিচ্ছে পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়নের ব্যাপারে। যদিও পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থায় অনেক টাকাই আসে পূর্বনির্ধারিত কিছু স্কিমের জন্য। তথাপি নতুন কোনও কাজের জন্য সামান্য বরাদ্দ থাকলেও গ্রাউন্ড লেভেল থেকে উঠে আসছে নতুন ভাবনার ফসল, মেয়েদের হাত ধরেই। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের ডাকা মিটিং-এও এখন মেয়েরাই আসছেন, স্বামীদের সামনে ঠেলে না দিয়ে। উদাহরণ হিসেবে উঠে আসছেন উত্তরবঙ্গের তহমিনা বিবিরা, যিনি গ্রামের একটা কালভার্টের জন্য পুরুষদের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে সরাসরি দাবি জানিয়েছেন। হাসিল করেছেন কাজ। অথবা কর্ণাটকের কোলারের সেই মহিলা যিনি একটা জমি কেনার সময়ে বুদ্ধি করে পঞ্চায়েতের কুড়ি হাজার টাকা বাঁচিয়েছিলেন। মেদিনীপুরের উমা মাইতি, যিনি ইন্দিরা আবাস যোজনার বণ্টনের সময়ে বন্ধ করেছিলেন নিজের লোককে পাইয়ে দেওয়ার খেলা। হরিয়ানার কার্নালের চান্দসামান্দের মেয়েরা, যাঁরা জল শোধনের পুকুর তৈরিতে নতুন ভাবনার সাক্ষর রেখেছেন। এঁরা আজ আর ব্যতিক্রম নন। রাজস্থানের সোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেয়েটি একটি টেলিকম কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। এমন সব কাজ করেছেন, গ্রামের ভোল পালটে গিয়েছে। বহু নারীই এখন পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নানা নতুন কাজ করছেন। যার মধ্যে গ্রামের মানুষকে কম্পিউটারের বা ডিজিট্যাল ট্রেনিং দেওয়া থেকে শুরু করে মেয়েদের পর্দা প্রথা দূর করাও আছে।

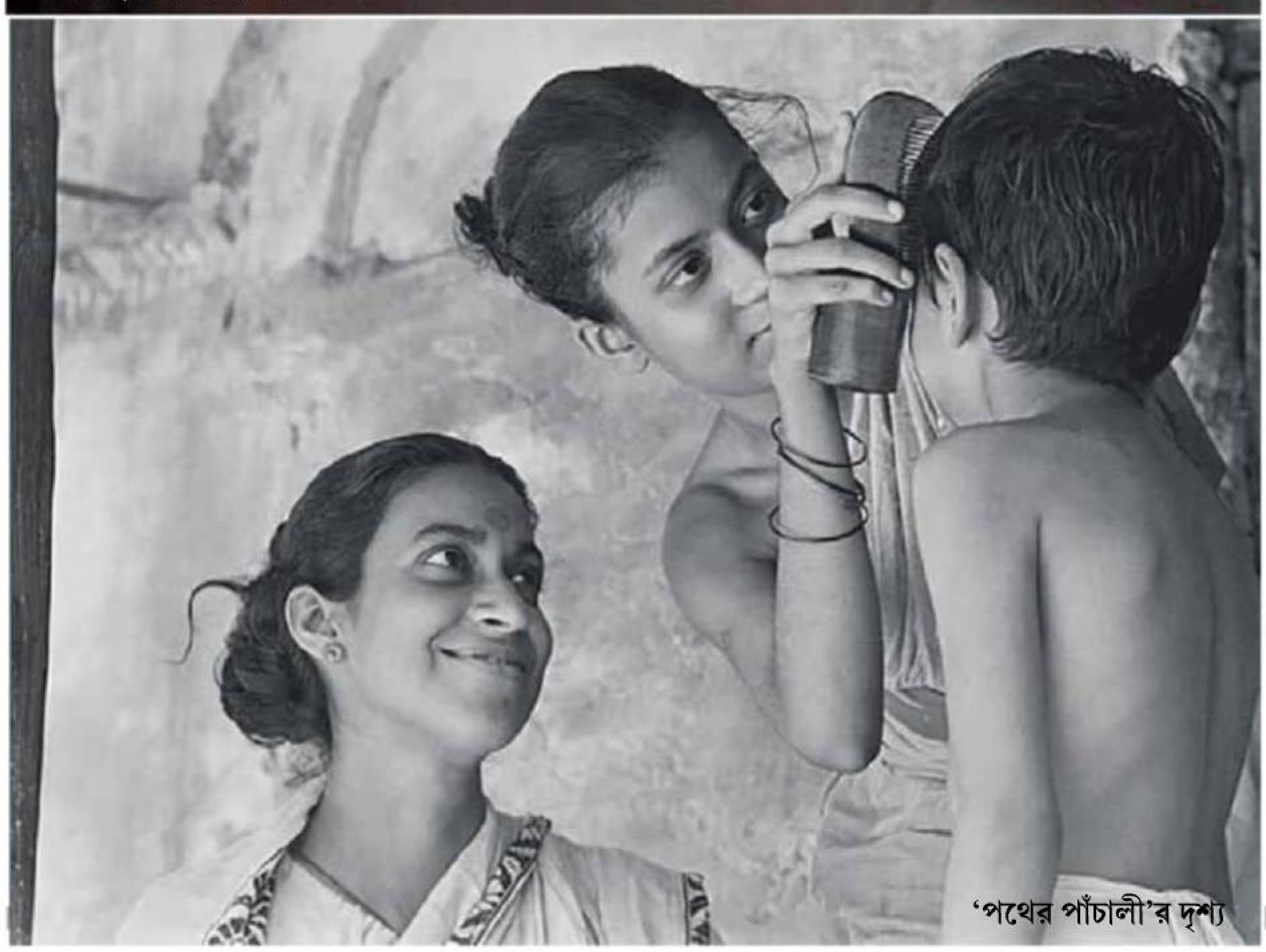
যখন এই প্রতিবেদন লিখছি, তখনই আবার সংবাদপত্রে আছড়ে পড়ল এক লজ্জার খবর। মধ্য প্রদেশের পঞ্চায়েতে জয়ী নারীদের এগিয়ে না দিয়ে, এক উন্মুক্ত জনসভায় সর্বসমক্ষে নির্লজ্জভাবে শপথ নিলেন সরপঞ্চ বা পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে তাঁদের স্বামীরাই। জনাপঞ্চাশেক! স্ত্রীকে নামমাত্র পুতুল করে এগিয়ে দিয়েছিলেন নির্বাচনের ময়দানে, এবার শপথকালে নিজের অধিকারের চিনিটুকু খুঁটে নিতে আর পিছপা নন এই পুরুষ পুঙ্গবেরা। হায় গণতন্ত্র!

যথারীতি এ নিয়ে বিস্তর লেখালিখি শুরু হয়েছে। শোরগোল উঠেছে। এ ভারতের বুকে আজও এত স্ববিরোধ। মেয়েদের ক্ষমতায়িত করায়, দেখায়, এত জটিল অসুবিধে রয়ে যাচ্ছে! নাছোড়বান্দা পুরুষতন্ত্র কখনও এসে ঢুকছে নারীর একাকী মগজে, তাকে বানিয়ে তুলছে স্বৈরাচারী বা অত্যাচারী। কখনও বা নারীকে সামনে আসতেই দিতে নারাজ পিতৃতন্ত্রের ভূত।

আরও একটু আলো, আরও একটু ক্ষমতায়ন আসুক। মেয়েরা জাগুক সর্বত্র।



'মাদার ইন্ডিয়া'য় নার্গিস


'পথের পাঁচালী'র দৃশ্য

মেয়েদের অগ্রগতি

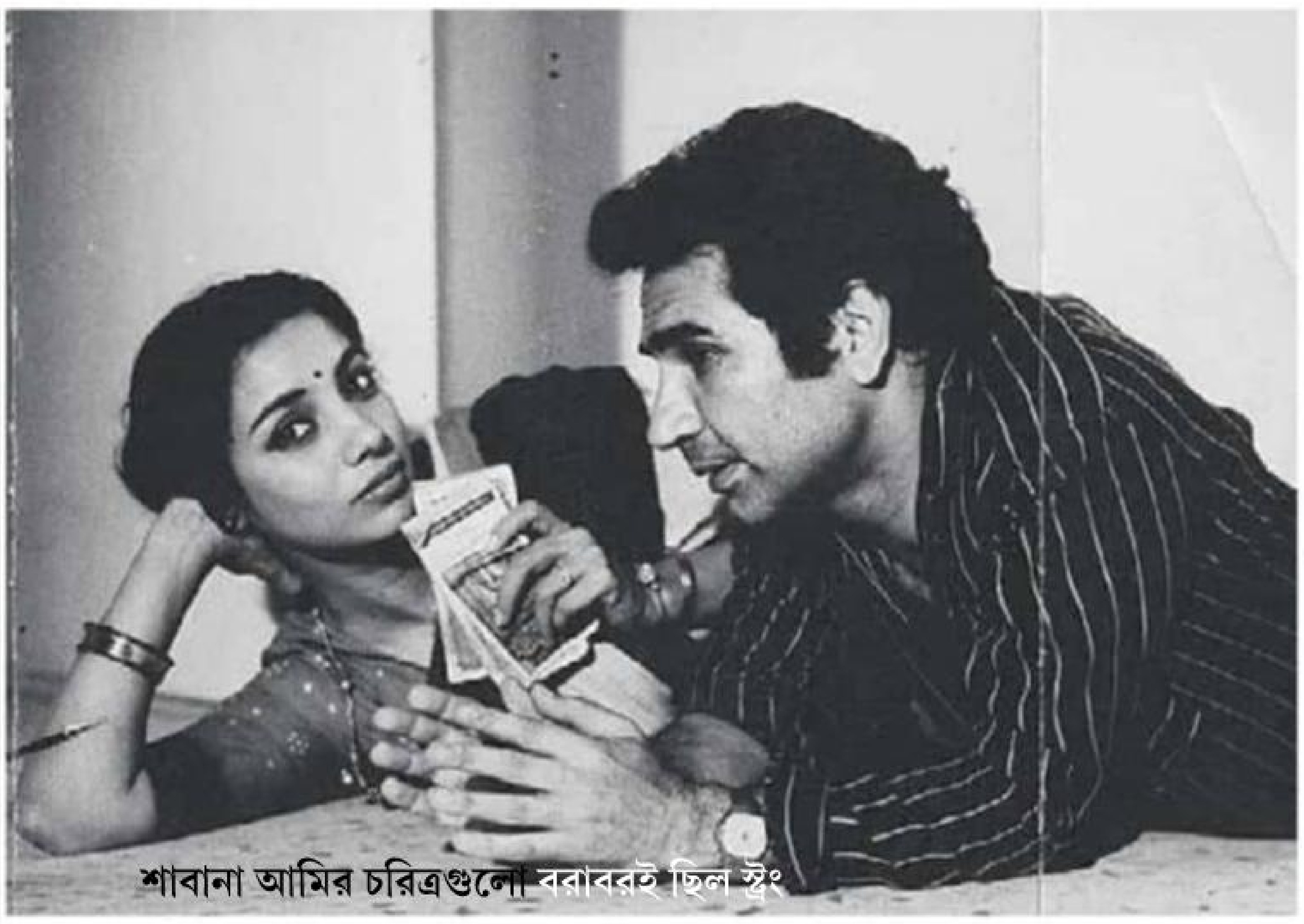
বিনোদনে মেয়েদের চিত্রণ

ভারতীয় সিনেমায়, বিশেষত হিন্দি ও বাংলা ছবিতে কতটা বদলেছে মেয়েদের চরিত্রায়ণ? টেলিভিশনেই বা কতটা প্রগতিশীল হয়েছে মহিলা চরিত্ররা? আলোচনায় সায়নী দাশশর্মা ও মধুরিমা সিংহ রায়।

শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বা তাঁদের চরিত্রায়ণ যেমনই হোক না কেন, ভারতীয় সিনেমায় তাঁরা বরাবরই স্বতন্ত্র পরিচিতি বহন করেছেন। 'মাদার ইন্ডিয়া' থেকে 'কহানি', সত্যজিৎ রায় থেকে ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিতে মেয়েদের চরিত্রায়ণ...সবই এখানে উল্লেখ্য। তবুও ছকভাঙা মেয়েদের মাঝেও কি কিছুটা অপ্রাপ্তি, কিছুটা না পাওয়া চোখে পড়ে না?

বলিউডে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব

১৯৭২ সালে আর্ট ক্রিটিক ও ঔপন্যাসিক জন বার্জার লিখেছিলেন, "Men act, women appear. Men watch, women watch themselves being watched." শিল্পে, বিশেষ করে মেনস্ট্রিম সিনেমায়, মহিলাদের রিপ্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে এ কথা অনেকাংশেই সত্যি। স্ট্রং, অনুপ্রেরণাদায়ক মহিলা চরিত্র নিশ্চয়ই এসেছে হিন্দি ছবিতে, মহিলা চরিত্ররা বারবার নিজেদের ছাপিয়ে গিয়েছেন, সমাজের বিপরীতমুখী হয়ে



শাবানা আমির চরিত্রগুলো বরাবরই ছিল স্ট্রং



'কহানি'তে বিদ্যা বালন



ছক ভেঙেছিলেন হেলেন

> সাতের দশকে মেয়েদের ছকভাঙা অবতার হিসেবে বলা যেতে পারে সিনেমায় 'অল্টারনেটিভ' মহিলা চরিত্রদের কথা। যেমন, হেলেন।

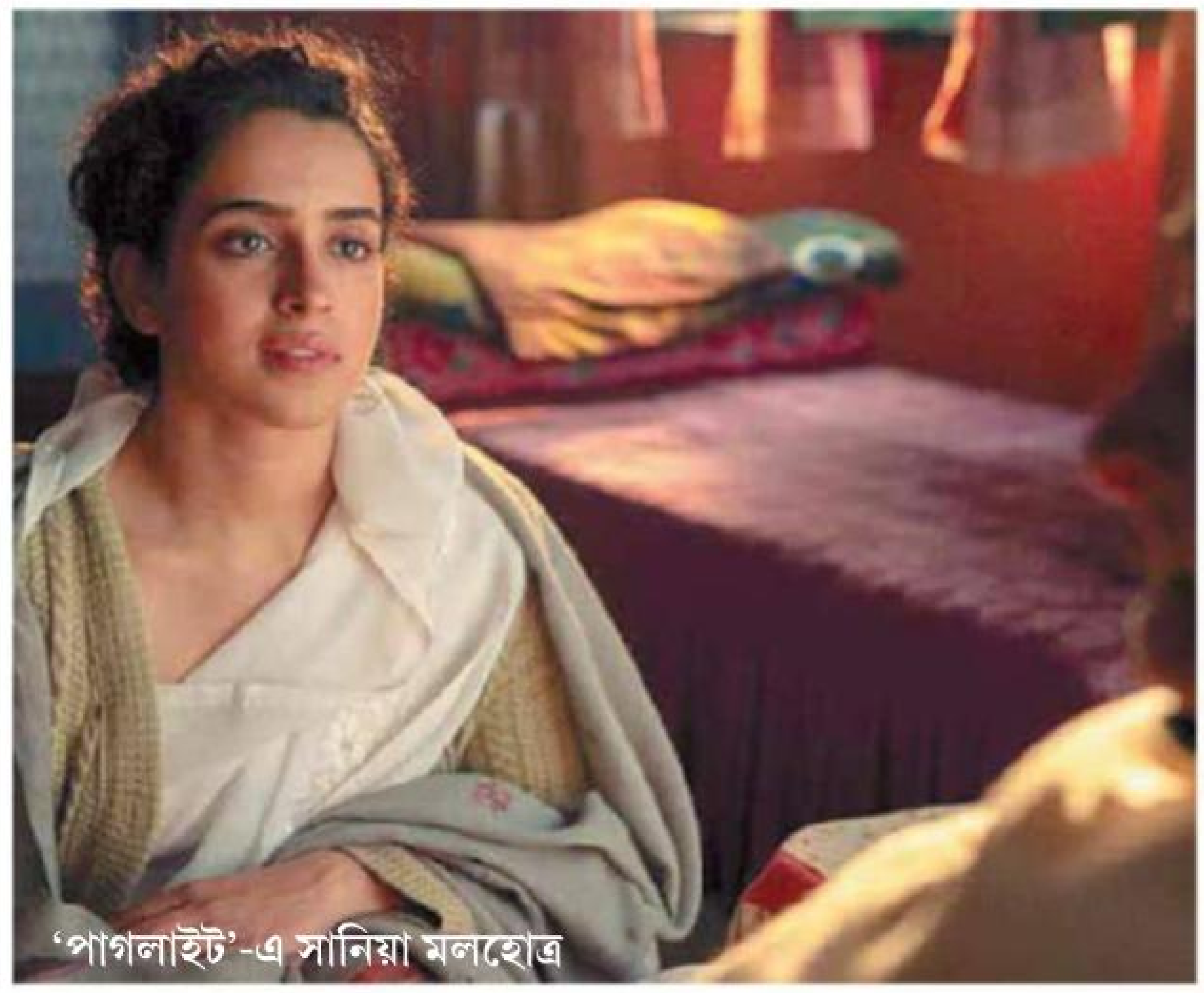
নিজেদের ভেঙেছেন, কিন্তু তবুও ভারতীয় ছবিতে এখনও নায়িকাদের তুলনায় নায়কদেরই তো প্রাধান্য বেশি। সাতের দশকে 'দিওয়ার' থেকে হাল আমলের 'পুষ্পা: দ্য রাইজ়'...সব ছবিতেই ঘুরেফিরে পৌরুষের জয়জয়কার। আর তাতেই হলে হাততালি, সিটি। নায়ক দুষ্টের দমন করবেন, তিনি ত্রাণকর্তা হবেন, এমন ছকেই আমরা অভ্যস্ত। অন্তত বাণিজ্যিক ছবির ক্ষেত্রে গল্প যেমনই হোক না কেন, নায়কের প্রেক্ষাপট বা চরিত্রায়ণের ট্রিটমেন্ট যেমনই হোক না কেন, নায়িকাদের নিয়ে ছবি ভাবা খুব একটা কি হয়? একটু বলিউডের নায়িকা-সংস্কৃতির দিকে তাকানো যাক। পাঁচ-ছয়ের দশকের হিন্দি ছবিতে সাধারণত আদর্শ সমাজের চিত্র তুলে ধরা হত। নব্য স্বাধীন দেশের নতুন আশা, নতুন সূচনার ছবি নিঃসন্দেহে অ্যাসপিরেশনাল। মহিলা চরিত্রদেরও যথেষ্টই পজ়িটিভ রিপ্রেজ়েন্টেশন ছিল বলা যেতে পারে। ১৯৫৭-য় মুক্তিপ্রাপ্ত 'মাদার ইন্ডিয়া'র কথাই ধরা যাক। ছবির পোস্টারে অভিনেত্রী নার্গিস একটি কাঠের কোদাল আঁকড়ে ধরে আছেন। পোস্টারের মধ্যে দিয়েই যেন জাতীয়তাবোধের উদযাপন হল ছবিতে। এক আদর্শবাদী, সংগ্রামী মা ছিলেন ছবির 'নায়ক'। এর বাইরে বেশিরভাগ ছবিতেই মেয়েদের চরিত্রকে দেখানো হত পিতৃতন্ত্রের লেন্স থেকে। নায়িকা হবে তথাকথিত 'ভাল মেয়ে'...এই থিয়োরির বাইরে বেরিয়ে ১৯৬৫-তে মুক্তি পেয়েছিল ওয়াহিদা রহমানের 'গাইড'। নায়ক-অধ্যুষিত বলিউডে মহিলা সুপারস্টার হয়ে দাপিয়ে বেরিয়েছিলেন বৈজয়ন্তীমালা। 'মধুমতী', 'নয়া দৌড়'-এর মতো ছবি তৈরি হল। সাতের দশক থেকে হিন্দি ছবির নায়ক-কেন্দ্রিকতা বাড়ল আরও খানিকটা। তবে এসময়ে মেয়েদের চরিত্রে ছকভাঙা অবতার হিসেবে বলা যেতে পারে সিনেমায় 'অল্টারনেটিভ' মহিলা চরিত্রদের কথা। যেমন, হেলেন। মেয়েরা শুধু 'ভাল' মেয়ে হবে, 'ড্যামসেল ইন ডিসট্রেস' হবে...এই ছকের বাইরে স্বাধীনচেতা, ছকভাঙা, সাহসী অবতারে ধরা দিলেন তিনি। হেলেনের চরিত্র, তাঁর সাজপোশাক সবই সেই সময়ের নিরিখে ছিল অনেকগুণ এগিয়ে। একদিক থেকে ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের অন্যতম 'মার্কার' ছিল পরদায় তাঁর রিপ্রেজ়েন্টেশন। অনেকটা সেই ধাঁচেই পরে পরদায় অবতীর্ণ হন পারভিন ববি, জ়িনাত আমানেরা। আট-নয়ের দশকেও নায়ক-কেন্দ্রিকতার খুব একটা ব্যতিক্রম হয়নি। তবে আটের দশকে 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান'-এর সমান্তরালে স্মিতা পাতিল, শাবানা আজ়মি, দীপ্তি নাভালের মতো অভিনেত্রীরা বেছে নিয়েছিলেন স্ট্রং চরিত্র। নয়ের দশকে ফেমিনিজ়মের দ্বিতীয় ঢেউয়ের পরে ও গ্লোবালাইজ়েশনের প্রভাবে, অনেক কর্মরতা মহিলার চরিত্র সামনে উঠে আসে। 'মোহরা'য় রবীনা ট্যান্ডনই যেমন একজন সাংবাদিকের ভূমিকায় ছিলেন। ২০০০-এর পর থেকে স্ট্রং মহিলা চরিত্রের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। 'অ্যায়েতরাজ়'-এর প্রিয়ঙ্কা চোপড়া, 'কহানি'র বিদ্যা বালন', 'চাঁদনি বার'-এর তব্বু, 'কুইন'-এর কঙ্গনা রানাওয়াত থেকে শুরু করে তাপসী পান্নুর 'থাপ্পড়', 'পিঙ্ক' বা আলিয়া ভট্টের 'গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি'-র মতো চরিত্রগুলোর কথাই উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যাক। নায়ক-কেন্দ্রিকতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারলেও, নায়িকাদের এখনও কি দর্শকরা পরদার 'নায়ক' ভাবেন?

ওটিটিতে ফিমেল গেজ়

বলিউডের মেনস্ট্রিম ছবিতে সাধারণত বরাবরই 'হিরোইজ়ম'-গোত্রের



ওটিটি-তে জনপ্রিয় 'বুলবুল'



'পাগলাইট'-এ সানিয়া মলহোত্র

কনটেন্টে হল ভরিয়েছেন দর্শকরা। সাতের দশকের অমিতাভ বচ্চনের 'অ্যাংরি ইয়ং ম্যান'-এর অনুষঙ্গই ধরুন। নায়ক একা হাতে একাধিক গুণ্ডাদমন করবেন, তিনি হবেন আদর্শের প্রতিভূ ও নায়িকার রক্ষাকর্তা...এই ছিল সেই সময়ের হিট ফর্মুলা। এই 'লার্জার দ্যান লাইফ' ইমেজ ভেঙে নয়ের দশকের নায়করা অনেকটাই বেরতে পারলেও, মেনস্ট্রিম সিনেমায় মহিলা-কেন্দ্রিক ছবি সেসময়ে ছিল হাতেগোনাই। 'মহিলা-কেন্দ্রিক' কনটেন্ট...এই শব্দবন্ধের মধ্যে কোথাও হয়তো একটু হলেও বৈষম্যের গন্ধ আছে ঠিকই। কিন্তু মেনস্ট্রিম হিন্দি ছবিতে মেয়েদের চরিত্রায়ণের ইতিহাসের দিকে তাকালে তা পুরোপুরি অস্বীকারই বা করি কী করে! সেদিক থেকে দেখতে গেলে মেয়েদের চোখ দিয়ে দেখার, মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গল্প বলার জোয়ার এল ওটিটি-র হাত ধরে। একাধিক অভিনেতার মতে, ওটিটি-তে কনটেন্ট ডাইভার্সিফিকেশনের দিগন্ত যেমন উন্মুক্ত, তেমনই ক্রিয়েটিভ লিবার্টির সুযোগও বেশি। আর এই সৃজনশীল ঔদার্য ওটিটি হাত খুলে দেয় লেখক, পরিচালক থেকে অভিনেতা সকলকে। পুরুষরাই নায়ক হবেন, তেমনটা এখানে নয়। মহিলারাও নন, বরং 'নায়ক' এখানে চরিত্র। খেটে খাওয়া সাধারণ মহিলা, মধ্যবিত্ত মহিলা, উচ্চবিত্ত মহিলা, মহিলাদের সেক্সুয়াল ডিজ়ায়ার, চাহিদা, ভালনারেবিলিটি...সবকিছু উঠে আসছে। আর অনেকক্ষেত্রেই এগুলোর নির্মাণ করছেন স্বয়ং মহিলারাই। ওটিটি-র দৌলতেই কি তাহলে তৈরি হচ্ছে অল্টারনেটিভ 'ফিমেল গেজ়'? 'গুলাবো সিতাবো'র বেগম যেমন পিতৃতন্ত্রকে হেলায় গুঁড়িয়ে দেন, 'সেক্রেড গেমস'-এর কুক্কু যেমন সেক্সুয়ালি ভালনারেবল দিকটি উন্মোচিত করেন এক পুরুষের সামনে, 'পাগলাইট'-এর সন্ধ্যা যেমন মেয়েদের ত্যাগের প্রতিমূর্তি হতে হবে এই ধারণা ভেঙে নিজের শর্তে বাঁচেন... এমন মহিলার কথা মেনস্ট্রিম ছবিতে এতদিন খুব বেশি পেয়েছি কি আমরা? আবার 'বম্বে বেগমস' বা 'ফোর মোর শটস প্লিজ়'-এর মতো সিরিজ়গুলোয় মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাঁদের যৌন চাহিদা, ভুল-ত্রুটি সবমিলিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে চরিত্রগুলোকে। যৌনতা, প্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে অকপট মেয়েরা যে নিজের শর্তে বাঁচতে পারেন, নিজের জীবনের নিয়মনীতি নিজেই লিখতে পারেন...এধরনের মাল্টি ডাইমেনশনাল 'ফ্লড' চরিত্রই ওটিটি-র ইউএসপি। শুধু মহিলা কনটেন্ট ক্রিয়েটের নন, পুরুষ লেখক বা পরিচালকরাও মেয়েদের চরিত্র নিয়ে ভাবছেন, নতুন 'পারসপেকটিভ'-এর জন্ম দিচ্ছেন। 'বুলবুল'-এর মতো ওয়েব সিনেমা বানানো অন্বিতা দত্ত বলেছিলেন, ''বিমল রায়ের মতো পুরুষ পরিচালকও কিন্তু মহিলাদের নিয়ে গল্প লিখেছেন। 'বন্দিনী', 'সুজাতা', 'মধুমতী'...সবই তাঁর সৃষ্টি।'' তবে 'মেড ইন হেভেন', 'আরিয়া', 'হান্ড্রেড', 'দিল্লি ক্রাইমস', 'ডার্লিংস', 'শি'-এর মতো গল্প তৈরি হলেও ওটিটি-তে কি সত্যিই মেয়েদের চরিত্রায়ণ যথার্থ হচ্ছে? অনেকটাই হচ্ছে। তবে কিছু স্টিরিওটাইপ ভাঙা এখনও হয়তো বাকি। 'বম্বে বেগমস'-এর 'রানি' যেমন যৌন হেনস্থার শিকার, 'বুলবুল'-এর বুলবুলও ম্যারিটাল রেপের ভিক্টিম। মেয়েরা হয় কোনওরূপ নিগ্রহের 'ভিক্টিম' হবে, নয়তো উচ্চবিত্ত ঘরের কনফিউজ়ড চরিত্র হবে...এধরনের



'গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি'-তে আলিয়া ভট্ট

স্টিরিওটাইপ বোধহয় ওটিটি-তে একটু বেশি। একজন পুরুষ চরিত্রকে যেভাবে তুলে ধরা হয়, তাঁর যে যে আচরণগুলোকে নর্মালাইজ় করা হয়, মহিলাদের ক্ষেত্রে তা করতে অসুবিধে কোথায়? নাকি দর্শক এখনও এতটাও লিবারেল মহিলা চরিত্রকে গ্রহণ করতে পারবেন না?

বাংলা চলচ্চিত্রে নারীদের চিত্রায়ণ

এদেশে রুপোলি পরদায় বিবর্তিত নারীচরিত্রের প্রবর্তক কে বা কারা, তা নিয়ে মতান্তর থাকতেই পারে। তবে বাংলা চলচ্চিত্র যে সেই বিবর্তনের অন্যতম কাণ্ডারী, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শ্বশুরবাড়ির কলহ, ত্রিকোণ প্রেম বা নায়ক-নায়িকা-খলনায়কের গতানুগতিক ছকের বাইরে মহিলাদের বের করে আনার কাজটা অনেক বাঙালি পরিচালকই বেশ নিপুণ হাতে করে গিয়েছেন, সেই সাদা-কালো সময় থেকে। পাঁচ থেকে সাতের দশকে সেই পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিলেন মূলত ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং সত্যজিৎ রায়। পরদায় উত্তম-সুচিত্রার রসায়ন দেখতে অভ্যস্ত দর্শককে তাঁরা চেনালেন সর্বজয়া (পথের পাঁচালী), দয়াময়ী (দেবী), নীতা (মেঘে ঢাকা তারা)-র মতো নারীচরিত্র, যাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পুরুষতন্ত্রের ছক ভাঙতে অর্থ বা প্রতিপত্তি নয়, বরং সাহস এবং লড়াই করার মানসিকতা থাকা জরুরি। সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের সংগ্রামের কথা সেই সময় যেভাবে রুপোলি পরদায় তুলে ধরা হয়েছিল, তাও সত্যিই নজিরবিহীন। যে সত্যজিৎ রায় তাঁর সাহিত্যে নারীদের একপ্রকার ব্রাত্যই রেখে এসেছিলেন, তিনিও সেলুলয়েডে প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন নারীচরিত্রদের। সাহিত্যনির্ভর গল্প তো বটেই, এমনকী তাঁর নিজের লেখনিতেও তখন ফুটে উঠেছিল নতুন সময়ের নারীদের কথা। এই নারীচরিত্ররা সকলেই আসলে বাস্তবনির্ভর ছিলেন, রক্ত-মাংসে গড়া, ইচ্ছা ও


পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এবং দীপ্তি নাভাল


'মেঘে ঢাকা তারা'র বিখ্যাত দৃশ্য

পাঁচ থেকে সাতের দশকে সেই পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিলেন ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এবং সত্যজিৎ রায়। পর্দায় উত্তম-সুচিত্রার রসায়ন দেখতে অভ্যস্ত দর্শককে তাঁরা পরিচয় করালেন সর্বজয়া (পথের পাঁচালী), দয়াময়ী (দেবী), নীতা (মেঘে ঢাকা তারা)-র সঙ্গে।


সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী'

বাসনা প্রকাশে স্পষ্ট। তাঁরা সমাজ-নির্ধারিত নারীত্বের বেড়া লঙ্ঘন করতে পিছপা হলেন না, বরং প্রয়োজনে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার সাহস দেখালেন। সে যুগে বাস্তব আর রুপোলি পরদার বিভেদ দূর করতে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন এই ধূসর নারীচরিত্ররা। 'একদিন প্রতিদিন' এবং 'পদাতিক'-এ, সত্তরের বাংলার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নারীদের তৎকালীন সামাজিক অবস্থানকে তুলে ধরেছিলেন পরিচালক মৃণাল সেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের পরিচয় তৈরির সংগ্রামকে অত নিঁখুতভাবে পরদায় ফুটিয়ে তোলা, তথা দর্শকের মনে দাগ কাটা একেবারেই সহজ ছিল না। কিন্তু এই কিংবদন্তি পরিচালকরা সেই সাহস করেছিলেন বলেই বাংলা চলচ্চিত্র নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছিল পরবর্তীতে। অবশ্য মেনস্ট্রিম সিনেমাতেও যে নারীর ক্ষমতায়নকে একেবারে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, তা বলা ভুল। হয়তো চিত্রায়ণের ধরন আলাদা ছিল, বা সেসব কাহিনিতে নারীদের আত্মসংগ্রামকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া





'একদিন প্রতিদিন' ও 'দ্বীপ জ্বেলে যাই'



'গয়নার বাক্স'র দৃশ্য

হয়েছিল, তবে 'ইন্দ্রাণী', 'দীপ জ্বেলে যাই' বা 'অগ্নিপরীক্ষা'-র নারীচরিত্রদের সেই সময়ের নিরিখে চিন্তায়, চেতনায় এগিয়ে রাখতেই হবে। এরপর এলেন অপর্ণা সেন, ঋতুপর্ণ ঘোষ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রমুখেরা। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁরা বললেন নারীদের অন্যান্য সংগ্রামের কথা। '৩৬ চৌরঙ্গী লেন' তুলে ধরল স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতে ভায়োলেট স্টোনহ্যাম নাম্নী এক অ্যাংলো নারীর একাকিত্বের গল্প, এক অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্যকে অস্বীকার করার সাহস দেখালেন 'পরমা', সতীদাহপ্রথার প্রেক্ষাপটে নারীর সামাজিক নিগ্রহের কথা বলল 'সতী', মধ্যবিত্ত পরিবারের এক শাশুড়ি-বউমার সম্পর্ককে নতুন আলোয় চেনাল 'পারমিতার একদিন'। আবার নয়ের দশকে যখন বিশ্ব জুড়ে নারীবাদের ঝড় উঠেছে, সেই প্রেক্ষাপটে ঋতুপর্ণ ঘোষ উপহার দিলেন 'উনিশে এপ্রিল', 'দহন', 'বাড়িওয়ালি', 'উৎসব'-এর মতো ছায়াছবি। সেই সব গল্পে কখনও ফুটে উঠেছে মধ্যবয়স্কা কিংবা প্রৌঢ় নারীদের একাকিত্বের ছবি, কখনও নারীদের সম্পর্কের টানাপড়েন, কখনও আবার তাঁর মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ের কথা। চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত নারীদের চিরাচরিত দুর্বল, অসহায় ইমেজ পরবর্তীতে ভেঙেছিল 'শুভ মহরৎ', 'অন্দরমহল', 'মন্দ মেয়ের উপাখ্যান', 'আলো', 'গয়নার বাক্স', 'বিসর্জন'-এর নারীচরিত্ররা। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গত দশক সেই নিরিখে ছক-ভাঙা নারীচরিত্রের চিত্রায়ণে অনেকটাই পিছিয়ে। আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের সামাজিক অবস্থান যত বদলেছে, ততই তাঁদের সংগ্রাম, তাঁদের ক্রাইসিসও বদলেছে। সেই ক্রাইসিস নিয়ে সিনেমা তৈরি হয়েছে ঠিকই, তবে পরিচালনায়, চিত্রনাট্যে, বিগত সাত-আট দশকের তুলনায় সেগুলো অনেকটাই দুর্বল। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই রয়েছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলার ধরন বদলানোও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একটা সময়ে যে ধরনের নারীচরিত্র বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্ব মঞ্চে প্রথম সারিতে এনে বসিয়েছিল, তেমন পাথব্রেকিং চরিত্র আর উঠে আসছে কই! বরং ছক ভাঙতে গিয়ে অজান্তেই নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে আধুনিক নারীচরিত্ররা। সমাজের শোষণ বা অত্যাচারের শিকার হলেই একজন নারী ছক ভাঙতে ব্রতী হবেন বা নিজের অধিকারের লড়াইতে নামবেন, সবক্ষেত্রে এই চিত্রায়ণও তো সঠিক নয়। আধুনিক সময়ে যখন আমরা লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলছি বা পুরুষ-নারীর ইকুয়ালিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলছি, সেই সময়ে মহিলাচরিত্রদের পৃথকীকরণ রূপে এহেন স্টিরিওটাইপিং নিয়েও অবশ্যই ভেবে দেখা জরুরি।



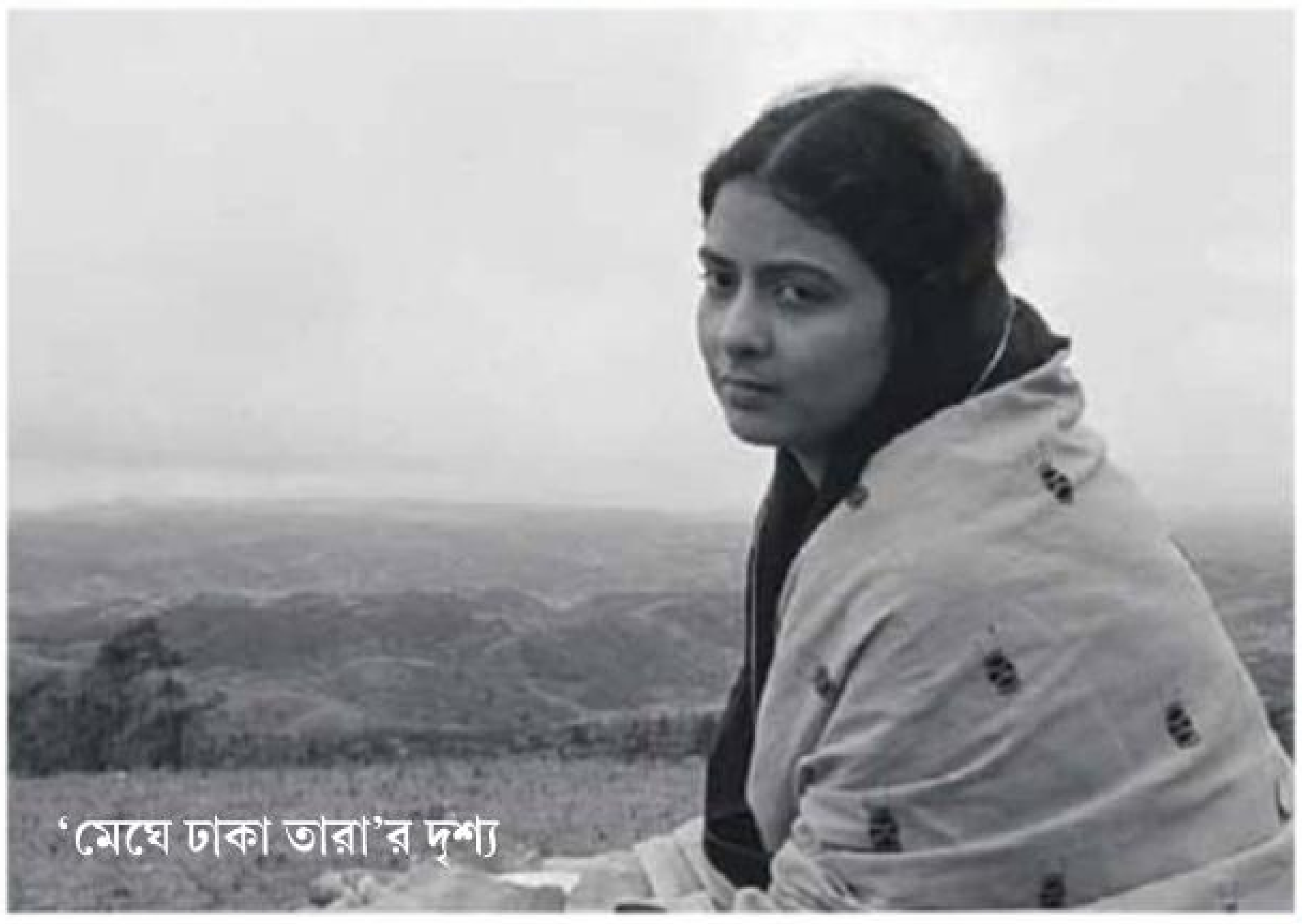
ঋতুপর্ণ ঘোষ

সিরিয়ালের বিবর্তন

অনেকটা একই কথা প্রযোজ্য সিরিয়ালের ক্ষেত্রেও। এই মুহূর্তে হিন্দি এবং বাংলা



'গানের ওপারে'



'মেঘে ঢাকা তারা'র দৃশ্য



'সাঁস' ধারাবাহিকের দৃশ্যে নীনা গুপ্তা ও কনওয়ালজিৎ সিংহ

টেলিভিশনে যে ধরনের নারীচরিত্র উপস্থাপিত হয়, তাঁদের নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক বলা যায় কি যায় না, তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে যদিও এই চরিত্ররা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণি (ব্যতিক্রম রয়েছে নিশ্চয়ই) থেকে উঠে আসা সাধারণ মেয়েদের গল্প বলে, কিন্তু বাস্তবের নারীদের সঙ্গে এঁদের সত্যিই মেলানো যায় কি? প্রথমত, মেয়েদের ঘরোয়া, সর্বগুণসম্পন্ন, দশভূজা ইমেজ ভাঙায় এই চরিত্ররা অনেক পিছিয়ে। বরং কোথাও না কোথাও তাঁরা আজও প্রচ্ছন্ন পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোকেই মহিমান্বিত করে চলেছে। হয় তাঁরা সব প্রতিকূলতাকে জয় করে নেওয়া অপার সাহসী, আদর্শ নারী, নাহলে খলনায়িকা। দ্বিতীয়ত, স্বামী, সংসার এবং সন্তান ঘিরেই তাঁদের জীবন, জীবনের সব সংগ্রাম। আধুনিক নারী আজ যেখানে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে মহাকাশ অবধি পৌঁছে গিয়েছে, সেখানে ধারাবাহিকের নারীচরিত্রদের জীবনে আজও প্রধান ক্রাইসিস স্বামীর একাধিক বিয়ে, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক অথবা সাংসারিক কূটকাচালি। হয়তো এখনও এই সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছেন অনেকে, কিন্তু এর বাইরে নারীদের রোজকার লড়াই, তাঁদের জয়, ত্যাগ, চাওয়াপাওয়ার কথা তুলে ধরতে কতটা সক্ষম ছোট পরদা? এর স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া যেতেই পারে যে, আধুনিক দর্শক এই ধরনের কনটেন্টই পছন্দ করছেন। অন্তত টিআরপি লিস্টে চোখ রাখলে এই কথার সত্যতা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকে না। তবে সেক্ষেত্রে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, একটা সময় ছোট পরদাই নারীদের স্বাধীন, স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাকে তুলে ধরেছিল 'হসরতেঁ', 'শান্তি', 'অল্পভিরাম', 'অস্তিত্ব', 'সাঁস', 'তেরো পার্বণ', 'বাহান্ন এপিসোড'-এর মতো ধারাবাহিকের মাধ্যমে। এই ধারাবাহিকগুলো শুধু যে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব মুক্ত ছিল, তা নয়, বরং তৎকালীন সময়ের নিরিখেও যথেষ্ট আধুনিক ছিল। তৎকালীন দর্শকরা মোটেই ভারতীয় মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ

এই মুহূর্তে হিন্দি এবং বাংলা টেলিভিশনে যে ধরনের নারীচরিত্র উপস্থাপিত হয়, তাঁদের নারীর ক্ষমতায়নের প্রতীক বলা যায় কি যায় না, তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে।

জানানো এই সব কনটেন্টের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু গল্পের নতুনত্ব, ভিন্নধর্মী চরিত্রদের তাঁরা আপন করে নিয়েছিলেন ঠিকই। মহিলাদের কর্মক্ষেত্রের নানা ওঠাপড়া, দৈনন্দিন স্ট্রাগল, তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের এগিয়ে আসার মতো বিষয় নিয়ে তৈরি সেই সব ধারাবাহিক এই একবিংশ শতকেও সমান প্রাসঙ্গিক। পরবর্তীকালে সেই ট্রেন্ড কিছুটা হলেও ধরে রেখেছিল 'বহ্নিশিখা', 'খেলা', 'গানের ওপারে'-র মতো ধারাবাহিক। মেয়েদের গায়ের রং, সামাজিক শোষণ বা বাল্যবিবাহপ্রথার মতো সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিল 'সাত ফেরে: সালোনি কা সফর', 'অগলে জনম মোহে বিটিয়া হি কিজো', 'বিদাই' এবং 'বালিকাবধূ'-র মতো হিন্দিভাষী সিরিয়াল। পরবর্তীতে এই সব গল্পের মোড় গতে বাঁধা ছকে ঢুকে গেলেও অন্তত বিষয় নির্বাচনের কৃতিত্বটুকু তাদের অবশ্যপ্রাপ্য।

পরিশেষে একথা বলতেই হয় যে, ধারাবাহিকের সাফল্যের দায়ভার যতই দর্শকদের কাঁধে ফেলে দেওয়া হোক না কেন, সেই দায়িত্ব আসলে দর্শকের পাশাপাশি প্রযোজক-পরিচালক-নির্মাতাদেরও। সেই দায়িত্ব পালন করলে, ভবিষ্যতেও ছোট পরদা এমন দৃষ্টান্ত আরও তৈরি করবে, সেই আশা করাই যায়।

ছবি সৌজন্যে: ইন্টারনেট

মেয়েদের অগ্রগতি

পারফর্মিং আর্টসে নারীদের গ্রিনরুম



রোজকার জীবন হোক বা শিল্পের পরিসর— নারীর আমিত্বের প্রতিষ্ঠা ও যাপন এক নিরলস সংগ্রামের ইতিকথা। তার সংজ্ঞা বদলেছে, বদলেছে ফর্ম। কিন্তু কখনওই বিরতি আসেনি সেই জার্নিতে। সেই নর্তকী বা দেবদাসী প্রথা থেকে বাঈজি সংস্কৃতি হয়ে আজকের পারফর্মিং আর্টসের প্রেক্ষিতে নারী ক্ষমতায়নের বিবর্তনকেই তুলে ধরার চেষ্টা করলেন পৃথা বসু এবং দেবলীনা অধিকারী।

ওম্যান এমপাওয়ারমেন্ট, যাকে আমরা বাংলায় নারী ক্ষমতায়ন বলে থাকি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই লড়াইয়ের জন্ম ঠিক কোনখানে? কতটা বদলাল তার দৃষ্টিভঙ্গি? এই সব প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে আমাদের পারফর্মিং আর্টসের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। পারফর্মিং আর্টসের সূচনালগ্নেই উপস্থিত ছিল নারী ক্ষমতায়নের প্রথম ইঙ্গিত। শিল্পের এই ধারাটির প্রথম আলো পড়েছিল সমাজের তথাকথিত ‘অন্ধকার গলি’তে। এঁদের জীবন, টিকে থাকার গল্পই এই লড়াইয়ের সাক্ষ্য বহন করে। যার বিবর্তিত পথে আজকের নৃত্যে বা থিয়েটারে এসেছে নারীকেন্দ্রিক গল্প, সমাজের ঘুণধরা মনোভাব ভাঙার উচ্ছ্বাস ও নারী স্বাধীনতার উদ্‌যাপন।

তাহাদের কথা

'অন্ধকার গলি'র পথ সন্ধানে আমাদের যেতে হবে প্রাচীন ভারতের নৃত্যগীতপটিয়সীদের দরবারে। প্রচলিত অর্থে আমরা ‘গণিকা’ বলতে যা বুঝি, এঁরা ঠিক তেমনটা ছিলেন না। স্বয়ং রাজা এঁদের বার্ষিক সাম্মানিক বেতনের পরিবর্তে নিজের প্রাসাদে নিয়োগ করতেন। এঁদের আলয় ছিল প্রাচীন ভারতের জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষাব্রতীদের প্রধান আখড়া।

রীতিমতো পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন দ্বারা চৌষট্টি কলায় দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়েই পারদর্শী হয়ে উঠতেন তারা। শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকে 'বসন্তসেনা' এই গণিকা সম্প্রদায়ভুক্ত। এই প্রসঙ্গেই আসে বিখ্যাত আম্রপালির কথা। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে প্রাচীন ভারতের বৈশালী শহরের নগরবধূ ও নর্তকী ছিলেন তিনি। শোনা যায়, আম্রপালি ছিলেন অসামান্য সুন্দরী। তাঁর নাচ দেখে মুগ্ধ হন বৈশালীর রাজা মনুদেব। আম্রপালির বিয়ের দিন তাঁর ভাবী স্বামী, শৈশবপ্রেম পুষ্পকুমারকে হত্যা করেন রাজা। বৈশালীর নগরবধূ হিসেবে ঘোষিত হন আম্রপালি। এমন একসময় আসে, যখন বৈশালীর গৌরবগাঁথা তাঁর প্রতিভা এবং সৌন্দর্যের প্রায় সমার্থক হয়ে ওঠে। এছাড়াও বৌদ্ধযুগের ইতিহাস 'জনপদ-কল্যাণী', 'শালবতী'র মতো এরকম আরও অনেক নারীর সাক্ষী। দেবদাসীরা কি গণিকা সম্প্রদায়ভুক্ত? এর উত্তর সম্ভবত না। দেবদাসীদের স্থান রাজগৃহে বা নগরবধূরূপে নয়, দেবমন্দিরে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় দেবদাসী প্রথার। বলা হয়, গণিকাবৃত্তিকে স্বাধীনবৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে দেবদাসী প্রথা অগ্রণী ভূমিকা নেয়। তাঁদের জীবন-যৌবন অতিবাহিত হত দেবসেবায় ও দেবমন্দিরের দেখাশোনায়। তবে দেবদাসীদের মর্যাদা অন্যান্য সুশিক্ষিতা নতর্কীদের চেয়ে বেশি ছিল। কলাবিদ্যা শেখানোর জন্যই এঁদের মূলত নিয়োগ করা হত। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এঁদের শিখতে হত নৃত্য-গীত-অভিনয়। নৃত্য-গীত প্রদর্শনের মাধ্যমে যাঁরা রুদ্রগণিকা রূপে মনোনীত হতেন, তাদের আলাদা মর্যাদা ছিল, শিল্পী হিসেবে তো বটেই, সামাজিক দিক থেকেও। বাংলায় এই প্রথার তেমন চল না থাকলেও, পাশের ওড়িশায় এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। দৃষ্টান্ত পুরীর মন্দির। আজকের ওড়িশি নৃত্যকলার পূর্বসূরি ছিলেন এই দেবদাসীরাই, যাঁরা 'মাহারি' নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে পরশমণি মাহারি, শশীমণি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সমাজ তাঁদের পেশাকে যেভাবেই দাগিয়ে দিক না কেন, তার শোষণ, চোখরাঙানিকে পার করে তাঁরা চলার চেষ্টা করেছিলেন আপন শর্তে। গার্হস্থ্য জীবনের চার দেওয়াল ভেঙে, নিজের প্রতিভাকে উনুনের আঁচে না সেঁকে তাকে মুক্ত করার যে আনন্দ, তাঁরাই ছিলেন সেই লড়াইয়ের প্রথম সৈনিক।


আম্রপালি

রুদ্রগণিকাদের আলাদা মর্যাদা ছিল। শিল্পী হিসেবে তো বটেই, সামাজিক দিক থেকেও। বাংলায় এই প্রথার তেমন চল না থাকলেও, পাশের ওড়িশায় এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। দৃষ্টান্ত পুরীর মন্দির। আজকের ওড়িশি নৃত্যকলার পূর্বসূরি ছিলেন এই দেবদাসীরাই, যাঁরা 'মাহারি' নামে পরিচিত।


পরশমণি মাহারি

বাঈজিদের 'মেহফিল'

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে কলকাতার উঠতি 'বাবু'দের বাড়ি মুখরিত হত বাঈজিদের নাচে-গানে। আমন্ত্রিত হতেন সাহেব-সুবোরাও। মুগ্ধ হয়ে শুনতেন তাঁদের সুরেলা স্বর। অযোধ্যার বিতাড়িত নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ-এর কলকাতার মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত জীবনযাপনকালে যে সঙ্গীতসভার পত্তন ঘটে, তাকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন স্থান থেকে বাঈজিদের আগমন ঘটে। এঁরা রাগসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যে, মূলত কথকে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতেন। বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঈজিদের জন্য পরিচিত ছিল লখনউ, এলাহাবাদ, বেনারস, কলকাতা প্রভৃতি স্থান। প্রথমযুগে নাম করা বাঈজিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন নিকি, নান্নীজান প্রমুখ। পরবর্তীতে মুশতারিবাঈ, গওহরজান, বেগম আখতার প্রমুখেরা বিখ্যাত হন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নাকি রেডিওতে মুশতারিবাঈয়ের বেহাগ শুনে বলেছিলেন,



গওহর জান

> যাপন ও পেশাজীবনে নারী ক্ষমতায়নের নতুন দিক দেখিয়ে ভারতের প্রথম গ্রামোফোন আর্টিস্ট বলতে পেরেছিলেন, ‘‘মাই নেম ইজ় গওহর জান।’’

‘‘আমি কবে এই কিন্নরীকে দেখতে পাব?’’ বাঈজিরা আসলে গান্ধর্বী। সেদিক থেকে দেখলে উর্বশী, মেনকারাও প্রাচীন বাঈজি। রাজস্থানি ভাষায় ‘বাঈ’ কথার অর্থ মা বা বোন। তাঁকে সম্মান জানাতেই ‘জি’ যুক্ত করা হয়। সুতরাং এ থেকেই বোঝা যায়, সেকালের সমাজে বাঈজিদের যথেষ্ট সম্মান ছিল। প্রতিবেদক মানসী মুখোপাধ্যায় এক প্রতিবেদনে বলেছেন, এক আশ্চর্য মাতৃতান্ত্রিক পরম্পরা ছিল এই বাঈজিপ্রথা। পুরুষদের ভূমিকা এখানে স্রেফ দর্শক, খরিদ্দার কিংবা আড়কাঠি মস্তানের।

‘মাই নেম ইজ় গওহর জান’

‘‘বহেন, তুম পলঙ্ক পার বড়ি অচ্ছি সাজোগি, মগর অ্যায়সে মেহফিল মেঁ বৈঠনেকা হ্যায়সিয়াত তুমহারি নেহি হ্যায়’’— কোনও এক ধ্রুপদশিল্পীর এই অপমান থেকে দেশের প্রথম স্টার হয়ে উঠলেন গওহর জান। কথক, ঠুমরির পাশাপাশি পদাবলি ও কীর্তনের তালিমও নিয়েছিলেন তিনি। পারদর্শী ছিলেন প্রায় ১০টি ভাষায়। গওহর তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই মন জয় করলেন দর্শক-শ্রোতাদের। কিন্তু তখনও তাঁর নিজেকে প্রমাণ করা হয়ে উঠল না। এক মেহফিলে দেখা হল বিখ্যাত বেনজ়ির বাঈয়ের সঙ্গে। চ্যালেঞ্জ করলেন বেনজ়ির। যোগ্য জবাব দিলেন গওহর। মেহফিলের এই গওহর জানের অভ্যাস বজায় থেকেছে পরেও। মহানগর বারবার দেখেছে তাঁর সেই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মেহফিল। ঠাটবাট চলন-বলনেও তিনি এতটাই জাঁক-জমক ও বিলাসিতা প্রদর্শন করতেন যে, ইংরেজদের জুড়িগাড়িকেও তাঁর জুড়িগাড়ির পাশে ম্লান হতে হত, তিনি ছাড়া শহরে আর কারও এত বড় জুড়িগাড়ি ছিলও না, কোনও অভিজাত বা ধনী ব্যক্তিরও নয়। ভালবেসেছিলেন যাকে, সেই আব্বাস সর্বস্বান্ত করেছিল গওহরকে। আব্বাসের করা মামলায় জিতেছিলেন গওহরই। আজীবন গওহর বেঁচেছিলেন নিজের শর্তে। নিঃস্ব হওয়ার পরেও তাই কারও সাহায্য নেননি। এভাবেই যাপন ও পেশাজীবনে নারী ক্ষমতায়নের নতুন দিক দেখিয়ে ভারতের প্রথম গ্রামোফোন আর্টিস্ট বলতে পেরেছিলেন, ‘‘মাই নেম ইজ় গওহর জান।’’

বাংলা থিয়েটারমঞ্চের প্রথম নায়িকা

গানের ক্ষেত্রে বাংলার ঘরে-ঘরে মেয়েদের চর্চার পিছনে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর অবদান অনস্বীকার্য। আবার বাংলার প্রথম থিয়েটার ‘দ্য ডিসগাইজ়’ নাটকের মঞ্চে প্রথমবারের জন্য অভিনেত্রী রূপে উপস্থিত ছিলেন পাঁচ নারী। সমাজের কোন অংশ থেকে তাঁরা এসেছিলেন, তা অনুমান করা খুব কঠিন না হলেও, তাঁদের ঠিক কতখানি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য সেভাবে মেলে না। কিন্তু পরবর্তীতে প্রসন্ন ঠাকুরের ‘হিন্দু থিয়েটার’, প্যারীমোহন বসুর ‘জোড়াসাঁকো থিয়েটার’ অথবা কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘বিদ্যোৎসাহিনী’র রঙ্গমঞ্চ থেকে নায়িকারা স্রেফ নিখোঁজ হয়ে গেলেন। নারী চরিত্র রইল টেক্সটে, কেবল মঞ্চে রইল না নারী প্রতিনিধিত্ব। পুরুষরাই অভিনয় করলেন নারীর বেশে। সমাজে আরও জাঁকিয়ে বসল পুরুষপ্রাধান্য। নারীদের অস্তিত্ব ছিল অন্দরমহল কেন্দ্রিক। পরিচয় ছিল পিতৃতান্ত্রিক— মা, বোন, স্ত্রী। সংসারের বাইরে পরিচয়হীন নারীরা সহজেই হয়ে উঠল ‘বাইরের মেয়েছেলে’। সুতরাং পপুলার কালচার বা থিয়েটারে ভদ্রবাড়ির মেয়েদের



গোলাপ সুন্দরী


নটি বিনোদিনী

বাড়ির মেয়ে পুঁটি কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের অবৈতনিক স্কুলে ভর্তি হতে গিয়ে হয়ে উঠলেন বিনোদিনী দাসী। তিনি দারিদ্র্যের কারণে 'গোলাপ ফুল' পাতানো গঙ্গাবাঈ মজুমদারের কাছে সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। গঙ্গাবাঈয়ের কাছে গান শুনতে আসা পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠের মাধ্যমে দশ টাকা বেতনে ভুবন নিয়োগীর 'গ্রেট ন্যাশনাল'এ ভর্তি হলেন বিনোদিনী। নারীর আর্থিক স্বাধীনতার প্রথম আভাসটুকু জানিয়ে বিনোদিনী এলেন বাংলা থিয়েটারে। তাঁর দ্বিতীয় নাটকে 'হেমলতা' চরিত্রে মুগ্ধ, বিস্মিত হল থিয়েটারহল। বেঙ্গল থিয়েটারে কপালকুন্ডলা, মনোরমা, প্রমিলা— একের পর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন বাংলা থিয়েটারের অবিসংবাদী অভিনেত্রী। গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে ২৫ টাকার বেতনে এলেন বিনোদিনী। 'চৈতন্যলীলা'য় অভিনয় তাঁর জীবনে ও থিয়েটারে নারী ক্ষমতায়নের বিশেষ ঘটনা। যার প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ। পুরুষরা নারীচরিত্রে অভিনয় করলেও নারীর পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় বৈপ্লবিক ঘটনা। প্রহ্লাদ, নিমাই চরিত্রে তাঁর অভিনয় বাংলা সমাজে রোজকার আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সমাজের দাগানো 'ঘৃণ্য' স্তরের বাসিন্দা হয়েও তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও নাম ভীষণ রকম জোড়ালো হয়ে উঠেছিল। বাংলা সমাজ পরিচিত হল এক নায়িকা তথা নারীর স্টারডমের সঙ্গে। ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের প্রথম কিংবদন্তির স্যাক্রিফাইজ়ও কম ছিল না। স্টেজের স্টার বিনোদিনীরও ছিল বাঁধা বাবু জনৈক কুমার সাহেব। তার বিবাহের খবর শুনে ভেঙে পড়েছিলেন বিনোদিনী। তবু তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন থিয়েটারের স্বার্থে। প্রতাপ জহুরির অপমান থেকে গুরু গিরিশ ঘোষকে রক্ষা করতে নিজেকে বিক্রি করলেন 'ফ্লাওয়ার অফ বেঙ্গলি স্টেজ'। মারোয়াড়ি

গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে ২৫ টাকার বেতনে এলেন বিনোদিনী। 'চৈতন্যলীলা'য় অভিনয় তাঁর জীবনে ও থিয়েটারে নারী ক্ষমতায়নের বিশেষ ঘটনা। সেইসময় নারীর পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় ছিল বৈপ্লবিক ঘটনা।

প্রবেশ হয়ে উঠল 'নৈব নৈব চ'। তবুও মঞ্চে এলেন নায়িকারা। 'ইন্ডিয়ান ডেইলি' থেকে জানা যায়, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে হাওড়ার 'দি ওরিয়েন্টাল থিয়েটার'-এ 'বিদ্যাসুন্দর' পালায় অভিনয় করেছিলেন দু'জন মহিলা। তবে প্রথমবারের জন্য 'বেঙ্গলি থিয়েটার'-এ মহিলারা নিয়মিতভাবে মঞ্চে এলেন। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে নায়িকার চরিত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পর্দা সরিয়ে মঞ্চে পা রাখলেন- শ্যামা, গোলাপসুন্দরী, জগত্তারিণী, এলোকেশী। স্বভাবতই তাঁরা 'ভদ্রবাড়ি'র 'ভাল মেয়ে' ছিলেন না। এসেছিলেন সমাজের অন্ধকার নিষিদ্ধ অঞ্চল থেকে। মঞ্চে নারীর আগমন, সমাজে তুমুল আলোড়ন তৈরি করেছিল। পিতৃতন্ত্রের জানলার খড়খড়ি সরিয়ে উঁকি দিল নারীর যে ক্ষমতায়ন, তা আরও প্রসারিত হল 'গ্রেট ন্যাশনাল'-এর মাধ্যমে। যেখানে প্রবেশ ঘটল পাঁচজন অভিনেত্রীর- কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, জাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী। ১৮৭৪ এ ঠিক এই দিনেই পুরুষশাষিত সমাজের চোখে ধুলো দিয়ে থিয়েটারে নারী উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে উঠল। 'শত্রু সংহার' নাটকের মঞ্চে দ্রৌপদীর সখির ভূমিকায় পদার্পণ করলেন নটী বিনোদিনী। রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্পের নায়িকা স্বামীপ্রেমবিরহিতা গিরিবালা যেমন খুঁজে পেয়েছিল তার স্বাধীনতা, থিয়েটার পারফরম্যান্সে, এঁদের জীবনের গল্পও যেমন অনেকটা সেরকমই।

পুঁটি থেকে 'ফ্লাওয়ার অফ বেঙ্গলি স্টেজ'

নটি বিনোদিনীর আগমন যৌনপল্লি থেকে কিন্তু মোটেই ছিল না। খোলার



মালবিকা সেন
নৃত্যশিল্পী

যে জন্ম দিতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে সেই তো মহাশক্তি। সেইজন্যই আমরা মহাপার্ব্বতী, মহাকালী বলি। তাই প্রথম থেকেই আমরা কনসিডার করতে পারি, নারীশক্তি মহাশক্তি। একটা সময় ছিল যখন মেয়েদের পদদলিত করে রাখা হত। যত শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, ততই মেয়েরা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। শারীরিকভাবে নারীরা পুরুষদের থেকে দুর্বল হলেও বুদ্ধি এবং কাজের পরিসরে নারীরা পুরুষদের থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে। দেবদাসীপ্রথায় সেই চরম দুর্দশার মধ্যে কেউ কেউ তো নিশ্চই রিভল্ট করেছিলেন, তাদের সকলের গল্প আমাদের জানা নেই। কাউকে তো মেরেও ফেলা হয়েছে। আস্তে আস্তে তাদের পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়েছে। তারা তাদের কথা বলতে পেরেছে। দশভুজা দুর্গা আসলে রিপ্রেজেন্ট করেন একজন নারীর মাল্টিটাস্কিংয়ের ক্ষমতাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সারাদিন নানা কাজ করি। ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের বিষয়টিকে এনজয় করি, রেসপেক্ট করি। যারা সত্যিই কিছু করতে চায়, আমি তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।



পারমিতা সাহা • নৃত্যশিল্পী

আজ থেকে ২৪-২৫ বছর আগে যখন আমি কন্টেমপরারি ডান্সফর্মের শো শুরি করি, তখন এই ব্যাপারটা নিয়ে কারওর সেরকম কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শো করার সময় নানা কুরুচিকর মন্তব্যেরও সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আমরা কখনওই থেমে থাকিনি। বরং আরও রিসার্চ করে, এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে গিয়েছি। বর্তমানে এ অবস্থার অনেকখানি উন্নতি ঘটেছে। মানুষ ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছে এই ফর্মের সঙ্গে।

যুবক গুর্মুখ রায়ের টাকায় তৈরি থিয়েটার বিনোদিনীর নামে হবে, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। অভিনেত্রীর সম্মানের টাকায় নির্মিত থিয়েটারের নামকরণের সময় খোঁজ পড়ল অভিনেত্রীর চরিত্রের। নটীর নামে থিয়েটারহল জনগণ বয়কট করবে, এই অজুহাতে বি. থিয়েটার হয়ে গেল স্টার থিয়েটার। আঘাত পেলেও থিয়েটার ত্যাগ করতে পারেননি বিনোদিনী। ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকে 'সতী' চরিত্রে বিনোদিনীর অপূর্ব অভিনয়ের মাধ্যমে স্টার থিয়েটারের সূচনা হয়। বিনোদিনী হোন বা গোলাপসুন্দরী, অথবা তিনকড়ি দাসী, কুসুমকুমারী, তারাসুন্দরী কিংবা নরী সুন্দরী, নীরদাসুন্দরী সকলেই সমাজের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বারবার। তবু থিয়েটারকে আঁকড়ে বেঁচেছিলেন তারা। অন্ধকার থেকে আলোয়, পরিচয়হীনা থেকে স্বনামধন্যা হওয়ার হাতিয়ার ছিল এই পারফর্মিং আর্টস।

ঠাকুরবাড়ির পারফর্মিং আর্টস

বাংলা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রভাদেবী, নীহারবালা, বড় রাজলক্ষ্মী, কৃষ্ণভামিনী, শেফালিকা, রেবাদেবী, সরযূবালা, মলিনা দেবী প্রমুখ শক্তিশালী অভিনেত্রীদের প্রত্যেকে কিন্তু সমাজের নিষিদ্ধ অংশ থেকে আসেননি। যার মুখ্য কারণ শিল্পজগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। পারফর্মিং আর্টস মঞ্চ বাঁধল ঠাকুরবাড়ির উঠোনে, ১৮৮১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি। 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় সরস্বতীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন তাঁর ভাইঝি প্রতিভা দেবী। নৃত্য ও নাটকে যারা অংশ নিতেন, এতদিন সমাজ তাদের দেখত ঘৃণার চোখে। রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্য ও নাটককেই যুক্ত করে দিলেন অ্যাকাডেমিকসের সঙ্গে। এরপর একে একে এলেন ঠাকুরবাড়ির মহিলামহল— হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা ও অভিজ্ঞা, জ্ঞানদানন্দিনী, ইন্দিরা দেবী, মৃণালিনী দেবী প্রমুখ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নৃত্যবিদদের এনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নৃত্যশিক্ষা ও চর্চার উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কোচিনের রাজা প্রেরিত কল্যাণী আম্মা, যিনি নামী দেবদাসী নৃত্যশিল্পী ছিলেন। শিখিয়েছিলেন স্বরম, কইকুট্টিকলি, কলামুল্লি নামক কয়েকটি নাচ। ভেলায়ুম মেনন নামে আর একজন নৃত্যশিল্পী আসেন কেরল থেকে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে পারফর্মিং আর্টস সমাজের দূরাগত অংশ থেকে এল মেনস্ট্রিমে। যার অন্যতম দৃষ্টান্ত প্রভা দেবী। ১৯২১-এর ১০ ডিসেম্বর, 'আলমগীর' অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনয় জগতে আসেন। তাঁর মতো শক্তিশালী অভিনেত্রীও সম্পূর্ণ মুক্তির স্বাদ পাননি। 'বারবধূ' অভিনয়কে কেন্দ্র করে তিনি সমাজের অশ্লীল আক্রমণের মুখোমুখি হন, বহুদিন নাটকে কোনও কাজ পাননি তিনি। ঊষা গাঙ্গুলির হাত ধরে আবার থিয়েটারে ফেরেন তিনি, ১৯৯৪ তে তিনি পেয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার।



প্রভা দেবী



অমলা শঙ্কর

মুক্তির ডাক

পারফর্মিং আর্টসে ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের ধারণা তো পাওয়া গেল। এবার যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার বদল ঘটল ফর্মেও। আর অস্তিত্বের জানান দেওয়া নয়, এই লড়াই গতি নিল সমমর্যাদার দাবীতে। নৃত্যশিল্পে এলেন অমলা শঙ্কর, যিনি উদয় শঙ্কর ঘরানার ক্রিয়েটিভ ডান্সফর্মের একটি যুগের নাম। ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের বদলে তিনি যোগ দিলেন ব্যালেতে। এলেন আফরোজ়া বুলবুল, সাধনা বসু প্রমুখ। থিয়েটারে এলেন তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, কেয়া

চক্রবর্তী, যাঁরা থিয়েটারকে বাছলেন শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে। গণনাট্যের মাধ্যমে তাঁরা নাটককে এক অন্য ভাষা দিলেন। সাধারণ মানুষ এই প্রথম মহিলা শিল্পীদের দেখলেন মুক্তির নায়িকা রূপে। 'রক্তকরবী' নাটকে নন্দিনী বা 'চার অধ্যায়'-এ এলার ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের পারফর্মেন্স দর্শকের মনে চিরকাল থেকে যাবে। 'আন্তিগোনে' নাটকের নামভূমিকায় কেয়ার অভিনয় বাংলা নাটকের মঞ্চে এক মাইলস্টোন। উনিশ শতকে থিয়েটারে ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের জার্নির গল্প 'টিনের তলোয়ার' নাটকের বসুন্ধরা চরিত্রে অসাধারণ দক্ষতায় মঞ্চে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শোভা সেন। এতদিনে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলেছে অনেকখানি। মেয়েদের বিবাহের গড় বয়স বেড়েছে, দেশভাগের পর অনেকটা মুছে গিয়েছে মেয়েদের ঘরে-বাইরের সীমারেখা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে তারা। পাশাপাশি আবার এসেছে কর্মক্ষেত্রে জটিলতা, নারী শোষণের নতুন ডিসকোর্স। আজকের পারফর্মিং আর্টসের বিষয়বস্তুতে উঠে এসেছে এই সবকিছুই। নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারীদের যাপন থেকে



সোহিনী সেনগুপ্ত
অ ভি নে ত্রী

আমাদের নান্দীকারে যখন কোনও নতুন মেয়ে জয়েন করে, প্রথমেই তাকে বলা হয়, বাড়ি ফিরতে রাত হবে। তোমাকে ব্যায়াম করতে হবে, খাবার ক্যারি করতে হবে, নিয়মিত লেখাপড়া করতে হবে। কোনও গার্ডিয়ান তোমাকে দিয়ে আসা- নিয়ে যাওয়া করতে পারবে না। তিনি যদি প্রত্যেকদিন এখানে এসে বসে থাকেন, তাহলে হবে না। রাত্রে ও কীভাবে বাড়ি ফিরবে, কী প্রোটেকশন নেবে, সেটা ওকে ঠিক করতে হবে। শি হ্যাজ় টু ট্র্যাভেল বাই হারসেলফ ইন দিস ওয়র্ল্ড। বাবা-মায়েদেরও 'আমি তোমাকে আগলাচ্ছি না, কিন্তু বিপদে পড়লে আছি' এই বোধটা আনা দরকার, যেটা আমি আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে পেয়েছি। এখান থেকেই আমার মনে হয় এমপাওয়ারমেন্টের সূচনা হয়। আমরা ছেলে-মেয়েকে আলাদা করে ট্রিট করি না। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই অভিনয় করে, সেট তৈরি ও বহন করে। দে ডু এভরিথিং, যা একটা ছেলে করে। নবদ্বীপ থেকে আসা অনিন্দিতা যখন দলে এসেছিল, তখন ও স্লিভলেস পরতে লজ্জা পেত। সপ্তর্ষি ওকে খুব ইন্সপায়ার করেছে। ওই মেয়েটি কিন্তু স্টেরয়েড ফ্রি বিকিনি মডেল প্রতিযোগিতায় পঞ্চম স্থান পেয়েছে। একটি মেয়ে বড় হতে হতে যে সমস্যার মুখোমুখি হয়, তার মেন্টাল হেলথ, ডিপ্রেশন, অ্যাডোলেসেন্সজনিত সমস্যা, যা তারা বাড়িতে বলতে পারে না, আমি এ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করি। আমি বলছি না, সবাই এমপাওয়ার্ড হতে পারে, যারা চায়, তারা পারে। অথরিটিকে প্রশ্ন করাও ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের একটি বেসিক ফিচার।


তৃপ্তি মিত্র

থিয়েটরে এলেন তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, কেয়া চক্রবর্তী, যারা থিয়েটরকে বাছলেন শ্রেণি সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে। গণনাট্যের মাধ্যমে তাঁরা নাটককে এক অন্য ভাষা দিলেন। সাধারণ মানুষ এই প্রথম মহিলা শিল্পীদের দেখলেন মুক্তির নায়িকা রূপে।

পারফর্মিং আর্টসের মঞ্চে। বদলেছে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা। গায়ের রং বা চেহারা নয়; বরং শিল্পীর মনন ও দক্ষতাই তার পরিচয় হয়ে উঠেছে। পারফর্মিং আর্টস আজ আর কেবল বিনোদন নয়, তা হয়েছে নারীর একান্ত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। সে তার রাগ, যন্ত্রণা, নাগরিক জীবনের টানাপোড়েন, আধুনিক সমাজের শোষণকে ফুটিয়ে তুলেছে নৃত্য ও থিয়েটারের মঞ্চে। তবে পারফর্মিং আর্টসে নারী ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার যে লড়াই, এখনও তা শেষ হয়নি। মেয়েদের অগ্রগতির এই যাত্রাপথ এগিয়ে চলেছে নারীস্বাধীনতা থেকে ইকুয়ালিটির অভিমুখে।

ছবি সৌজন্য: ইন্টারনেট



ব্রিজিত বার্দো

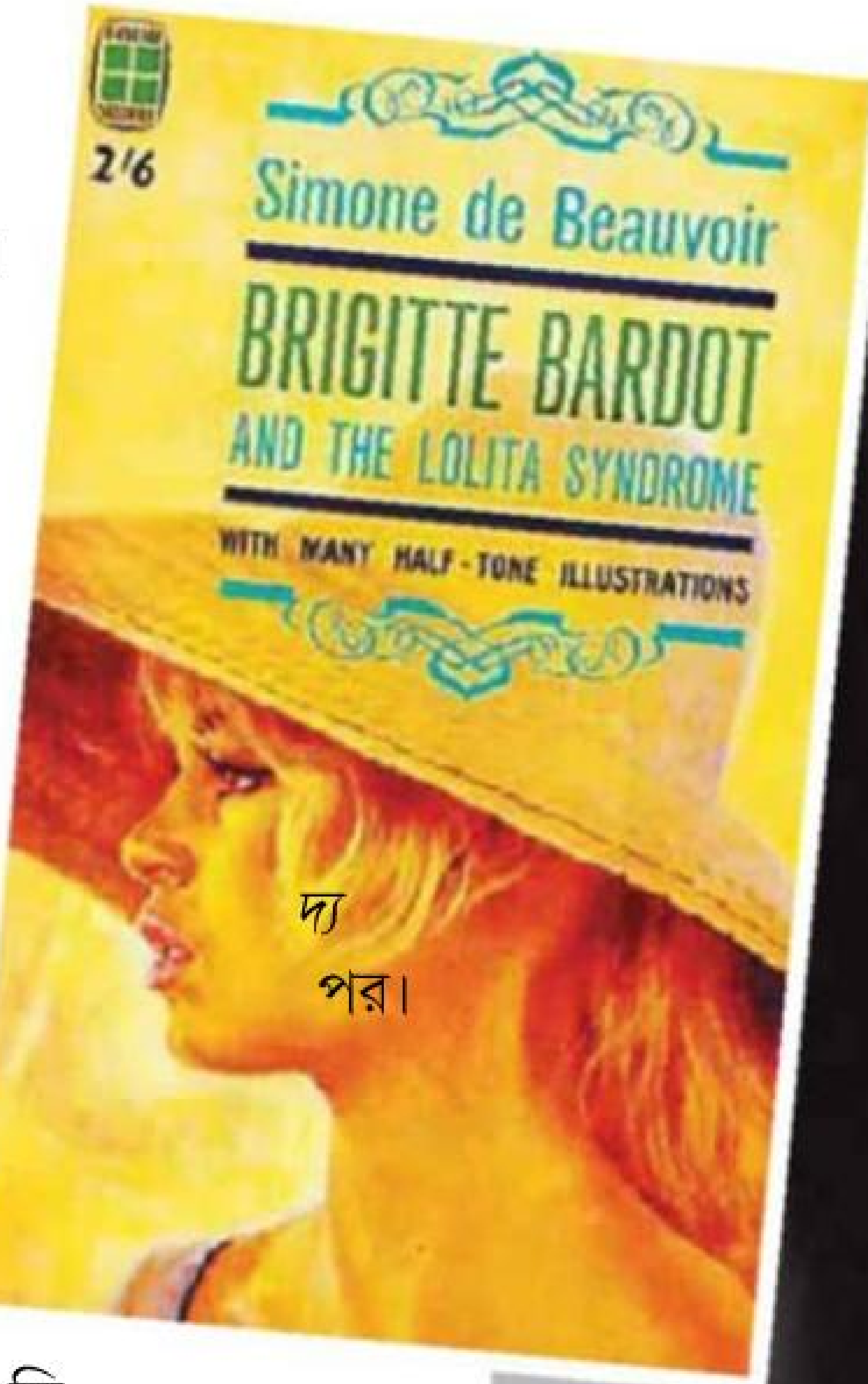
মেয়েদের অগ্রগতি

নারী কী চায়

একসময় জানতে চেয়েছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। মুক্ত নারী ও নারীর মুক্তি, এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বিস্তর। সাহিত্য থেকে দর্শন-তত্ত্ব অন্বেষণ করতে চেয়েছে নারীর পরিসর। লিখেছেন সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রিজিত বার্দো, অভিনেত্রী। চলচ্চিত্রে তাঁকে দেখা যায়, চলমানতায়— হাঁটছেন, ঘুরছেন-ফিরছেন তিনি। কখনও নাচের ছন্দে আলোড়িত তাঁর শরীর। কখনও তিনি ছেড়ে ফেলছেন পোশাক, সরিয়ে রাখছেন শরীর থেকে। সরাসরি দৃশ্যমান তাঁর ত্বক, প্রায়-নগ্ন শরীর। তাঁর উপস্থিতি তখন ইরোটিসিজ়মের সমার্থক। অথচ এই ইরোটিসিজ়ম, এই নগ্নতা আচমকা নয়। এই নগ্নতা তাঁর পোশাক-পরিহিত শরীরেও ছিল প্রকাশিত। এখানে তাই কোনও আকস্মিকতার ঘোর নেই। কোনও মায়াময়তা নেই। আছে দৃপ্ত, ছলনাহীন আগ্রাসন। বার্দো-র চলনবলনে যে-সমস্ত ইমেজ মুহুর্মুহু জন্ম নিয়েছে, তা দর্শককে একটি অবস্থানে টেনে এনেছে সঙ্গে-সঙ্গে। এ-অবস্থানে ব্রিজিত বার্দো তাঁর চুলের প্রবাহে, তাঁর চাহনিতে, তাঁর দুই স্তনের সফল আস্ফালনে যতটা এক আকাঙ্ক্ষিত শিকার, ততটাই সজাগ এক শিকারী। তাঁকে যতটা অবজেক্ট হিসেবে দেখছেন কামার্ত কোনও পুরুষ, বার্দো-ও ততটাই অবজেক্ট হিসেবে

দেখছেন পুরুষদৃষ্টিকে, পুরুষকে। আর এখানেই সংঘাতের এক সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। পুরুষ কেন মেনে নেবে যে, একজন নারীও তাকে অবজেক্ট হিসেবেই দেখবে, বা দেখার মতো ঔদ্ধত্য থাকবে একজন নারীর!



উপরের এই পর্যবেক্ষণগুলি করেছিলেন সিমন দ্য বোভোয়া। *ব্রিজিত বার্দো অ্যান্ড দ্য ললিটা সিনড্রোম* শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র রচনা লিখেছিলেন দ্য বোভোয়া, তাঁর অতি বিখ্যাত *দ্য সেকেন্ড সেক্স*-এর (১৯৪৯) ঠিক দশ বছর পর। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল রচনাটি, প্রচ্ছদপটে লেখা ছিল 'উইথ মেনি হাফ-টোন ইলাসট্রেশনস'। পাতা ওল্টালেই বোঝা যায় তিনটি জিনিস—কেন প্রচ্ছদেই ওই ঘোষণা, কেন বইটির সঙ্গে আলোকচিত্রগুলি জরুরি ছিল, কেন দ্য বোভোয়া-র মতো একজন প্রথম সারির লেখক-চিন্তক মেধাজীবী ব্রিজিত বার্দো-র মতো জনপ্রিয় এবং আপাত-লঘু (যাঁকে তখন 'সেক্স কিটেন', 'সেক্স সিম্বল' আখ্যায় ভূষিত করা হচ্ছিল অহরহ) এক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লিখেছেন, সময় ব্যয় করতে চেয়েছেন।


সিমন দ্য বোভোয়া ও বার্দোকে নিয়ে লেখা তাঁর সেই বই

বার্দো তখন খ্যাতিমান অভিনেত্রী, কয়েক বছর পরেই জাঁ-লুক গোদারের ছবিতেও অভিনয় করবেন তিনি। যদিও তাঁর অভিনয় নিয়ে সম্ভবত কেউ তখন আগ্রহী ছিল না। সকল চরিত্রেই তাঁর অভিব্যক্তি সমান, এই সমালোচনাই করা হত। কিন্তু তাঁকে 'দেখতে' ছুটত সকলে, সাগ্রহে, সোৎসাহে। আবার তার পরেও চলত কাটাছেঁড়া— বার্দো আসলে শয়তানের দূত, পাপের প্রলোভন, প্ররোচনা ইত্যাদি। নেতিবাচকভাবেই বার্দো খ্যাতিমান বেশি। হাফ-টোন ছবিগুলি এসবেরই উজ্জ্বল প্রমাণ।

দ্য বোভোয়া জানতে চেয়েছেন, বার্দো-কে নিয়ে শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন একটি সমাজ কেন এত সমস্যায়, এত অস্বস্তিতে পড়ছে। চলচ্চিত্রে বা অন্য কোনও দৃশ্যমাধ্যমে যৌন-ইশারা, নগ্নতা কোনও নতুন বিষয় নয়। বার্দো প্রথাগত সুন্দরীও নন। তা হলে কেন তাঁকে নিয়ে বিতর্ক, তাঁকে আক্রমণ? উত্তর সন্ধানে গিয়ে দ্য বোভোয়া বুঝতে পেরেছেন, বার্দোকে কেন্দ্র করে বিতর্ক-আক্রমণ-বক্রোক্তি বা তাঁকে ব্রাত্য করার প্রয়াসের শিকড়ে আছে প্রবল এক ভয়। পুরুষের ভয়। একজন নারী তাকে প্রতিনিয়ত যেন আহ্বান করছে যুদ্ধে নামতে, সম্মুখীন হতে তার। এ-যুদ্ধ যৌনতার যুদ্ধ। ক্ষমতা প্রদর্শন ও প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। সে-যুদ্ধে আবার নারীটিই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়ে যাচ্ছে। বা যেতে পারে। একপ্রকার হার স্বীকার করে নিয়েই যুদ্ধে নামা যেন। এখানে নারীও পুরুষের সঙ্গে একাসনে ক্ষমতার সমতায়। তাতেই, প্যারাডক্সিকালি, অসমতায় পড়ে গিয়েছে পুরুষ!

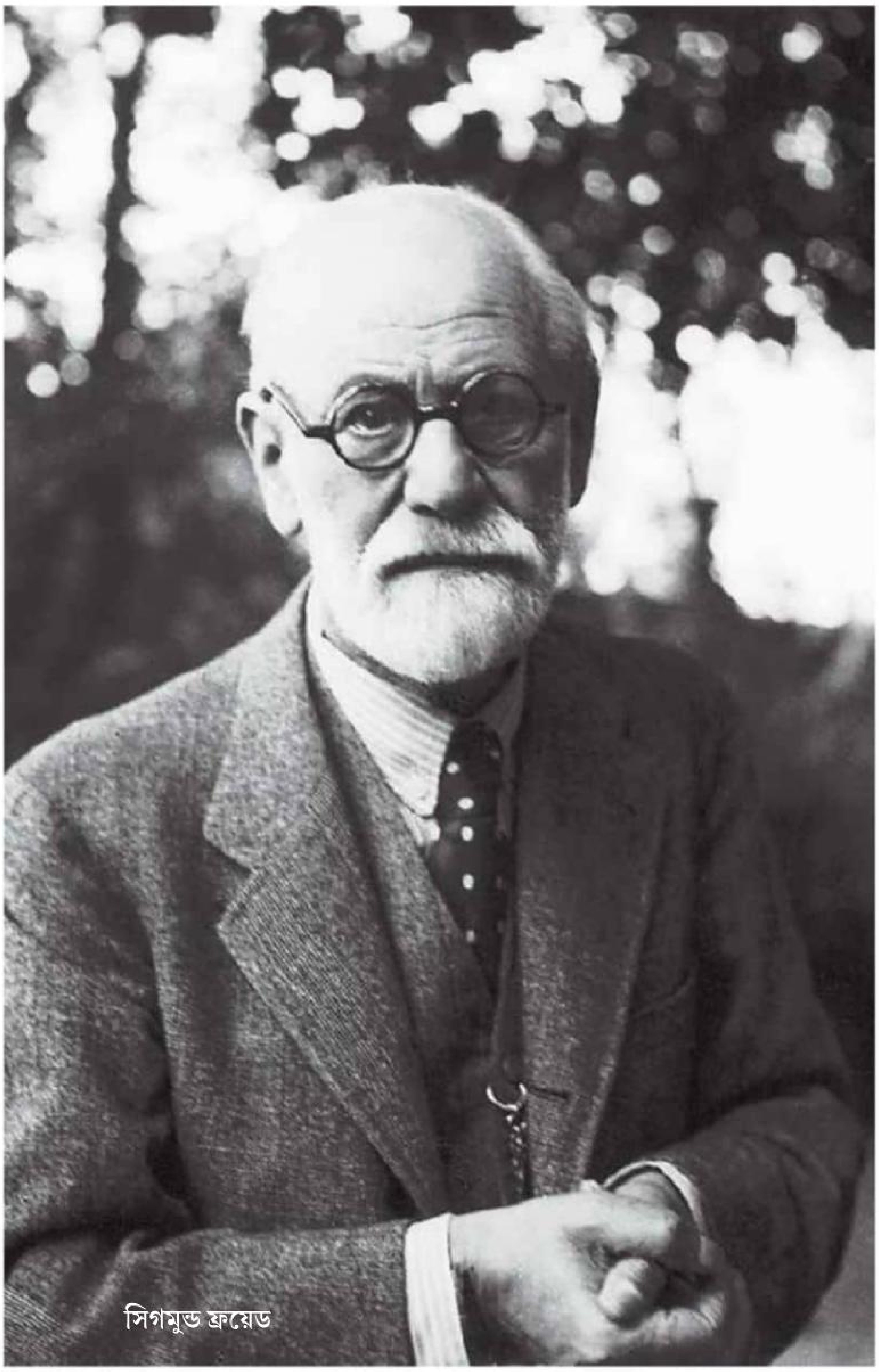
অতএব, বার্দোকে আলাদা করো, ওঁকে ছলনাময়ী বলো, প্রতারক বলো। ওঁকে সমাজের বাইরে রাখো। না-রাখলে বিপদ। বার্দো এক থ্রেট। ফাঁদ। ওঁর কোনও সরলতা নেই। বার্দো কারওর মা হতে পারেন না, কন্যা হতে পারেন না, স্ত্রী হতে পারেন না, প্রেমিকাও হতে পারেন না। বার্দো কেবল পতিত করতে পারেন পুরুষকে। দ্য বোভোয়া লিখছেন, 'the male feels uncomfortable if, instead of a doll of flesh and blood, he holds in his arms a conscious being who is sizing him up. A free woman is the very contrary of a light woman.'

বার্দো ফ্রি উওম্যান, মুক্ত এক নারী, হলেন কী করে? তিনি যা, তা হয়েই। আসলে, তাঁর অসম্ভব সততাই তাঁকে অসহনীয় করে তুলল। তিনি যেভাবে যা চান, তা করেন। যেভাবে যা-কিছু দেখতে চান, তা দেখেন— 'শি ডাজ় অ্যাজ় শি প্লিজ়েজ়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ় হোয়াট ইজ় ডিস্টার্বিং'। ছলনাহীন হয়েই বার্দো ছলনাময়ী হয়ে উঠলেন। পুরুষরা তাঁকে চাইছেন বাহুর অর্গলে, প্রবেশ করতে চাইছেন তাঁর শরীরে কিন্তু তাঁকে নিজেদের সামাজিক বৃত্তে স্থাপন করতে অস্বীকার করছেন। ভীষণ ভয় পাচ্ছেন।

সিমন দ্য বোভোয়া তাঁর *দ্য সেকেন্ড সেক্স*-এ লিখেছিলেন যে, নারীকে তার মুক্তির জন্য পরিশ্রম করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। যেখানে সকলেই তাঁকে 'ভ্যাম্প' অভিধা দিতে সক্রিয়, সেখানে বার্দো-র ওই সৎ থাকাটাই ছিল তাঁর সেই পরিশ্রম— 'শি ফলোজ় হার ইনক্লিনেশন্স'। বোধ হয় এই কারণেই একসময় মেরি উওলস্টোনক্রাফ্টকে সমাজ বলেছিল 'হাইনা ইন পেটিকোটস', তাঁর একাধিক সম্পর্ক, অবৈধ সন্তান ও পরে উইলিয়ম গডউইনের সঙ্গে বিবাহ ও গর্ভবতী হওয়ার (গডউইন-মেরির কন্যাই মেরি শেলি, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন-এর লেখক ও কবি পার্সি বিশ শেলির স্ত্রী) ঘটনাকে মাথায় রেখে। আশ্চর্যের নয় যে, এই মেরি উওলস্টোনক্রাফ্ট-ই আদি নারীবাদীদের অন্যতম, *আ ভিন্ডিকেশন অফ দ্য রাইটস অফ উওম্যান*-এর (১৭৯২) কালজয়ী রচনাকার।

সিমন দ্য বোভোয়া তাঁর *দ্য সেকেন্ড সেক্স*-এ লিখেছিলেন যে, নারীকে তার মুক্তির জন্য পরিশ্রম করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে।

'Was will das Weib?'— একজন নারী কী চায়, মারি বোনাপার্টকে লিখেছিলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড। নাৎসি জার্মানি থেকে ফ্রয়েডের নিষ্ক্রমণে সাহায্য করেছিলেন ফরাসি মনস্তাত্ত্বিক বোনাপার্ট। একসময় ফ্রয়েডের কাছে চিকিৎসাপ্রার্থীও ছিলেন তিনি, পরে হয়েছিলেন একান্ত ফ্রয়েড-ঘনিষ্ঠ। তাঁকেই ফ্রয়েড লিখেছিলেন, "The great question that has


সিগমুন্ড ফ্রয়েড

never been answered and which I have not yet been able to answer, despite my thirty years of research into the feminine soul, is 'What does a woman want?'"
ফ্রয়েডের অন্যতম জীবনীকার আর্নেস্ট জোনস তথ্যটি দিয়েছিলেন তাঁর *লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অফ সিগমুন্ড ফ্রয়েড* গ্রন্থে, কিন্তু প্রেক্ষিত বিশদ করেননি। শুধু লিখেছিলেন যে, পুরুষের চেয়ে নারীর মনস্তত্ত্ব ছিল ফ্রয়েডের কাছে 'মোর ইনিগম্যাটিক'। ফ্রয়েড যেভাবে নারীর মুক্তি দেখতেন তা সম্পূর্ণতই যৌন-ভাবনার স্তর থেকে— নারীর 'পুরুষাঙ্গ' নেই, হয় না, এটিই নারীর যাবতীয় 'কমপ্লেক্স'-এর উৎস। ফ্রয়েড এ-কারণেই বহু-সমালোচিত, তাঁর জীবিতাবস্থায়, মরণোত্তর কালেও। তবে, উপরে উক্ত মারি বোনাপার্টকে লিখিত অংশটি থেকে স্পষ্ট যে, মানবমন নিয়ে তাঁর বৈপ্লবিক মনন-দর্শন সত্ত্বেও, পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব থেকে পুরোটা বেরিয়ে যেতে পারেননি ফ্রয়েড, অন্তত নারী-বিষয়ক ধ্যানধারণায়। এই মুহূর্তে, আলোচনার স্বার্থেই, যদি ফ্রয়েড-এর প্রশ্নের মুখোমুখি রাখি সিমন দ্য বোভোয়াকে, তা হলে দেখব, দ্য বোভোয়া-র হয়তো কোনও উত্তেজনাই থাকবে না নারী কী চায়, তা জানার জন্য। কারণ দ্য বোভোয়া জানেন, একজন নারীর কোনও দাবি নেই— 'She has no demands to make; she is no more conscious of her rights than she is of her duties...Good and evil are part of conventions to which she would not even think of bowing.' কথাগুলি ব্রিজিত বার্দো-র উদ্দেশেই লিখেছিলেন দ্য বোভোয়া, কিন্তু তা ব্যক্তি-জাতি অতিক্রম করে নিমেষেই সর্বজনীন হয়ে ওঠে। সন্দেহ নেই, ফ্রয়েড বিরক্ত হয়েই প্রশ্নটি করেছিলেন— একজন নারী চায়টা কী। অর্থাৎ, 'ওয়ান্ট'। একটি বা কিছু চাহিদার প্রয়োজনীয়তা আছে যেন সবসময়। দ্য বোভোয়া বলতে চেয়েছিলেন, চাওয়ার কিছু নেই, একজন নারী যেমন, তার তেমন 'থাকা'র প্রস্তাবটিই শুধু আছে। সেখানে যা-কিছু শর্ত তা যত না নারীর নিজস্ব, তার চেয়ে অনেক বেশি পুরুষের দ্বারা ভাবিত, নির্মিত ও আরোপিত। কিন্তু একজন নারীর কাছে এই 'থাকা'টাই তার হয়ে ওঠা। এবং এই থাকার জন্য একটি স্বাধীন মুক্ত পরিসর প্রয়োজন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ যাকে বলেছিলেন 'আ রুম অফ ওয়ানস ওন'। নিজস্ব এক ঘর। এই ঘর যেমন বাইরের হতে পারে, তা হতে পারে অন্তরের, মনেরও। *মিসেস ড্যালোওয়ে* (১৯২৫) উপন্যাসে উল্‌ফ তাঁর চরিত্র ক্ল্যারিসা ড্যালোওয়ের জীবনের যে-কিছুক্ষণের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন, তা ওই পরিসর তৈরি করে নেওয়ারই এক প্রচেষ্টা। বাহ্যিক, পার্থিব জীবনের সমান্তরালে মনপরিভ্রমণে রত মিসেস ড্যালোওয়ে। মনের ভিতরে আর কারও প্রবেশ নেই। সেখানে ভ্রমণের গতি


ডরিস লেসিং

কখনও ধীর, কখনও বিস্তৃত, কখনও দ্রুত।
উল্‌ফ-এর এই উপন্যাসের কুড়ি বছর আগে একজন বাঙালি লেখক, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একটি অদ্ভুত আখ্যান রচনা করেছিলেন ইংরেজি ভাষায়— 'সুলতানাজ় ড্রিম' (১৯০৫)। সেখানে দেখা যায়, কাহিনিকার সুলতানা বসে আছেন তাঁর বেডরুমের ইজ়ি চেয়ারে। তখন সন্ধেবেলা, চাঁদের আলোয়, হীরকখণ্ডের মতো তারায় আকাশ ভরে আছে। কাহিনিকারের স্মরণে আসে না তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে



ভার্জিনিয়া উল্ফ



শার্লট পারকিন্স গিলম্যান



রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

পুরুষহীন এক পরিসরের কথা ভেবেছেন অনেক নারী, যেখানে তাঁদের ‘থাকা’টা হবে নির্বিঘ্ন, সরল। মুক্তির আবহ সেখানেই।

পড়েছিলেন কিনা। হঠাৎই, তাঁর সামনে উদয় হন একজন নারীমূর্তি। কাহিনিকার আগত নারীটিকে তাঁর বন্ধু সিস্টার সারা ভেবে বসেন। সেই নামে সম্বোধনও করেন আগন্তুককে, সাড়াও পান। এরপর সিস্টার সারার আহ্বানেই কাহিনিকার বেরিয়ে পড়েন একটি বাগান ভ্রমণে। খানিক পরেই তাঁর অন্যরকম বোধ হতে থাকে— এখানে কোথাও কোনও পুরুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না যে! সিস্টার সারা তখন তাঁকে জানায় যে, এখানে কোনও পুরুষের অস্তিত্বই নেই, এ হল ‘লেডিল্যান্ড’। এখানকার শাসন-প্রশাসনে নারী, দৃশ্যমান সকল নাগরিকই নারী, সকল পুরুষ গৃহবন্দি, পর্দার আড়ালে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন-এর এই অবাক-করা স্বতন্ত্র নারীভূমির স্বপ্ন-ভাবনার বিস্ময়কর অনুরণন মেলে আমেরিকান লেখক শার্লট পারকিন্স গিলম্যান-এর *হারল্যান্ড* (১৯১৫) উপন্যাসে। *হারল্যান্ড* এমন এক ভূখণ্ডের কাহিনি বলে যা শুধুমাত্র নারী-অধ্যুষিত, দু’হাজার বছর ধরে যেখানে প্রজনন হয় যৌনসংসর্গ ব্যতীত— পার্থেনোজেনেসিসের মাধ্যমে। জন্ম নেয় কন্যাসন্তানই। গিলম্যানের কল্পনা আসলে বিকল্প এক সত্যের দর্শন। অবশ্যই তা এক ইউটোপিয়া, কিন্তু একইসঙ্গে তা আত্মমুক্তির এক প্রদেশও।

গিলম্যানের *হারল্যান্ড*-এর উত্তরাধিকার বহন করছে ডরিস লেসিং-এর অন্তিম উপন্যাস *দ্য ক্লেফ্ট* (২০০৭)। এ-উপন্যাসে লেসিং বিকল্প এক ইতিহাসের পট রচনা করেছেন। বলেছেন মানবজাতির প্রাচীন এক সময়ের, আদিতম সময়ের কাহিনি যখন কেবলমাত্র নারীরাই ছিল, তারা প্রজনন করত যৌনসংসর্গ ছাড়াই, অ্যাসেক্সুয়ালি। নিজেদের তারা বলত, ক্লেফ্ট— পাথরে এক চিড়, যার রূপ অনেকটা যোনির মতো।

ডরিস লেসিং ছিলেন আবেগতাড়না-রহিত এক নারীবাদী, তাঁর কাছে নারীর মুক্তির অর্থ যে সদা ইতিবাচক তা নয়, তা হতাশারও হতে পারে। একাকিত্বের মধ্যেও তাই খুঁজে নিতে হয় বৃহতের ইশারা, নিজের মধ্যে অনেকের অস্তিত্ব। এককের মধ্যে একাধিক। লেসিং-এর *দ্য গোল্ডেন নোটবুক* (১৯৬২)-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র অ্যানা উল্ফ বলে, নিজেকে নিয়ে লেখার মানে অন্য অনেকজনকে নিয়ে লেখা। কারণ তোমার সঙ্কট, তোমার যন্ত্রণা, তোমার বাসনা-কামনা, তোমার অনুভব-আবেগ, এ কেবল তোমার একার হতে পারে না। অ্যানা একটি খেলা খেলত। খেলার নাম সে নিজেই দিয়েছিল, ‘দ্য গেম’। কী সে খেলা— প্রথমে যে-ঘরে সে বসে আছে, সেই ঘরের এক পুনর্নির্মাণ করত মনের মধ্যে, বিছানা, চেয়ার, পর্দা-সহ সমস্ত আসবাব ধরে ধরে, তাদের নামকরণ করে। তারপর বেরিয়ে যেত ঘর থেকে, তৈরি করত বাড়ি, তারপর বাড়ি ছেড়ে চলে আসত রাস্তায়, তৈরি হত রাস্তা, তারপর উপরে উঠতে শুরু করত সে। আস্তে-আস্তে তৈরি করত বিশ্ব, মহাদেশ ধরে ধরে, মহাসাগর ধরে ধরে। তারপর যাত্রা করত মহাশূন্যে, সেখান থেকে দেখত পৃথিবীকে, সূর্যদীপ্ত সে গ্রহ, ঘুরছে তার নীচে। সঙ্গত কারণেই *দ্য গোল্ডেন নোটবুক* পেয়েছে ‘ফেমিনিস্ট বাইবেল’-এর তকমা।

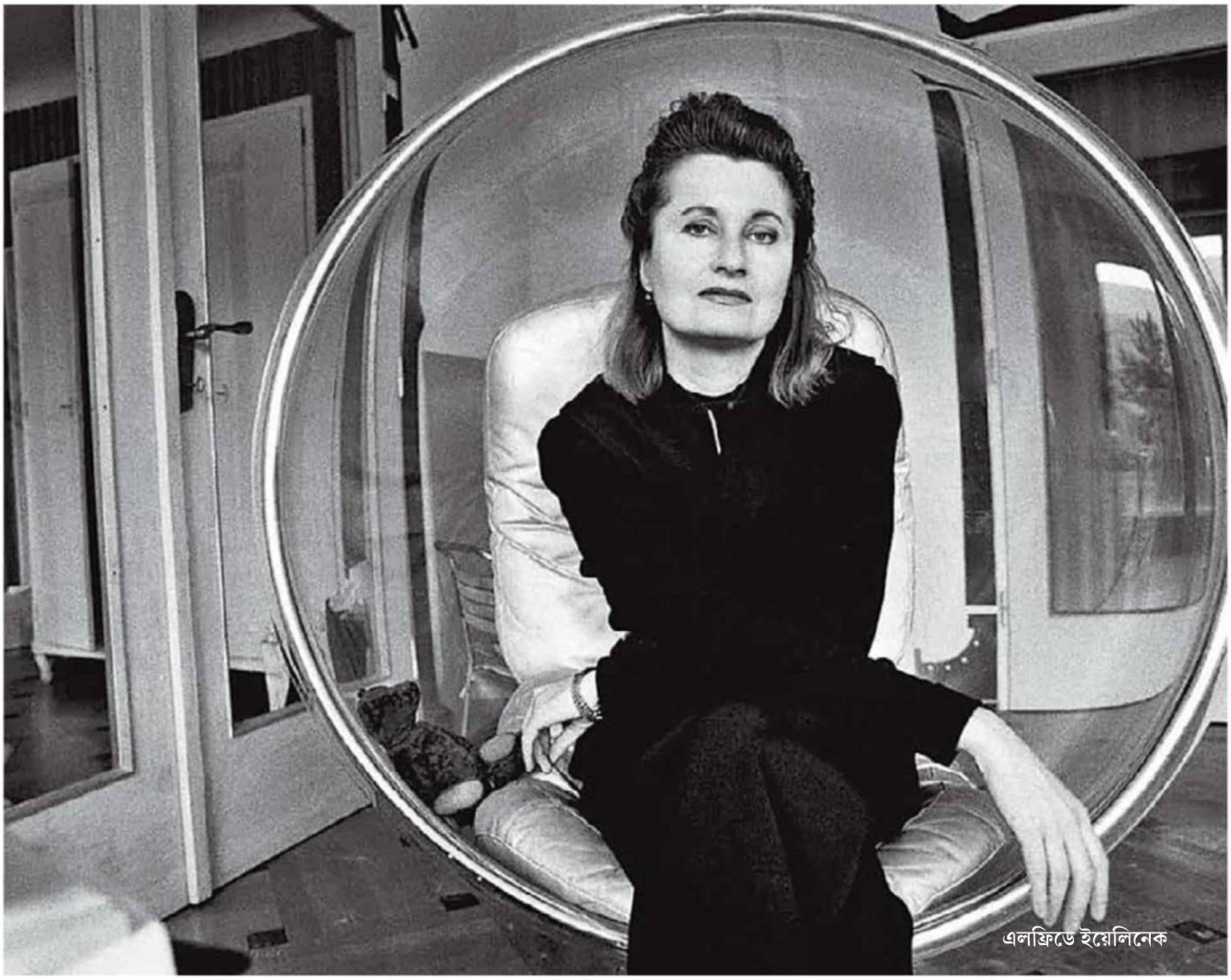
পুরুষহীন এক পরিসরের কথা ভেবেছেন অনেক নারী, যেখানে তাঁদের ‘থাকা’টা হবে নির্বিঘ্ন, সরল। মুক্তির আবহ খুঁজেছেন সেখানেই। এর উল্টোদিকে আছে পুরুষ-শাসিত সমাজের ভিতরই মুক্তির সন্ধান। কখনও-কখনও এই দ্বিতীয় সন্ধানের পথ হয়ে উঠেছে বিষণ্ণ, বিষাদময়, ঝরেছে রক্ত। টোনি মরিসন-এর *বিলাভেড* (১৯৮৭) উপন্যাসে কৃষ্ণাঙ্গ নারী সেথ যখন নিজের কন্যাকে দাসপ্রথা থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় হিসেবে হত্যাই করে কন্যাটিকে, তা তখন অসহায়তা থাকে না আর, তা হয়ে দাঁড়ায় শোষণ-পীড়ন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর এক প্রতিবাদ। হারানোর সমস্ত ভয় উপেক্ষা করে প্রতিরোধ। *বিলাভেড*-এর এক দশক আগেও তা দেখিয়েছিল মহাশ্বেতা দেবীর দ্রৌপদী মেঝেন—

‘চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্—?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।’ (‘দ্রৌপদী’, *অগ্নিগর্ভ*, ১৯৭৮)

আর-একদিক দেখিয়েছিলেন এলফ্রিডে ইয়েলিনেক। তাঁর *দ্য পিয়ানো টিচার* (১৯৮৩) উপন্যাসে আসলে আত্মজীবনীরই একটি ছদ্ম-নকশা এঁকেছিলেন ইয়েলিনেক। নিজের পরিবর্ত হিসেবে তৈরি করেছিলেন এরিকা কোহাট নামের পিয়ানো শিক্ষকের চরিত্র। এরিকার জীবন শাসিত মায়ের নজরদারিতে। এরিকার অবদমিত ইচ্ছেরা রূপ নেয় বীভৎস যৌনতায়, আত্ম-আঘাতে। সেল্ফ মিউটিলেশনে। ব্লেড দিয়ে নিজের যোনি কেটে যৌনসুখ অনুভব করতে চায় এরিকা। পর্নোগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হয়। নিজের এক ছাত্রের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হয়। এরিকাই সে-সম্পর্কে চালকের আসনে, শাসকের ভূমিকায়। এটিই তার মুক্তি মাতৃ-শাসন থেকে, অভিভাবকের নজরদারি থেকে। স্যাডো-ম্যাসোকিজ়মের যৌথ ঘেরাটোপে আত্মমুক্তির অলজ্জ এবং দাম্ভিক এক অনুসন্ধানী ইয়েলিনেক। বহু-ধিক্কৃতও তিনি সে-কারণে।

ব্রিজিত বার্দো-র আবরণহীন সততাকে যেমন ভয় পেত শিক্ষিত পুরুষসমাজ, দ্রৌপদীর বিবস্ত্র আগ্রাসনকেও সেই



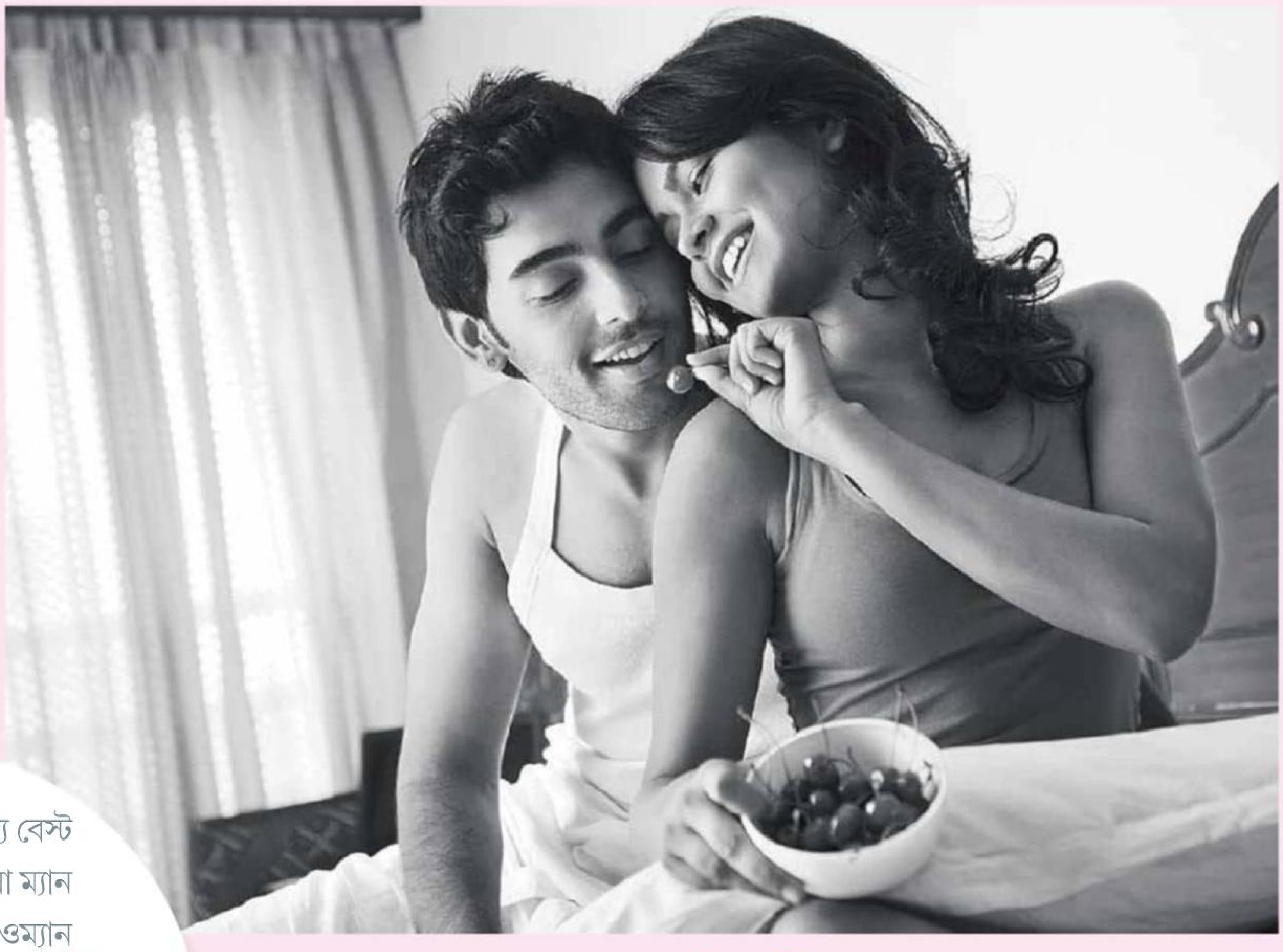
এলফ্রিডে ইয়েলিনেক

একই ভয়। এরিকার আত্ম-আঘাতেও চোখ ফিরিয়ে নিতে চায় সে-পুরুষ। ভয়েই। নারীর মুক্তি তো এখানেও, এই ভয় পাওয়ানো, ভয় দেখানোতেও। নির্ভীক উচ্চারণে তাই অ্যান সেক্সটন বলতে পেরেছিলেন— ‘I have ridden in your cart, driver,/ waved my nude arms at villages going by,/ learning the last bright routes, survivor/ where your flames still bite my thigh/ and my ribs crack where your wheels wind./ A woman like that is not ashamed to die./ I have been her kind.’



জার্মেন গ্রিয়ার-এর *দ্য ফিমেল ইউনাখ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে। আজ, নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধানতম টেক্সট গ্রিয়ারের বইটি। আইকনিক এই রচনায় গ্রিয়ার বলেছিলেন যে, পুরুষকৃত স্টিরিয়োটাইপিংয়ের ফলে নারী হারিয়েছে তার লিঙ্গ। নারীমুক্তি ঘটবে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে, নারীত্বের গৃহীত-প্রচলিত প্রথাগুলি ভেঙে, ব্রা পুড়িয়ে নয়। গ্রিয়ারের মতে, ব্রা হাস্যকর এক উদ্ভাবন হলেও তা না-পরাটা আর-এক দমনের অধীনস্থ হওয়া। *দ্য ফিমেল ইউনাখ*-এর একুশতম সংস্করণের মুখবন্ধে গ্রিয়ার লিখেছিলেন, নারীর যে-স্বাধীন, যে-মুক্ত অস্তিত্বের আর্তি তিনি জানিয়ে এসেছেন সবসময়, তা হল ‘freedom to be a person, with the dignity, integrity, nobility, passion, pride that constitute personhood. Freedom to run, shout, to talk loudly and sit with your knees apart. Freedom to know and love the earth and all that swims, lies and crawls upon it. Freedom to learn and freedom to teach. Freedom from fear, freedom from hunger, freedom of speech and freedom of belief.’ কোনও চাওয়া নয়। একজন নারীর একজন নারী হয়ে থাকা, থাকতে পারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের বিরক্তিমাখা প্রশ্নের উত্তর গ্রিয়ারের শব্দে-শব্দে প্রতিধ্বনিত।

ঋণ: সিমন দ্য বোভোয়া, আর্নেস্ট জোনস, ডরিস লেসিং, জার্মেন গ্রিয়ার, লুসি ডেলাপ এবং লারা ফাইগেল।



কথায় বলে, দ্য বেস্ট অ্যাফ্রোডিসিয়াক আ ম্যান ক্যান হ্যাভ ইজ় আ ওম্যান হু ক্যান টার্ন হিম অন অ্যান্ড ইন টার্ন গেট টার্নড অন বাই হিম। সত্যিই কি তাই? নাকি ওষুধের কার্যকারিতা বেশি? জেনে নিন।

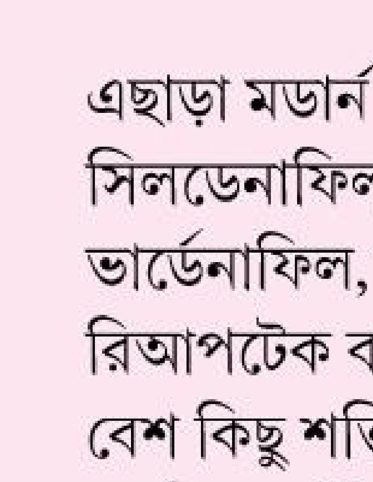
অ্যাফ্রোডিসিয়াক

সম্প্রতি কাগজে একটি খবর চোখ পড়ল। ব্লার্বে বড় বড় ছাপার হরফে লেখা, 'ইন্ডিয়ান টাইগারস ইন চাইনিজ় সুপ'। প্রতিবেদনের মধ্যে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার প্রথম সারির এক পরিবেশ সংরক্ষক তথা বৈজ্ঞানিক বলেছেন, বিগত কয়েক বছরে যত সংখ্যক বাঘ শিকার এবং পাচার করা হয়েছে, তার ৭১ শতাংশই পুরুষ। কারণ চিন প্রদেশের মানুষরা মনে করেন, বাঘের শিশ্নাঙ্গ দিয়ে তৈরি সুপ নাকি পুরুষদের লিবিডো বাড়াতে সক্ষম। ফলে চিনা মার্কেটে এই অঙ্গের চাহিদা বাড়ছে।

এই একই কারণে প্যাঙ্গোলিন, স্টার টরটয়েজ়, জলহস্তির মতো একাধিক পশুর শিকার এবং অঙ্গ পাচার এখন এত বেড়ে গিয়েছে যে, তারাও আজ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

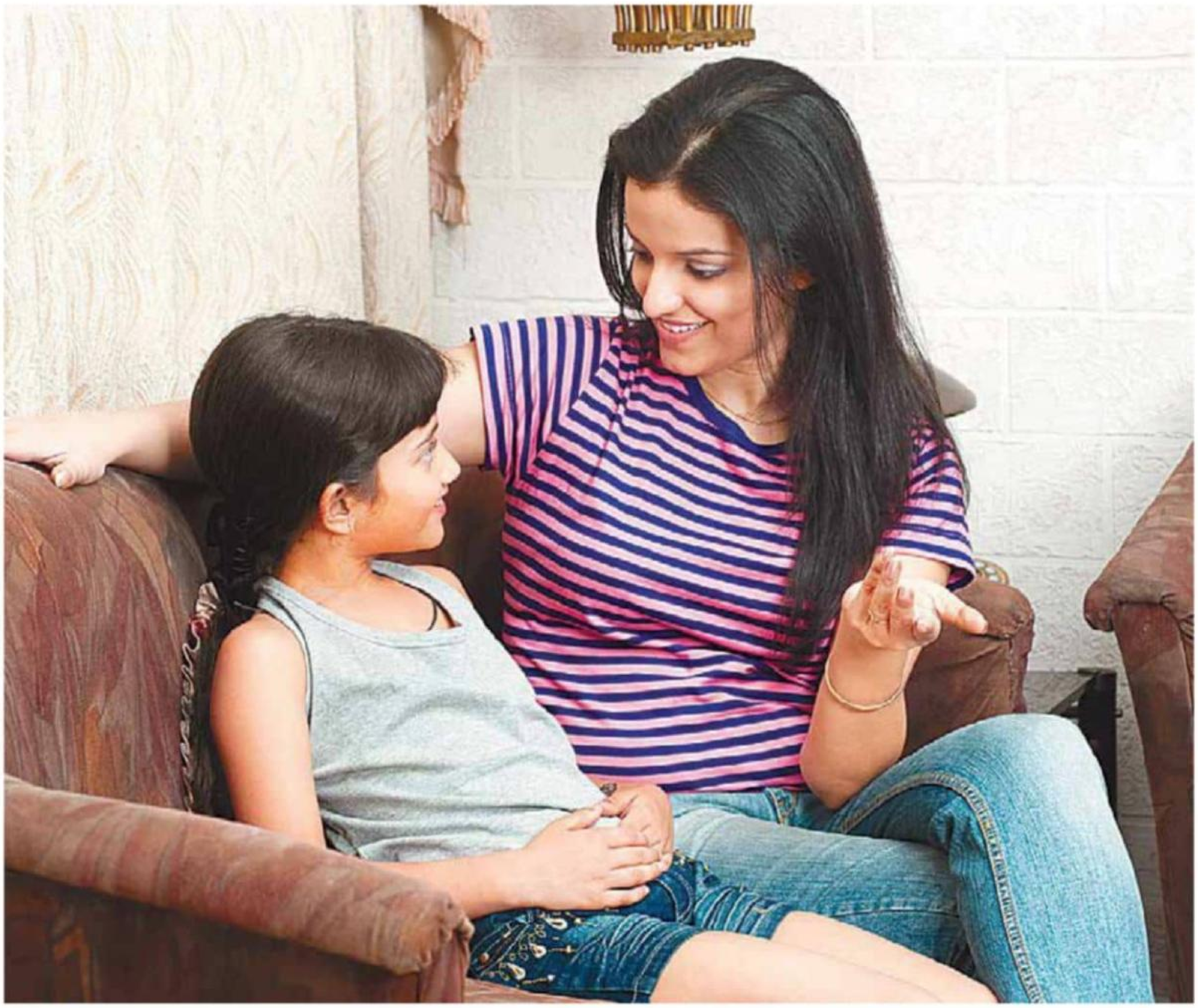
সময়ের শুরু থেকেই মানুষ সেই মহৌষধির খোঁজে ছুটছে, যা তাঁর যৌন ক্ষমতা বাড়াবে। অ্যাফ্রোডিসিয়াকের নাম সকলেই শুনে থাকবেন। এই বস্তুর জনপ্রিয়তা মূলত যৌন উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্যই। গ্রিকদের ভালবাসার দেবী অ্যাফ্রোডাইটের নামানুসারে একে অ্যাফ্রোডিসিয়াক বলা হয়। এটি শরীরে যৌন চাহিদা এবং পরিতৃপ্তির মাত্রা বৃদ্ধি করে সেক্সুয়াল পারফর্ম্যান্স বাড়াতে সাহায্য করে। অ্যাফ্রোডিসিয়াক অনেক ধরনের হতে পারে— খাবার, হার্বস, পোশন বা ওষুধ। প্রাচীনকালে লোকৌষধি এবং আয়ুর্বেদেই এর উল্লেখ পাওয়া গেলেও বর্তমানে মডার্ন মেডিসিনও অ্যাফ্রোডিসিয়াক নিয়ে গবেষণা করছে। পরিচিত অ্যাফ্রোডিসিয়াকগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। অ্যাক্টিভেটরস, রিজুভিনেটরস, সাস্টেনেটরস এবং অ্যাম্প্লিফায়ারস। অ্যাক্টিভেটর বলতে মূলত বোঝানো হয় কোনও লাভ পোশন বা স্পেলকে, রিজুভিনেটর হল যৌবনের অমৃত, সাস্টেনেটর যৌন ক্ষমতা বাড়ানোর কনককশন এবং অ্যাম্প্লিফায়ার হল যৌন উদ্দীপনাবর্ধক। বাজারে যে সব অ্যাফ্রোডিসিয়াক পাওয়া যায়, বেশিরভাগই হল রিজুভিনেটরস।

এছাড়া মডার্ন মেডিসিনের দাক্ষিণ্যে এখন সিলডেনাফিল সাইট্রেট, ট্যাডালাফিল, ভার্ডেনাফিল, সিলেক্টিভ সেরোটনিন রিআপটেক বা অ্যাপোমরফিনের মতো বেশ কিছু শক্তিশালী অ্যাফ্রোডিসিয়াকের ফর্মুলা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জেনে রাখা ভাল, এই ড্রাগগুলি কিন্তু সব সমস্যায় কার্যকরী নয়। এগুলোর অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনওভাবেই এগুলো নেওয়া উচিত নয়। অ্যাফ্রোডিসিয়াক যতই কার্যকরী হোক, রোম্যান্টিক ক্যান্ডল লাইট ডিনার, হালকা মিউজ়িক, শান্ত সুবাসিত পরিবেশ, সঙ্গীর শরীরে আলতো স্পর্শ ইত্যাদির কার্যকারিতার কাছে সে সবসময় হার মানতে বাধ্য। তাই অ্যাফ্রোডিসিয়াক খুঁজতে হলে সঙ্গীর মধ্যে খুঁজুন, কোনও ওষুধে নয়।



ডা. ডি নারায়ণ রেড্ডি

যোগাযোগ:
deganr@gmail.com
degainstitute@gmail.com



জীবনশিক্ষার অন্যতম জরুরি অঙ্গ হল সময়ের মূল্য বোঝা। সন্তানকে সেই শিক্ষা দিন ছোট থেকেই।

সময়ের মূল্য বোঝান



ছোটবেলায় আমাদের অনেকের বাবা-মায়েরাই একটা কথা সব সময় বলতেন, 'সময় চলিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়/ যে জন বোঝে না তারে, ধিক শত ধিক'। তখন বিরক্ত লাগত হয়তো, কিন্তু পরে আমরা সকলেই কথাটার মূল্য বুঝেছি। পড়াশোনার সময় জীবনে শুধু পড়াশোনা এবং হয়তো বা এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির চাপই ছিল। কিন্তু এখনকার কথা ভাবুন তো? সকালে উঠে চা-জলখাবারের আয়োজন করতে করতেই অফিসের টু-ডু লিস্টটা মাথার মধ্যে ছকে নেওয়া, প্রেজ়েন্টেশন বানাতে বানাতে দুপুরে-রাতে কী রান্না হবে তার প্ল্যানিং করা, অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই বাচ্চাদের পড়াশোনা দেখা— মনে হয় না, দিনটা আটচল্লিশ ঘণ্টার হত যদি! তার মধ্যে পরিবার, বন্ধুবান্ধব সকলকে সময় দেওয়া, প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সময় কাটানো এবং মি-টাইম বের করা... সময়ের কাজ সময়ে করতে না জানলে কি এত কিছু চব্বিশ ঘণ্টায় করে উঠতে পারতেন? এই প্রতিটি কাজই কিন্তু রোজকার জীবনের একদম, যাকে বলে 'বেসিক' কাজ— বিশাল অতিরিক্ত কিছু করছেন না আপনি। আপনার সন্তানকেও সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে, আনন্দে বেঁচে থাকতে গেলে এই প্রতিটি কাজেই মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করে ফেলতেই হবে। তা হলেই ভেবে দেখুন, সময়ের দাম না বুঝলে, টাইম-ম্যানেজমেন্ট করতে না শিখলে সে টিকে থাকবে কী করে? অতএব সন্তানকে সময়ের মূল্য বোঝানোর কাজটা আপনাদেরই দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে।

● শিক্ষার গোড়াপত্তন করুন নিজের রোজকার জীবন দিয়েই। এই যে কাজগুলোর কথা প্রথমেই বলছিলাম, এগুলো আপনাকে রোজ তুখড়ভাবে করতে তো আপনার সন্তান দেখছেই! ওকে বুঝিয়ে বলুন যে আপনি এতগুলো কাজ করতে পারেন কারণ সময়কে আপনি হেলায় নষ্ট করেন না। যে কাজ করার যেটা সময়, তখন সেটাই করেন। আলস্য করে সময় কাটান না। সে জন্যই আপনি নিজের পছন্দমতো কাজ করারও সময় পান। সেই সময়ে আপনি বই পড়া, গান শোনা, সিরিজ় দেখা, শপিং করা, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো— সব করতে পারেন। কিন্তু তার জন্য কাজের সময় কাজ করতে হয়। না হলে শেষ মুহূর্তে এত কাজ মাথার উপর চাপবে, যে দুটো মিনিটও নিশ্বাস নেওয়ার জন্য পাওয়া যাবে না।

● সময়ের কাজ সময়ে করতে শেখানোর খুব ভাল উপায় হল, কাজের রুটিন তৈরি করে দেওয়া। পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক রুটিন— কখন কোন বিষয়টা পড়বে, পড়া এবং লেখার জন্য

কতটা করে সময় বরাদ্দ রাখবে, রিভিশনের জন্যই বা কতটা সময় দেবে— এসব ব্যাপারে আপনারা প্রথমদিকে কিছুটা গাইড করুন। কোনও বিষয়ের উপর জোর যেন কম না পড়ে, নজর রাখুন সেদিকে। মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিন সব বিষয়েরই। কিন্তু পড়াশোনা বা পরীক্ষা নেওয়া— কোনও ব্যাপারটাকেই ভীতিজনক করে তুলবেন না। বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলুন, সব বিষয়ের জন্য দরকারমতো সময় দিলে ও সব বিষয়েই এগিয়ে যাবে।

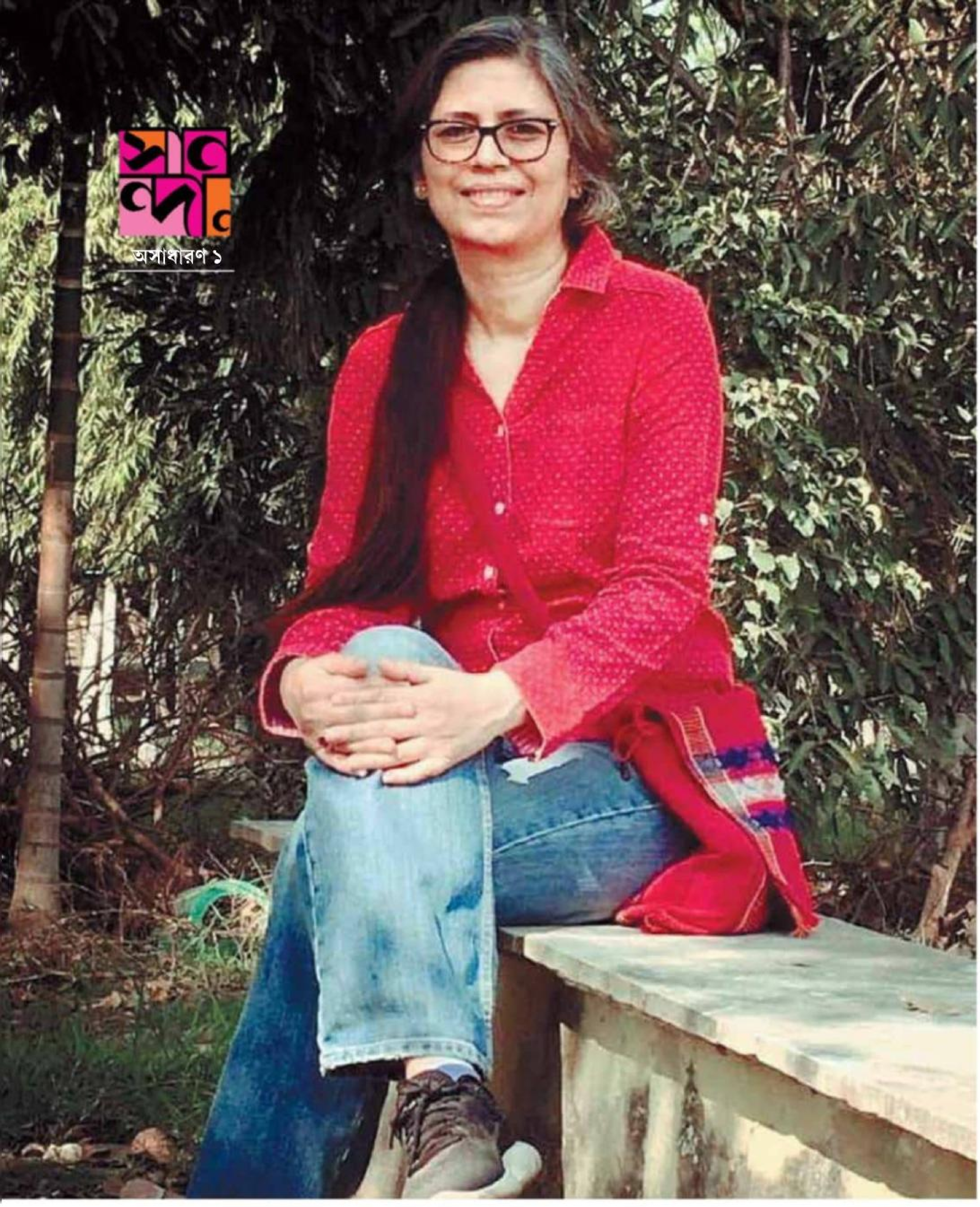
- শুধু পুঁথিগত পড়া নয়, তার বাইরেও যে সব বিষয়ের উপর ওর ঝোঁক রয়েছে— লেখালেখি হোক, পিয়ানো বাজানো হোক বা খেলাধুলো— সে সব কাজেরও সময় নির্দিষ্ট করে দিন। উৎসাহ দিন, সময়মতোই সেই কাজগুলোও করতে। বুঝিয়ে বলুন যে তাহলে সারাদিনে অনেক কাজ ভালভাবে সেরে ফেলতে পারবে ওরা। টাইম ম্যানেজমেন্টের ফলাফল যদি একবার টের পেয়ে যায়, নিজেরাই সময় বের করে নেবে।
- পড়াশোনা এবং এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটির বাইরের সময়ে যদি নিজের এবং বাড়ির প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে শেখে ওরা, তাহলে তো কথাই নেই! বিশাল কিছু করতে হবে না। ধরুন, স্কুল থেকে ফিরেই ফোন হাতে শুয়ে না পড়ে, জামাকাপড় ছেড়ে কাচতে দিয়ে দিল। ব্যাগ থেকে বইখাতা বের করে গুছিয়ে রাখল। বুঝিয়ে বলুন যে এতে ওরই জামাকাপড় সময়ে কেচে তৈরি হয়ে যাবে, পরে খুঁজতে হবে না। বই বের করতে গিয়ে পড়াশোনার খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে না। আবার খেয়ে উঠে যদি সঙ্গে সঙ্গে বাসনগুলো তুলে ফেলে টেবল থেকে, তাহলে টেবলটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বা সোফায় শুয়ে টিভি দেখার পর উঠে যদি কুশনগুলোকে একটু সাজিয়ে দেয়, সোফাটা সুন্দর দেখাবে। এইরকম ছোট ছোট কাজ যদি সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলতে শেখে ওরা, তাহলে নিজেরাই বুঝবে সারাদিনে কত কাজ সেরে ফেলা যায়!
- আর একটা জিনিস মাথায় রাখুন। বাচ্চাদের সময়ের মূল্য বোঝানো মানে কিন্তু তাদের দিয়ে সারাদিন শুধু পড়াশোনা, গানবাজনা, ছবি আঁকা, ক্যারাটে ক্লাস করিয়ে যাওয়া নয়। কাজের বাইরে একটু নিজের মতো সময় কাটানোর প্রয়োজন শুধু আপনারই রয়েছে কারণ আপনি কাজ করেন, ছোটবেলায় ও সবের প্রয়োজন নেই— এ রকম ভাবলে কিন্তু বাচ্চারই সর্বনাশ করবেন। ছোট থেকেই ইঁদুরদৌড়ে ছুটতে ছুটতে যন্ত্রমানবে পরিণত হোক আপনার সন্তান, চান না নিশ্চয়ই? ওদের কিছুটা সময় নিজের ইচ্ছেমতোও কাটাতে দিন। আর সেই সময় ওদের জোর করে গ্যাজেট থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করলে খুব একটা লাভ হবে না। কারণ এখনকার বাচ্চারা ই-জেনারেশনের অন্তর্গত। ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ তাদের জীবনের অঙ্গ। বরং ওদের উৎসাহ দিন, এ সব ব্যবহারের পাশাপাশি যেন বই পড়ে, বাগান করে, মানুষের সঙ্গে মেশে। যেন ভাল মানুষ তৈরি হয়।







ধরুন, স্কুল থেকে ফিরেই জামাকাপড় ছেড়ে কাচতে দিয়ে দিল। ব্যাগ থেকে বইখাতা বের করে গুছিয়ে রাখল। বুঝিয়ে বলুন যে এতে ওরই জামাকাপড় সময়ে কেচে তৈরি হয়ে যাবে, পরে খুঁজতে হবে না। বই বের করতে গিয়ে পড়াশোনার খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে না।



তিনি? উত্তরে জানালেন, "সাহিত্য এবং আঁকায় আমি বরাবর ভাল ছিলাম। অন্য ভাললাগার বিষয় ছিল অঙ্ক। সবসময় চাইতাম এমন কোনও পেশায় যেতে, যেখানে এই তিনটে বিষয়কে একসঙ্গে উপভোগ করতে পারব। কিছুদিন সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। তারপর অর্থনীতি নিয়ে ভর্তি হলাম পুণের গোখলে ইনস্টিটিউট অফ পলিটিক্স অ্যান্ড ইকোনমিক্স-এ। একবার ক্যাম্পাসে কামুর একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলাম। সবাই প্রশংসা করেছিলেন। আমার যদিও তখন পরিকল্পনা ছিল দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে মাস্টার্স করে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে ডক্টরেট করার। কিন্তু দৈব আমায় নিয়ে গেল অন্য পথে। গোখলে ইনস্টিটিউট থেকে সাইকেল দূরত্বে ছিল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। আমার এক বন্ধু সেখানে পড়ত। সন্ধেবেলায় ওদের অনেক ফিল্ম স্ক্রিনিংয়েই আমি চলে যেতাম, স্রেফ ভাল লাগত বলে। প্যারালাল সিনেমা এবং ওয়ার্ল্ড সিনেমা, বিশেষত পূর্ব ইউরোপীয় এবং ইউরোপীয় সিনেমার প্রতি আমার ভালবাসার শুরু সেখান থেকেই। এরপরে ফিল্মমেকিং ছাড়া অন্য কোনও পেশার কথা ভাবতেই পারিনি আর। গ্র্যাজুয়েশনের পর তাই এফটিআইআই-এ ভর্তি হই ফিল্ম ডিরেকশনের ছাত্রী হিসেবে। এভাবেই শুরু।" বরাবরই সমাজের অবহেলিতদের নিয়ে গল্প বলেছেন পুতুল। তাঁর ক্যামেরায় উঠে এসেছে এক অন্য সমাজের ছবি, যা সচরাচর দেখতে অভ্যস্ত নই আমরা। এই

"এই মুহূর্তে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি রূপান্তরের পথে"

গল্প বলার ধরনে, বিষয় নির্বাচনে বরাবরই তিনি স্বতন্ত্রতার ছাপ রেখেছেন। ক্যামেরায় ফুটিয়ে তুলেছেন এক অন্য সমাজের ছবি। সম্প্রতি তাঁর পরিচালিত ছবি জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। সেই ছবি তৈরির অভিজ্ঞতা থেকে ডকুমেন্টারি ছবির ভবিষ্যৎ, সব নিয়ে বিশিষ্ট ফিল্মমেকার পুতুল মাহমুদের সঙ্গে কথা বললেন সায়নী দাশশর্মা।

জন্ম মুম্বই শহরে, সেখানেই বেড়ে ওঠা। মা অঙ্কের প্রফেসর এবং বাবা ইঞ্জিনিয়ার। সেইমতো নিজেও অর্থনীতি নিয়েই এগোচ্ছিলেন। আচমকাই জীবনের মোড় ঘুরে যায়। অর্থনীতি থেকে প্রথমে ফিল্ম ডিরেকশন এবং সেখান থেকে সম্প্রতি জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চকে ছুঁয়ে দেখেছেন পরিচালক পুতুল মাহমুদ। তাঁর পরিচালিত সিনেমা 'থ্রি সিস্টার্স' ৬৮তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মঞ্চে সামাজিক সমস্যায় সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে সম্মানিত হয়েছে। অর্থনীতি থেকে কীভাবে পরিচালনার জগতে এলেন

ধরনের চরিত্র নির্বাচনের কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, "যাঁদের এই সমাজ 'স্বাভাবিক' না হওয়ার অপরাধে ব্রাত্য করেছে, বা যাঁরা তাঁদের আশপাশের মানুষের চেয়ে অন্যভাবে দুনিয়াকে দেখতে অভ্যস্ত, যাঁরা সমাজের বস্তাপচা নিয়মের তোয়াক্কা করেন না, সেই মানুষগুলো আমায় অনুপ্রাণিত করে। 'কসমিক সেক্স' (প্রযোজনা করেছেন) থেকে 'অতসী' এবং 'থ্রি সিস্টার্স' অথবা শুরুর দিকে ইরফান খান এবং গীতাঞ্জলি কুলকার্নি অভিনীত আমার এক্সপেরিমেন্টাল ফিকশন শর্ট 'ইউ হু নেভার অ্যারাইভড', প্রতিটা গল্পের বিষয় এবং চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেই





শুটিংয়ের ফাঁকে

তাই এই থিমটা কমন থেকে গিয়েছে।" কিন্তু মানসিক অসুস্থতার মতো সংবেদনশীল একটা বিষয় নিয়ে কাজ করার কথা মনে হল কেন? জানালেন, "মানসিক স্বাস্থ্য এই সমাজে আজও একটি অবহেলিত বিষয়। এখনও এই সমাজে এমন মানুষ রয়েছেন, যাঁরা মানসিক অসুস্থতা নিয়ে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন, ডিনায়ালে থাকেন। কিন্তু সেই কারণে তো বিষয়টার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না! আমাদের আশপাশে কত মানুষ রয়েছেন, যাঁরা মানসিক সমস্যায় জর্জরিত। তাঁদের নিয়ে ভাবতে হলে তো প্রথমে তাঁদের সমস্যার প্রতি সচেতন হতে হবে। পরিচালক হিসেবে সেই দায়িত্বটুকুই পালন করার চেষ্টা করেছি আমি।" তবে কাজটা যে নিতান্তই সহজ ছিল না, সেকথাও নিজেই বললেন পুতুল। "অসুস্থদের সম্মান এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে সেলুলয়েডে এই বিষয়কে তুলে ধরা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। আর পরিচালক হিসেবে আমিও কখনও চাইনি মানসিকভাবে অসুস্থদের অবজেক্টিফায়েড ভিক্টিম হিসেবে দেখাতে। সাধারণত এই ধরনের সিনেমায় ব্যক্তির আত্মীয়, পরিজন, তাঁর চিকিৎসক কী বলছেন, সেগুলোর প্রতিই বেশি জোর দেওয়া হয়। এতে সেই ব্যক্তি বা তাঁর কাহিনি নিছকই একটি মেডিক্যাল কেসে পরিণত হয়। আমার মতে তা অমানবিক। ছবির প্রযোজক রত্নাবলী রায় আর আমি, কেউই সেটা চাইনি। 'অতসী' এবং 'থ্রি সিস্টার্স', দুটো ছবিতেই তাই মানসিকভাবে অসুস্থ নারীদেরই মুখ্য চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছি। তাঁদের গল্পে তাঁরা সকলেই অপার সাহসী। আবার দুটো ছবিই একদিক থেকে প্রেমের গল্প, যা ভালবাসায় পূর্ণতা এবং অপূর্ণতার কথা বলে।" জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "'থ্রি সিস্টার্স'-এর জন্য জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে অসাধারণ। সমাজের



অভিনেতা আয়ুষ্মান মিত্রের সঙ্গে, 'কসমিক সেক্স'-এর লোকেশনে

অবহেলিত এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মেনস্ট্রিম অ্যাটেনশন পাইয়ে দেওয়ার এই প্রয়াস যে সফল হয়েছে, সেই আনন্দ, সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।" এই মুহূর্তে একটি ফিকশন ফিল্ম নিয়ে কাজ করছেন পুতুল। ফিল্মমেকার অমিতাভ চক্রবর্তীর সঙ্গে সহ-প্রযোজনারও পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সঙ্গে সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট, কলকাতার ডিরেকশন অ্যান্ড স্ক্রিনপ্লে রাইটিং বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে প্রশিক্ষণও দিচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, ডকুমেন্টারি সিনেমার ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী তিনি। "ফিকশন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি বরাবরই বড় বাজেট এবং পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে এসেছে। স্বজনপোষণ এবং পিতৃতান্ত্রিকতার ছাপও তাই তাতে খুব স্পষ্ট। এরকম একটা পরিস্থিতিতে, ডকুমেন্টারি ফিল্ম প্রান্তিকদের কথা, তাঁদের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই ধরনের বিষয় নিয়ে এখন অনেক গুণী মহিলা পরিচালকই ভাল ভাল কাজ করছেন। দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাচ্ছে। তাঁরা বুঝতে পারছেন, আসলে তাঁরা কোন সমাজে বাস করছেন। অতিমারির পর থেকে দর্শকদের মধ্যে এই শিফ্‌টটা আরও বেশি লক্ষ করছি। নতুন ধরনের বিষয়, নতুন ধরনের মেকিং, ডকুমেন্টারির প্রতি তাঁদের আগ্রহও অবশ্যই বেড়েছে। সত্যি বলতে, এই মুহূর্তে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি রূপান্তরের পথে। পুরনো খোলস ছেড়ে বেরোচ্ছে ধীরে ধীরে। আমার মতে খুব বড় কোনও বদল আসতে চলেছে। নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন ধরনের স্টোরিটেলিং হয়তো খুব শীঘ্রই দেখতে পাব আমরা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি ওই ভবিষ্যৎটার জন্য।"



মিস ইউনিভার্স ডাইভার্সিটির মুকুট পরে

“সমাজই আমায় উপলব্ধি করিয়েছে যে আমি একজন ট্রান্সজেন্ডার”

ভারতের প্রথম ট্রান্স বিউটি কুইন নাজ় জোশী। আপাতত এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। ধাবার কর্মচারী থেকে দুবাইয়ে তাঁর বিউটি প্যাজেন্ট জেতার অভিজ্ঞতা শুনলেন সায়নী দাশশর্মা।

ট্রান্সজেন্ডার বিউটি কুইন হিসেবে আজ বিশ্ব জোড়া খ্যাতির অধিকারী নাজ় জোশী। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে মোট আটটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সম্মানিত হয়েছেন তিনি। সম্প্রতি ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত ‘এম্প্রেস আর্থ ২০২১-২২’-এও সেরার মুকুট উঠেছে তাঁর মাথায়। তবে দিল্লির উচ্চ-মধ্যবিত্ত পঞ্জাবি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে দেশের ‘নাজ়’ হয়ে ওঠা সহজ ছিল না মোটেই। জন্মপরিচয়ে ছেলে হলেও নিজেকে সবসময় একজন নারী হিসেবেই চিনেছেন তিনি। কথা প্রসঙ্গে বললেন, “আমি যে একজন ট্রান্সজেন্ডার, এই সমাজই সেটা আমায় বুঝিয়েছে। ছোটবেলায় কতবার প্রতিবেশিরা আমার বাবা-মাকে এসে বলেছেন আমার চালচলন, ব্যবহার ‘স্বাভাবিক’ নয়। ওঁরা আমায় ‘কিন্নর’ ভাবতেন। বহুবার কিন্নর সম্প্রদায়ের হাতে আমাকে তুলে দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন।” পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে ভেবে কিছু বছরের জন্য পড়াশোনা করতে মুম্বইয়ে মামার কাছে পাঠানো হয় নাজ়কে। কিন্তু তিনি পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া তো দূর, উলটে ধাবার কাজে লাগিয়ে দেন তাঁকে। এগারো বছর বয়সে কাজ়িনদের দ্বারা গ্যাংরেপড হন নাজ়। সেই থেকেই জীবনের মোড় সম্পূর্ণ অন্যদিকে বাঁক নেয়। “হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মামা আর কোনও খোঁজ রাখেননি। সেখানে আমার আলাপ হয় এক ট্রান্স মহিলার সঙ্গে। তিনি সঙ্গে করে আমায় নিয়ে যান। কিন্তু সেখানেও শুধু ভিক্ষাবৃত্তিই শিখছিলাম। কিছুদিন পর একটি ডান্সবারে কাজ করা শুরু করি। বারের মালিক খুব দয়ালু ছিলেন। উনিই আমার অভিভাবক হয়ে ওঠেন সেই সময়।” তাঁর উদ্যোগেই মামার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ হয় নাজ়ের। স্কুলেও ভর্তি হন। কিন্তু আর-পাঁচজনের মতো সাধারণ ছিল না তাঁর সেসব দিনের অভিজ্ঞতা। “মনে আছে, সকালে ছেলেদের মতো ড্রেস-আপ করে স্কুলে যেতাম। বাড়ি ফিরে হোমওয়র্ক সেরে পোশাক পালটে ডান্স বারে যেতাম পারফর্ম করতে।” এভাবেই স্কুল পাশ করেন নাজ়। ১৮ বছর বয়সে এক বোনের পরামর্শে ফ্যাশন ডিজ়াইনিং নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। সেইমতো দিল্লির ফ্যাশন ইনস্টিটিউট থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে চাকরিতে ঢোকেন। “আমার প্রথম চাকরি ডিজ়াইনার ঋতু কুমারের অধীনে। এছাড়া ঋতু বেরি এবং আদর্শ গিলের হয়েও কিছুদিন কাজ করেছি। ওঁরা প্রত্যেকেই এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়কে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ওঁরা বুঝতে পারতেন, আমার মধ্যে একজন ট্রান্সজেন্ডার মানুষ লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য কারিগর আমার অধীনে কাজ করতে চাইছিলেন না। একজন ‘হিজড়ে’র কথামতো কাজ করতে হবে, এটা ওঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। একটা সময় পরে কাজ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ফলে ফ্যাশন ডিজ়াইনিং ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।” তাঁর বয়স যখন ২৮, তখন দিল্লিতে এক ট্রান্সজেন্ডার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে প্রথম সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির বিষয়ে



র‍্যাম্পওয়াকে আত্মবিশ্বাসী



মিস ইউনিভার্স ডাইভার্সিটির মঞ্চে

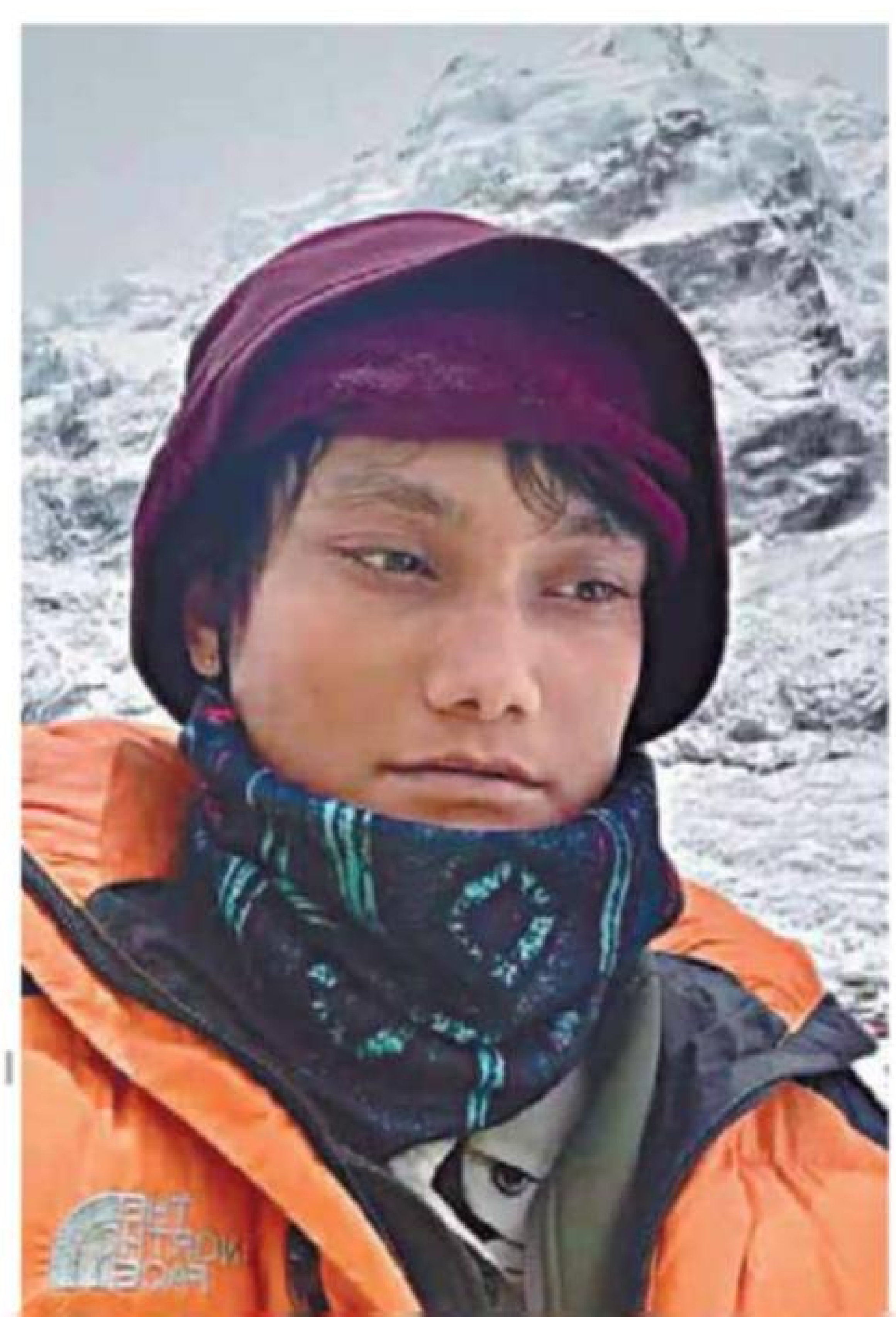
জানতে পারেন নাজ়। "আমি পুরুষদের প্রতিই আকর্ষিত হতাম বরাবর। কিন্তু কেন জানি না, আমার নিজেকে কখনও সমকামী মনে হয়নি। বন্ধুর থেকে যখন তাই অপারেশনের কথা শুনি, দ্বিতীয়বার ভাবিনি।" প্রায় চারবছরের থেরাপি ছিল, বলাই বাহুল্য, অত্যন্ত খরচসাপেক্ষও। জীবন আবারও তাঁকে দাঁড় করাল এক নতুন যুদ্ধের মুখে। "ওই বন্ধুই আমায় পরামর্শ দেন যৌনকর্মী হিসেবে কাজ করার। প্রথমে রাজি হইনি। কিন্তু সেসময় অন্যভাবে রোজগারের উপায়ও ছিল না আমার হাতে। বাধ্য হয়ে ওই পথে আসি। সেই অভিজ্ঞতা আরও ভয়াবহ ছিল। কোনও সমস্যায় পড়লে অভিযোগ জানানোরও উপায় ছিল না। কিন্তু চিকিৎসা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য টাকা জরুরি ছিল।" ২০১৩ সালে অপারেশনের পর 'নাজ়' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। বেশ কিছু ফ্যাশন শো-এ অংশগ্রহণ করে হয়ে ওঠেন ভারতের প্রথম ট্রান্স শো-স্টপার। সেই থেকেই ধীরে ধীরে সাফল্য ধরা দিতে শুরু করে। ব্যক্তিগত জীবনের পথও মসৃণ হয়ে ওঠে অনেকটা। "২০১৫ সালে আমার এক চিত্রগ্রাহক বন্ধু আমায় নিয়ে একটি ফোটো সিরিজ় শুট করেন। 'বায়োপিক অফ আ ট্রান্সজেন্ডার প্রস্টিটিউট'। ছবিগুলো বিভিন্ন মিডিয়া হাউসে প্রশংসিত হয়। একটি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ হিসেবেও ছাপা হয়। সেই সূত্র ধরে সিএনএন আমায় নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানায়, প্রথম ট্রান্স কভার মডেল হিসেবে। সিরিজ়টা দেখে আমার বাবা যোগাযোগ করেন আমার সঙ্গে। তারপর বাড়িও ফিরে যাই আমি। তবে মা কোনওদিনও আমায় মেনে নিতে পারেননি। যদিও ভাই-বোনরা এখন পাশে রয়েছে।" ২০১৬ সালে মিস ইউনাইটেড নেশনস অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নির্বাচিত হন নাজ়। ২০১৭ থেকে ২০১৯ টানা তিনবছর মিস ওয়র্ল্ড ডাইভার্সিটির খেতাব পান। এছাড়া ২০২০ এবং ২০২২-এর মিস ইউনিভার্স ডাইভার্সিটির মুকুটও ওঠে তাঁর মাথায়। আপাতত ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে কাজ করছেন নাজ়। সফল কর্মজীবনের পাশাপাশি সমান তালে সামলাচ্ছেন মাতৃত্ব। "আমার মেয়ে শরণ্যার বয়স এখন সাড়ে তিন। ওঁর জন্মদাতা বাবা-মা পরিত্যাগ করার পর আমি ওঁর দায়িত্ব নিই। আমার স্বর্গীয় বাবা পেশায় আইনজীবী ছিলেন, ওর কাস্টডি পেতে সাহায্য করেছিলেন। এখন ও-ই আমার জীবনের সবটুকু জুড়ে রয়েছে।" পেশাজীবনের সাফল্যে গর্ববোধ করলেও, নাজ়ের মতে এখনও অনেক পথ চলা বাকি তাঁর। "এখনও ট্রান্সজেন্ডারদের নিজের অধিকারের জন্য, সম্মানের জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পেরিয়েও আমার মতো মানুষদের বৈষম্যের শিকার হতে হয়। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আইন রয়েছে, কিন্তু সে বিষয়ে সচেতনতা নেই। কারণ সমাজে আমাদের সম্প্রদায়ের রিপ্রেজ়েন্টেশন হাতে গোনা। সেটাই বদলাতে চাই আমি। যেটুকু লাইমলাইট ওঁদের দিতে পারি, সেই চেষ্টা করছি। সুযোগ পেলে ওঁরাও অনেককিছু করতে পারবে। এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে," বললেন তিনি।



“৩০লাখ ঋণের বোঝা নিয়ে এভারেস্টে উঠেছি”

সামাজিক, অর্থনাতিক, পারিবারিক নানা বাধা পার করে ও শৃঙ্গের ভয়ঙ্কর তুষার ঝড়ের ঝাপটা সরিয়ে, কোনও রকম কৃত্রিম অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া এভারেস্টের শিখর ছুঁলেন বাঙালি মেয়ে পিয়ালি বসাক। চন্দননগরের সাধারন মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ের সেই অদম্য জেদ ও লড়াইয়ের গল্প শুনলেন দেবলীনা অধিকারী।

পর্বত তাকে নেশাচ্ছন্ন করেছিল। সেই নেশায় আকণ্ঠ-নিমজ্জিত পিয়ালি বসাক শৈশব থেকেই ছুটে বেড়িয়েছিল পর্বতের শিখরে শিখরে। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা পিয়ালী চাকরির প্রেশার, ৩০ লাখ টাকার ঋণের বোঝা পিঠে চাপিয়ে হাঁটা দিলেন এভারেস্টের পথে। প্রবল জেদ আর পরিশ্রমের কাছে হার মেনেছিল এভারেস্টের ভয়ঙ্কর তুষারঝড়, ফ্রস্টবাইট, অক্সিজেনের অপ্রতুলতা। কোনওরকম কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়াই চূড়ায় উঠলেন পিয়ালি। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে জানা গেল, তেনজ়িং নোরগেই ছিলেন পিয়ালির পর্বতারোহণের প্রথম অনুপ্রেরণা। তেনজ়িংয়ের গল্প পড়েই প্রথম পর্বতের প্রেমে পড়ে ছয় বছরের ছোট্ট পিয়ালি, “পাড়াপ্রতিবেশির থেকে বই-টই জোগাড় করে



আমার মা-বাবা পড়াতেন। তেনজ়িং নোরগে ও এডমন্ড হিলারির গল্প পড়তে গিয়ে এভারেস্টে ওঠার বর্ণনা মনে দাগ কেটেছিল। তখন আমি মা-বাবার কাছে বায়না শুরু করি যে পর্বতারোহণ ছাড়া বাঁচব না। মা-বাবা প্রথমে নিয়ে যেত তীর্থক্ষেত্রগুলোতে— কেদার, গঙ্গোত্রী, অমরনাথ, বৈষ্ণোদেবী। তখন পাহাড়ে উঠে মনের আনন্দেই খাড়াই-চড়াই বেয়ে দৌড়তে থাকতাম। তখন জানতাম না তাকেই বলে রক-ক্লাইম্বিং। এটাই সম্ভত আমাকে পরে অক্সিজেন ছাড়া শৃঙ্গ জয়ে সহযোগিতা করেছে।” যদিও তার জন্য আলাদা করে কোনও ‘প্র্যাকটিস’ তিনি অর্থের অভাবে করতে

পারেননি। অক্সিজেন ছাড়া পর্বতারোহণ তবে কীভাবে সম্ভব হল? কী ছিল পিয়ালির নিজস্ব প্র্যাকটিস? তার জন্য দম বন্ধ করে সাইকেল চালাতেন তিনি,শিখতেন মার্শাল আর্ট। পিয়ালি মনে করেন হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ভাল থাকা পর্বতারোহণের প্রাথমিক শর্ত। ‘‘পর্বতারোহণের জন্য হার্ট ও লাংস অনেক স্ট্রং থাকতে হয়। এবার যাঁরা আমাদের এখানে পর্বতারোহণ করেন, তাঁরা তো ছোটবেলা থেকে তৈরি হয়ে যান না। কলেজ শেষে ট্রেকিংয়ের পর অভিযানে আসেন। তাই হয়তো অক্সিজেন নিয়েও এত মৃত্যু বা ফ্রস্টবাইটে হাত-পা কাটা যাওয়ার ঘটনা ঘটে।’’ ২০১৮-য় তিনি প্রথম অষ্টম ৮০০০ মিটার উঁচু মানাসলু শৃঙ্গ জয় করেন অক্সিজেন ছাড়া। সেই অভিযানে ছিলেন বেশ কয়েকজন বিদেশি। তাঁদের মধ্যে একজন ট্রেনার পিয়ালির অক্সিজেন স্যাচুরেশন দেখেন, যা ছিল প্রায় ৯৮-৯৯। প্রায় সি লেভেলের সমান অক্সিজেন স্যাচুরেশন। ট্রেনিং প্রাপ্ত এক বিদেশির যেখানে অক্সিজেনের লেভেল ছিল ৮৭-৮৮। তখনই সেই ট্রেনার তাঁকে অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে ওঠার পরামর্শ দেন। কেমন করে সম্ভব হল পড়াশোনা, চাকরি, পর্বতারোহণকে নিয়ে একসঙ্গে চলা? গল্প শোনাতে গিয়ে ছা-পোষা বাঙালি মেয়ের কণ্ঠে ধরা পড়ে অদম্য তেজ, ‘‘ছোটবেলা থেকে আমি পড়াশোনা করেছি। বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ, বাবা শয্যাশায়ী। তাই সরকারি চাকরির জন্য ১৪/১৫ ঘণ্টা পড়াশোনা করার পাশাপাশিই মার্শাল আর্ট চালিয়ে যাওয়া, হিমালয় মাউন্টেনারিং ইনস্টিটিউশনে ট্রেনিং নেওয়া— সব করেছি। আমি আঁকতে ভালবাসি, যোগাসনও ভালবাসি। প্রথম চাকরি ছিল সিঙ্গুরে। প্রায় ৫০ কিলোমিটার সাইকেলেই যাতায়াত করতাম। বছরের পর বছর এই চাপ নিয়েছি বলেই সম্ভবত এই সাফল্য।’’ ৩ মে, ২০২১-এ চন্দনগরের মেয়ে পা বাড়ালেন এভারেস্টের পথে। তার পরের ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ের অভিজ্ঞতা শোনালেন পিয়ালি, ‘‘তুষারঝড় থেকে পৃথিবীর পর্বতারোহণের ইতিহাসে কেউ বেঁচে ফিরে আসতে পারেননি। প্রথমে আমি আর্থিক কারণে পর্বতে ওঠার অনুমতি পাইনি। যখন পাই, ওয়েদার উইন্ডো থেকে জানতে পারি আবহাওয়া খুব ভাল নেই। রাত আটটার সময়ে আরোহণ শুরু হয়েছিল। তুষার ঝড়ের গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে, -৬০ থেকে -৭০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় বহুজনই ফিরে যেতে শুরু করেন। কিন্তু আমি আমার মা-বাবার আত্মত্যাগকে ও সাধারণ মানুষ যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সম্মান জানাতে চেয়েছিলাম। এটাও জানতাম যে এই সুযোগ একবার হাত ছাড়া হলে আর পাব না। তাই রাত আটটায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি আরোহণ





করব। শৃঙ্গের সামান্য আগে ১০০ মিটারেরও কমে অক্সিজেন নিতে হয়েছিল। শারীরিক কারণে নয়, তুষারঝড়ের মুখোমুখি যাতে হতে পারি, সেই জন্য। নিচে নামার সময়ও রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। সে এক অন্য লড়াই।’’ এ হেন লড়াকু মেয়ের কাছে কোনও বাধাই বাধা নয়। সমাজ মেয়েদের জন্য যে বিপুল বাধা বরাদ্দ করে রাখে, তার থেকে নিস্তার পাননি পিয়ালিও। তুষারঝড়ের লড়াইয়ের থেকে সেই লড়াই আরও বেশি শক্ত ছিল বলে জানান তিনি। সকলকে সম্মান জানিয়ে নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে যাওয়াকেই তিনি নারী ক্ষমতায়ন বলে মনে করেন। ঠিকমতো সরকারি সাহায্য পেলে তিনি ও তাঁর মতো অনেকেই দেশ ও বাংলাকে আরও সম্মানিত করবেন বলে আশা করেছেন তিনি।



পাশাপাশি বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ বিষয়ে এ দেশের সরকারের মন্ত্রণাদাতাও ছিলেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন বোর্ড অফ ওয়াইল্ডলাইফের প্রধান ছিলেন, বাবা তখন সেই বোর্ডের সেক্রেটারির দায়িত্ব সামলেছেন। উনিশ বছর তিনি ওই পদে ছিলেন। ছোটবেলা থেকে আমি তাই আমার আশপাশে হয় ডাক্তারদের দেখেছি, কিংবা দেখেছি বন্যপ্রাণ সংরক্ষকদের। এই জগৎটা তাই আমাকে বরাবরই টানত। আমার নিজের ভাই-বোন ছিল না, তাই জীবজন্তুদের সঙ্গে আমার ছোটবেলার অনেকটা সময় কেটেছে। আমার মা বলেন, ছ'-সাত বছর বয়স থেকেই আমি ভাবতাম, বড় হয়ে ইকোলজিস্ট (পরিবেশবিদ) হব।''

তাঁর কাছেই আরও জানলাম, লতিকার দাদু-দিদা থাকতেন কাশ্মীরে। তিনি তাই ভেবেছিলেন, সেখানেই বন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করবেন। কিন্তু নয়ের দশকে কাশ্মীর জঙ্গি হামলায় খুব অশান্ত হয়ে ওঠে। লতিকার দাদুর বাড়িতে বোমা অবধি পড়ে। ফলে সেখানে কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে হয়ে যায় অসম্ভব। এই সময়ই ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটের তৎকালীন ডিরেক্টর এইচ এস পওয়ার লতিকাকে বলেন, বাঘ নিয়ে গবেষণা শুরু করতে। কাজটা সহজ ছিল না। পুরুষ অধ্যুষিত এই ফিল্ডে প্রথম যে ক'জন মহিলা এ দেশে কাজ করেছেন, লতিকা তাঁদের এক জন। চিরাচরিত ধ্যানধারণা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে লতিকার আপত্তি ছিল। তার আগে অবধি বাঘ গোনার যে নিয়ম চালু ছিল, তা বদলানো প্রয়োজন কিনা — এ সবই তিনি ভেবেছেন একজন বিজ্ঞানীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অথচ পরের ঘটনা আশ্চর্যের, লতিকা শোনালেন নিজেই, "১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে আমি আমার থিসিস লিখি, যেখানে আমি বাঘ সংরক্ষণের সেনসাস টেকনিক নিয়ে কিছু প্রশ্ন তুলি। ক্যামেরা ট্র্যাপের ব্যবহার পদ্ধতি পাল্টানোর পরামর্শ দিই, যেহেতু কোনও এলাকায় বাঘের বিচরণ কোনও নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনে চলে না— তা নির্ভর করে বাঘের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর। এই প্রশ্নগুলো তোলা সেই সময়ে সহজ ছিল না, কারণ উত্তরগুলো ছিল খুব অস্বস্তিদায়ক।

"অনেক আগেই ওঁরা যদি আমার কথা শুনতেন!"

ছোটবেলা থেকে মানুষের চেয়ে তিনি বেশি সখ্য পাতিয়েছেন জীবজন্তুদের সঙ্গে। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি বাঘেদের নিয়ে পিএইচ ডি করেছেন। পেয়েছেন 'টাইগার প্রিন্সেস'-এর খেতাব। পুরুষ-অধ্যুষিত তাঁর পেশায় নিজের চেষ্টায় স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছেন পরিবেশবিদ ও ফোটোগ্রাফার, ড. লতিকা নাথ। লিখেছেন অচ্যুত দাস।

বাঘেদের নিয়ে পিএইচ ডি করে এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য প্রাণপাত করে তিনি 'টাইগার প্রিন্সেস'-এর খ্যাতি কুড়িয়েছেন। পেশায় তিনি এক জন কনজ়ারভেশন ইকোলজিস্ট অ্যান্ড ফোটোগ্রাফার। ড. লতিকা নাথের কথায়, পাশাপাশি তিনি এক জন 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালট্যান্ট অন হিউম্যান ওয়াইল্ডলাইফ ইসুজ়'। তাঁর বিপুল কর্মকাণ্ডের কথায় আসব, তার আগে জানতে ইচ্ছে করল তাঁর ছোটবেলার কথা, যার প্রভাবে তাঁর এই জগতে আসা। লতিকা জানালেন, ''আমার জন্ম দিল্লিতে। বাবা এইমসে ডাক্তারি করার

স্বাভাবিক ভাবেই, সেই অস্বস্তি এড়ানোর জন্য, সে সময় পলিসি মেকাররা আমার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়িত করেননি। সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের লেগে গেল ২০-২২ বছর। এত দিন পর তাঁরা সেই আমার প্রস্তাবগুলোই কার্যকর করছেন।”

সরকারি সংস্থা বা বেসরকারি উদ্যোগের ভরসায় বসে না-থেকে লতিকা বাঘ সংরক্ষণের জন্য তাঁর কাজ শুরু করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে কারণ তাঁর মতে, “বন্যপ্রাণের প্রকৃত রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক ওঁরাই।” যেহেতু নিজস্ব উদ্যোগে সবটা করছেন, তাই কাজটা চালিয়ে যাওয়ার জন্য লতিকা এক সূত্রে গেঁথেছেন বিজ্ঞান, পার্ক আর টুরিজ়ম — সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত এই তিন আলাদা ক্ষেত্রকে। এই কাজ করতে করতেই ফোটো তোলার নেশাও পেয়ে বসে লতিকাকে। তাঁর তোলা ফোটো দেখে মানুষ আনন্দ পাচ্ছেন দেখে আরও উৎসাহ পান। শুরু করেন কনজ়ারভেশন ফোটোগ্রাফিও। যেখানে এক-একটা ফোটোগ্রাফ নিছক ফোটো নয়, কারণ লতিকার তোলা প্রত্যেক ফোটোর মধ্যেই লুকোনো আছে কোনও না-কোনও গল্প। লতিকা বলছেন, ‘‘আমি এক জন অ্যানিম্যাল কমিউনিকেটর-ও। এ কথাটা শুনে অনেকে ভুরু কোঁচকালেও জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে কমিউনিকেট করার ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি। জীবজন্তুদের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাতে এমন অনেক গল্প আমি খুঁজে পেয়েছি, যেগুলোর কথা আমি পরে সবিস্তারে লিখেওছি। বিশেষ করে হাতিদের সঙ্গে দেখা করে আমি তো ভীষণই আনন্দ পাই, যেহেতু ওদের বুদ্ধির কোনও তুলনা নেই।’’

কাজের সূত্রেই প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হোয়েল শার্কদের সঙ্গেও সাঁতার কেটেছেন লতিকা। কেনিয়ায় গিয়ে হিংস্র বন্য কুকুরদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন। একবার অমন একটা কুকুরের দলের খুব কাছে গিয়ে ফোটো তুলছিলেন লতিকা, এমন সময় তাঁর ঘাড়ের কাছে চুপিসারে এসে পড়ে একটা দৈত্যাকার হাতি! তাকে দেখে কুকুরদের সমবেত চিৎকারে লতিকার হুঁশ ফেরে, ছিটকে তিনি নিজের জায়গা থেকে সরে যান। দমবন্ধ করা এই ধরনের সব অভিজ্ঞতা কনজ়ারভেশনিস্ট এবং ফোটোগ্রাফার হিসেবে তাঁকে আরও সমৃদ্ধ করেছে, লতিকা এমনটাই মনে করেন।

বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের কাজে দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় ঘুরেছেন লতিকা। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘‘পৃথিবীর সর্বত্রই ভাল-মন্দ দু’রকম মানুষই আছেন। কেউ নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রকৃতির কথা ভাবছেন, কেউ আবার অন্য কারও কথাই না-ভেবে, প্রকৃতিকে যথেচ্ছ এক্সপ্লয়েট করছেন। বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের সদিচ্ছা এবং রাজনৈতিক দলের কিংবা ক্ষমতাসীন মানুষদের অনিচ্ছা— এ শুধু





আমাদের দেশেই দেখা যায়, এমন ভাবলে ভুল ভাবা হবে। প্রবণতাটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিশ্বের প্রায় সব দেশে একই রকম।’’

আনন্দের কথা, বাঘের সংখ্যা আমাদের দেশে গত কয়েক দশকে বেড়েছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, তার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানুষের সঙ্গে বাঘের সংঘাতও। লতিকার মতে, ‘‘বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যতটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ওদের রক্ষণাবেক্ষণের পরিকাঠামোর উন্নয়নে ততটা জোর দেওয়া হয়নি বলেই আজ এই সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে।’’ যে সমস্যার, লতিকার মতে, সমাধান অবশ্যই সম্ভব। সম্ভব মানুষ এবং বন্যপ্রাণের নিরুপদ্রব সহাবস্থান। নইলে অসম্ভব একা মানুষের বেঁচে থাকা।

ফোটো : লতিকার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে



বহাল। এখনও এত ব্যস্ততার মধ্যেও মেডিটেশন হিসেবে ইনা বেছে নেন ছবি আঁকা বা কবিতা লেখাকেই।
যেহেতু ইনার বাবাও ছিলেন একজন পাইলট, তাই ছোট থেকেই অ্যাভিয়েশনের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল তার। কাজেই 'বড় হয়ে কী হতে চাও' এই প্রশ্নে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতেন, "পাইলট হতে চাই।" ছোটবেলার এই স্বপ্নের কাছাকাছি পৌঁছনোর রাস্তাটা কিন্তু খুব মসৃণ ছিল না। বেশ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় তাকে। কিন্তু সেগুলো সহজেই পেরিয়ে যেতে পেরেছিলেন, কারণ প্রতিটা সময় বটগাছের ছায়ার মতো পেয়েছিলেন পরিবারের সাপোর্ট। বিয়ের আগে তো বটেই, বিয়ের পরেও। স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং এগারো বছরের ছোট্ট মেয়েটিও সব সময় পাশে থেকেছে তার। তবে ইনা জানাচ্ছেন, পারিবারিক সাপোর্টের পাশাপাশি আর যে বিষয়টি এক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল 'ফিনানশিয়াল সাপোর্ট'। কারণ যে পেশা বেছেছেন ইনা, তাতে এগিয়ে যাওয়া খানিক ব্যয়সাপেক্ষ। তা ছাড়া এই জাতীয় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ স্কলারশিপেরও তেমন ব্যবস্থা নেই। তাই ইনার মতে, পরিবারের উচিত, একে ব্যয় নয়, বরং বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা। তবেই এই পেশায় যারা আসতে চায়, পথটি তাদের পক্ষে খানিক সহজতর হবে।
ইনার ১৪ বছরের পাইলট জীবনে স্মরণীয় অভিজ্ঞতার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সে পরীক্ষার সময় ১৪-১৬ ঘণ্টা পড়াশোনাই

"আজকের দিনে মেয়েদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর থাকা খুবই জরুরি"

'ওম্যান হোল্ড আপ হাফ দ্য স্কাই'– পরিচিত এই কথাটিই আলাদা মাত্রা পায়, যখন সেই মহিলা হন একজন সফল পাইলট। কথা হচ্ছে এয়ার ইন্ডিয়ার সিনিয়র কমান্ডার ইনা রায়চৌধুরীকে নিয়ে। শুনলেন পৃথা বসু।

তথ্য বলে, বিশ্বের ৫ শতাংশ মহিলা পাইলটের মধ্যে ভারতে মহিলা পাইলটের অনুপাত প্রতি ১০০ জনে ১৫ জন। সেই পরিসংখ্যানে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম ইনা রায়চৌধুরী। পরিবারের স্নেহ-ভালবাসার আবহেই কেটেছে ইনার শৈশব। তারা তিন ভাই-বোন। সাক্ষাৎকারে ইনা জানান, ছোটবেলায় খুবই লাজুক ছিলেন তিনি। কলেজে ওঠার পর নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করেন ইনা। খুঁজে পান মনোবল। শেখেন 'না' বলতে। নাচ- গানের মধ্যে দিয়ে নিজের সৃজনশীলতাকে প্রকাশ করতে শুরু করেন। সেই অভ্যেস এখনও হোক, বা ফ্লোরিডায় ট্রেনিংয়ের সময় যখন একা উড়ে গিয়েছিলেন প্লেন নিয়ে, সেই নার্ভাসনেস। কিন্তু একটি ঘটনা ইনা অদ্ভুত ভাল লাগার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। একবার এয়ারপোর্টে পোস্ট স্ক্রিনিংয়ের পর, ফ্লাইট ব্যাগ আসার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। কিছুদূরে হুইলচেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধা। চোখে চোখ পড়তে ইশারায় ইউনিফর্ম পরিহিত ইনাকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, যে তিনি পাইলট কি না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে, সেই বৃদ্ধা নাকের নীচ থেকে তর্জনি তুলে গর্বের







ভঙ্গি করেন। ইনা জানাচ্ছেন, যিনি তাকে চেনেন না, কোনওদিন দেখেনওনি, অথচ তার কৃতিত্ব গর্বিত করছে সেই অপরিচিতাকে। নারী ক্ষমতায়নের এর চেয়ে বড় সেলিব্রেশন আর কী হয়? ওম্যান এমপাওয়ারমেন্ট যে আসলে কোনও ব্যক্তিগত সাফল্যের কথা বলে না, সেটি যে গোটা নারীজাতিকেই জয়ের আনন্দ দেয়, এই ঘটনাগুলো বারবার তা প্রমাণ করে। কর্মরত মহিলাদের প্রায়শই যে জাজমেন্টাল মন্তব্যের মুখোমুখি হতে হয়, সৌভাগ্যবশত ইনাকে সেসব শুনতে হয়নি। কারণ যে প্রফেশনে তিনি রয়েছেন, সেখানে কেবলমাত্র যথার্থ যোগ্যতারই মূল্য দেওয়া হয়। নারী না পুরুষ, কিংবা বয়সের ভেদাভেদ, সে সব ব্যাপার নিতান্তই গৌণ। ইনার মতে, মেয়েরা যত এগিয়ে আসবে, যত তারা বাধার সামনাসামনি হবে, ততই সেগুলোকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন উদ্যমে লড়াই করতে শিখবে। তারা আয়ত্ত করবে নানা কৌশল। আজকের দিনে মেয়েদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর থাকা খুবই জরুরি। প্রত্যেকটা বাধা তাকে সেই দিকে একধাপ এগিয়ে দেবে। নিজের সমস্যায় নিজেকেই সোচ্চার হতে হবে।

ইনাকে যখন প্রশ্ন করা হয়, ব্যক্তিজীবন ও পেশাগত জীবনকে ব্যালেন্স করেন কীভাবে? ইনা জানান, এই প্রশ্ন পুরুষদের করা উচিত। কারণ মেয়েরা মাল্টিটাস্কারই হয়। এখানে ইনা আবারও পরিবারের সাপোর্টের কথাই বলেন। ইনা জানাচ্ছেন, ককপিটে যখন তিনি বসেন, 'পরিবার' শব্দটির অর্থ তখন আরও বড় হয়ে ধরা দেয় তাঁর কাছে। নিজের পারিবারিক দুশ্চিন্তাকে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রাখতেই হয়, কারণ সেই মুহূর্তে আরও অনেকগুলো প্রাণের, আরও অনেকগুলো পরিবারের দায়িত্ব ইনার কাঁধে। ইনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বারবার করেই তার সাপোর্টিভ ফ্যামিলির কথা। একজন ব্যক্তির সাফল্যের পিছনে তার পরিবারের সহযোগিতা একটি বিশেষ ভূমিকা রাখেই। আর সেই ব্যক্তি যখন হয় একজন নারী, তখন কিছুক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে অনিবার্য। আজকের ডিজিটাল শো-অফের দিনেও, এই নিরন্তর সহযোগিতার গল্পে, তাই আলাদা করে নজর কাড়ে ইনার পরিবার। নারী ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ইনা বলছেন, যেখানে বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৪৯.৬% নারী, সেখানে নারী ক্ষমতায়ন আসলে সমসুযোগের কথাই বলে। নারীশিক্ষার প্রসার, ছোটবেলা থেকেই তার মতামতকে সম্মান করা, তার পছন্দ- অপছন্দকে স্বীকৃতি দেওয়াই, আজ ওম্যান এমপাওয়ারমেন্টের নতুন ভার্সন। ইনা জানাচ্ছেন, কোনও সংরক্ষণ বা সুবিধার ভিত্তিতে নয়, বরং নিজের মেধা ও যোগ্যতা দিয়েই নারী অর্জন করবে তার স্বপ্ন।



অনেক কাজও করতাম। বেআইনিভাবে চন্দনগাছ কাটা থেকে চোরাশিকার, বলা চলে জঙ্গলে যা হচ্ছিল সবের উপরেই নজর রাখতে হত। পিএইচডি করি আমেরিকায়, স্লেন্ডার লরিস নিয়েই। ওদের 'বিহেভিয়র অ্যান্ড ইকোলজি' সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করা রীতিমতো কঠিন কাজ ছিল। লরিসকে যে লজ্জাবতী বলা হয়, সেটা ভুল নয়। মানুষ দেখলেই ওরা গাছের কোটরে ঢুকে পড়ে। ওদের খুঁজে বের করে ক্যাম্পে নিয়ে এসে কলার পরানোর মেথডোলজিটা শিখতেই সময় লেগেছিল।''

পিএইচডি-র পর পড়ানো শুরু করেন কাবেরী। সেই সময় আর্বান ইকোলজি নিয়েও কাজ করছিলেন তিনি। কাজের বিষয় ছিল, 'ওয়াটার কনজ়াম্পশন অ্যাট হোম গার্ডেনস'। ২০১৩-তে ফিরে ভারতে ফিরে আসেন তিনি। ঠিক করেন, লরিস নিয়ে কাজ করেন। ''লরিস সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্য 'লরিস ওয়াক'-এ নিয়ে যেতাম ছাত্রছাত্রীদের। কাফে, রেস্তরাঁ, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, কর্পোরেট সংস্থায় টক দিতাম। ইকোলজি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করছিলাম এভাবেই,'' বয়ান কাবেরীর। ''বন্যপ্রাণ সম্পর্কে জানতে গেলে, তাদের সুরক্ষিত রাখতে গেলে শুধু ন্যাশনাল পার্কে কাজ করলে হবে না। তার বাইরে বেরিয়ে, স্থানীয় মানুষদের কথা শুনতে হবে। প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ সম্পর্কে তাঁদের যে জ্ঞান, তাকেও কাজে লাগাতে হবে। আমাদের প্রজেক্টের মাধ্যমে এটা করতে পেরেছিলাম।''

মহিলা কনজ়ারভেশনিস্ট, কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের চ্যালেঞ্জ— এগুলোকে মানুষের সামনে তুলে ধরা কাবেরীর আর একটা লক্ষ্য। জানালেন, ''আমার মনে হয়, সেক্সিজ়ম একটা বড় সমস্যা আমাদের পেশায়। আমার বন্ধু, চিত্রনির্মাতা আকাঙ্ক্ষা সুদ সিংহ একটা ইনস্টা হ্যান্ডল শুরু করেছেন গত বছর, 'উইমেন অফ দ্য ওয়াইল্ড ইন্ডিয়া' নামে— মহিলা কনজ়ারভেশনিস্টদের ফিল্ডওয়র্ক করতে গিয়ে কতটা যৌন হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়, সেটা তুলে ধরার জন্য। এই হ্যান্ডলে আমি মহিলা কনজ়ারভেশনিস্টদের বিভিন্ন সমস্যা— সেক্সিজ়ম, মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থেকে পারিবারিক সমস্যা— সেগুলো নিয়ে লাইভ করি। এছাড়াও কাজ করছি কনজ়ারভেশন অ্যাওয়্যারনেস নিয়ে। এ বিষয়ে বাংলায় একটা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করারও পরিকল্পনা রয়েছে।'' মানুষ, পশু, গাছপালা— সকলে যেন ভাল থাকে, এটুকুই চাওয়া তাঁর।

''বন্যপ্রাণকে সুরক্ষিত রাখতে গেলে ন্যাশনাল পার্কের বাইরে বেরতে হবে''

অরণ্য, বন্যপ্রাণ ও মানুষকে ভাল রাখার কাজে লড়ে চলেছেন নর্থ ক্যারোলাইনা মিউজ়িয়াম অফ ন্যাচারাল সায়েন্স-এর বৈজ্ঞানিক, ড. কাবেরী কর গুপ্ত। সেই লড়াইয়েরই গল্প বললেন সংবেত্তা চক্রবর্তীকে।

ছোট থেকেই জঙ্গল ভালবাসতেন কাবেরী। বলছিলেন, ''আমাদের বাড়ি ছিল খড়দায়। সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে জঙ্গল ছিল। তাছাড়াও 'চাঁদের পাহাড়', 'আরণ্যক' থেকে 'মাধুকরী' পড়া— সব মিলিয়ে জঙ্গল যেন জড়িয়ে গিয়েছিল জীবনের সঙ্গে!'' প্রাণিবিদ্যা নিয়ে স্নাতকের পর দেরাদুনে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন স্নাতকোত্তর করার জন্য। তাঁর কথায়, ''পূর্ব ভারত থেকে আমিই প্রথম ছাত্রী ছিলাম ওখানে। রাজাজি ন্যাশনাল পার্কে থিসিস করেছিলাম, হনুমানদের ফিডিং ইকোলজি এবং ফুড কেমিস্ট্রি নিয়ে। তারপর ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটেই যোগ দিই রিসার্চ ফেলো হিসেবে। তখন একটা সার্ভে করেছিলাম, কচ্ছপদের নিয়ে— যেহেতু ওরা বিপন্ন প্রজাতি এবং সে সময় ওদের মাংস খাওয়া হত। সেই সমীক্ষার রিপোর্ট ভিত্তি করেই কচ্ছপের চোরাকারবার বন্ধ করার জন্য আরও কড়া পদক্ষেপ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এরপর অরুণাচল প্রদেশ যাই, প্রাইমেটস এবং পাখিদের উপর সার্ভে করতে। এর মধ্যেই বিয়ে হয়। তারপর তামিলনাড়ুর কালাকাড মুন্দনতরাই টাইগার রিসার্ভে কাজ শুরু করি রিসার্চ বায়োলজিস্ট হিসেবে। এই সময়েই 'স্লেন্ডার লরিস' নামে এক ধরনের নিশাচর প্রাইমেটসের উপর কাজ শুরু করি। বাংলায় এদের 'লজ্জাবতী বানর' বলা হয় অনেক সময়, তবে এরা কিন্তু বিবর্তনচক্রে বানরের আগে এসেছে পৃথিবীতে। এদের নিয়ে তখনও সেভাবে কেউ কাজ করেননি, খালি আমেরিকা এবং জার্মানির চিড়িয়াখানায় কিছু কাজ হয়েছে। বনবিভাগের ফিল্ড বায়োলজিস্ট হিসেবে অন্য



পরীক্ষায় বিশেষভাবে সক্ষমদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে, এখন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে অধ্যাপনা করছেন মৌশ্রী। পেয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কার, সম্মান। 'আউটস্ট্যান্ডিং এমপ্লয়ি উইথ ডিজেবিলিটি' হিসেবে ২০১২ সালে স্টেট অ্যাওয়ার্ড পান। ২০১৪ সালে পান ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। এক বেসরকারি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে পুরস্কার নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে। পড়ানো ছাড়াও মৌশ্রীর আর এক প্যাশন হল লেখা। কবিতা লেখার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। নিজের জীবন নিয়ে লিখেছেন উপন্যাস, 'পদ্মপাতায় জল'। বললেন, ''অনেকেই এই উপন্যাস থেকে ছবি করতে চেয়েছেন। তবে নিজের জীবনটা এখনই একেবারে খোলা ডায়েরি করে দেওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।'' নাটকও লিখেছেন একাধিক। তাঁর লেখা বই 'এসেন্স অফ হিউম্যান ডিগনিটি ইন সোশ্যাল ফ্রেমওয়র্ক' প্রকাশ পেয়েছে গত বছর। পুরস্কৃতও হয়েছে, 'কনট্রিবিউশন ইন সোশ্যাল ওয়র্ক'এর জন্য। ''বইয়ের বিষয়টা খুব চ্যালেঞ্জিং,'' বললেন মৌশ্রী। ''বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জীবনেও রাইট টু প্রিভেসি রয়েছে, এ কথাই বলতে চেয়েছি। এ ব্যাপারে বিদেশের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোথায় তফাৎ, বোঝাতে চেয়েছি সেটাও।'' মৌশ্রীর জীবনের আর-এক মাইলফলক

বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জীবনেও রাইট টু প্রিভেসি রয়েছে

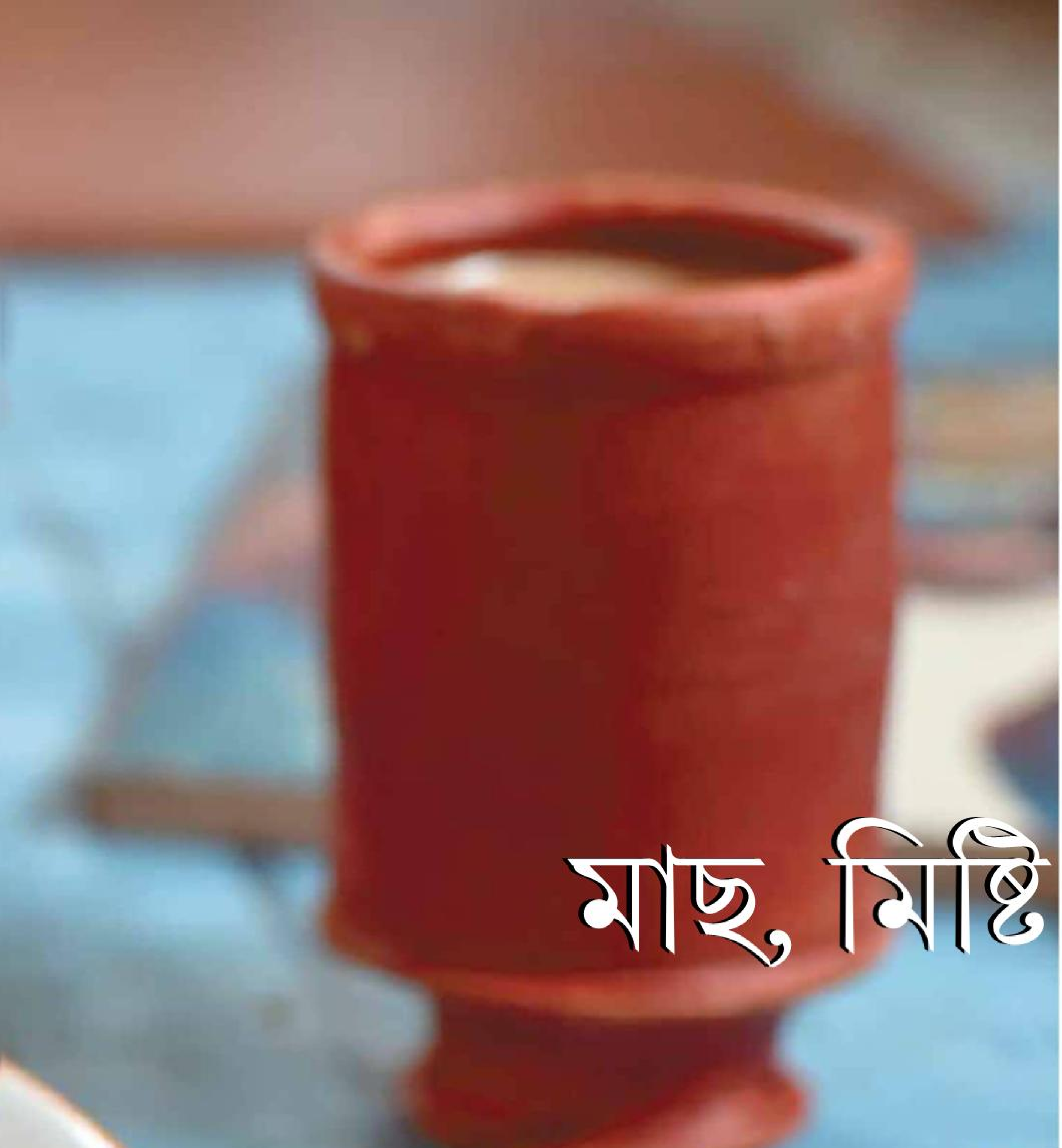
একশো শতাংশ দৃষ্টিহীনতাও দমিয়ে রাখতে পারেনি তাঁর জেদ আর পড়াশোনার প্রতি তীব্র ভালবাসাকে। অধ্যাপক মৌশ্রী বশিষ্ঠ-র সঙ্গে কথা বলে তাঁর জীবনের গল্প জেনে নিলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা, মনে জেদ আর বুকে সাহস থাকলে কোনও বাধাই যে জীবনে বাধ সাধতে পারে না, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন অধ্যাপক মৌশ্রী বশিষ্ঠ। একশো শতাংশ দৃষ্টিহীনতা নিয়েই পড়াচ্ছেন, লেখালেখি করছেন, জীবন বাঁচছেন নিজের শর্তে। শুরুটা অবশ্য এ রকম ছিল না। মৌশ্রী তখন স্কুলে পড়েন। হঠাৎই একদিন ক্যালেন্ডার দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। ''চিকিৎসক বললেন, এই অসুখের নাম 'রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা', যেখানে ভিশন সারফেসে পিগমেন্টস পড়ে ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার ডিজ়িজ়। বহু চিকিৎসককে দেখানো হয়েছিল। সকলেই বলেন, আমার একমাত্র পরিণতি অন্ধত্ব। তাই পড়াশোনা করিয়ে লাভ নেই।'' তখন থেকেই লড়াইয়ের শুরু মৌশ্রীর। স্কুল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক, লড়াই করে পড়াশোনার পর শিক্ষকতাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য তো আইন পড়তে হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবাকে বলা হয়, 'ও এত ভাল রেজ়াল্ট করেছে, কিন্তু ওকে ভর্তি নেব কী করে? ও তো দেখতে পায় না। কোনও দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কী হবে?' মেস-এ থেকে এলএলবি শেষ করেন মৌশ্রী। তারপর এলএলএম করে অধ্যাপনা শুরু করেন। চাকরির সঙ্গে সঙ্গেই পিএইচডি করেন। বিষয় ছিল, 'রাইট টু ডিগনিটি অফ দ্য ওম্যান উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু ডোমেস্টিক ওয়র্কার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: আ ক্রিটিক্যাল স্টাডি'। সোশ্যাল ওয়র্কে স্নাতকোত্তরও হন ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে— প্রথম হয়েই! পরবর্তীকালে কলকাতা পুলিশ ল ইনস্টিটিউট-এ পড়িয়েছেন। সম্প্রতি কলেজ সার্ভিস কমিশনের হল, 'হিউম্যান লাইব্রেরি' হিসেবে নির্বাচিত হওয়া। বুঝিয়ে বললেন, ''প্রতিটি মানুষই জীবনের চলার পথে কখনও ভেঙে পড়ে, কখনও অবসাদ আসে তার মনে। আমরা যেমন লাইব্রেরিতে গিয়ে, বই পড়ে নিজেদের সমৃদ্ধ করি, তেমনই কিছু মানুষের জীবনকে পড়ে, তাঁদের লড়াইয়ের গল্প জেনে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করা— এ-ই হল হিউম্যান লাইব্রেরির মূলমন্ত্র। ১৪জন মানুষকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। আমি কলকাতাকে রিপ্রেজ়েন্ট করেছিলাম। আমার জীবনের গল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল, 'ড্রিমস ক্যানট বি ব্লাইন্ডেড'।''

জীবনে ধাক্কা খেয়েছেন নানাদিক থেকে— আরজেইং করতে গিয়ে দৃষ্টিহীনতার 'অপরাধে' তিনমাসের মাথায় চাকরি থেকে বিতাড়িত হওয়াই হোক, বা জীবনের প্রথম ভালবাসার তাঁকে মাঝপথে ছেড়ে চলে যাওয়া। তেমনই আবার বহু মানুষ ভালবেসেছেন তাঁকে। ভরিয়ে দিয়েছেন সম্মান, পুরস্কার, ভালবাসায়। জীবনে এভাবেই পথ চলতে চান মৌশ্রী।



ক্র্যাব কিবেই



সুস্বাদু স্ন্যাকস যদি তৈরি হয় ঘরের হেঁশেলেই, তবে মন্দ কী? আর তা যদি হয় জিভে জল আনা মাছ মিষ্টির সমাহার, ভোজনরসিক বাঙালির আর কী চাই! এরকমই কিছু রেসিপির সন্ধান দিলেন ফাল্গুনী দত্ত বিশ্বাস।

মাছ, মিষ্টি *& more*

বৃষ্টি আর স্ন্যাকসের যুগলবন্দিতে বাঙালির বর্ষার সেলিব্রেশন নতুন নয়। সেই স্ন্যাকস অস্বাস্থ্যকর কেন হবে? বরং ঘরোয়াভাবেই চটজলদি তৈরি করে নিন সুস্বাদু স্ন্যাকস। ভরবে ভোজনরসিক বাঙালির পেট ও মন। ভালো থাকবে স্বাস্থ্যও। তাই এবার সানন্দার পাতায় রইল নিত্যনতুন স্ন্যাকসের বাহার।

ক্র্যাব কিবে

উপকরণ: ভেজানো ডালিয়া ১ বড়ো কাপ, কাঁকড়া কিমা ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ৪ টেবলচামচ, রসুনকুচি ৩ টেবলচামচ, লঙ্কাকুচি ২ টেবলচামচ, চিনেবাদাম খানিকটা, কর্নফ্লাওয়ার ৩ টেবলচামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, প্যানকো ব্রেডক্রাম্বস ১ কাপ, সাদা তেল, নুন ও চিনি প্রয়োজনমতো।

প্রণালী: প্রথমে ডালিয়া আর অল্প কিমা মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিন। এতে নুন, অল্প রসুনকুচি, পেঁয়াজকুচি, লঙ্কাকুচি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিন। এরপর প্যানে তেল গরম করে তাতে পেঁয়াজকুচি, রসুনকুচি দিয়ে ভাল করে ভেজে নিন। তারপর বাকি কিমা দিয়ে নেড়েচেড়ে, তাতে নুন, চিনি,



প্রন টোস্ট

লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিন। নামানোর আগে চিনেবাদাম ছড়িয়ে গ্যাস বন্ধ করুন ও ঠান্ডা করে নিন। ডালিয়ার মিশ্রণটা ফ্রিজ থেকে বের করে, কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিন। ডালিয়ার মিশ্রণটা হাতের তালুতে নিয়ে মণ্ড তৈরি করুন। তারপর সেই মণ্ডটার মাঝখানে কিমার তৈরি পুর ভরে গোল গোল আকারে গড়ে নিন। প্যানকো ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে তেলে ভেজে নিন। গরম গরম ক্র্যাব কিবে পরিবেশন করুন।

প্রন টোস্ট

উপকরণ: পাউরুটির টুকরো ৫-৬টা, চিংড়ির কিমা ১ কাপ, চিনি ১ টেবলচামচ, নুন স্বাদমতো, গোলমরিচগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, ডিম ১টা, ময়দা ২ চা-চামচ, তিল ১ চা-চামচ, মিহি আদাকুচি ২ টেবলচামচ, মিহি পেঁয়াজকুচি ১ চা-চামচ, মিহি লাল লঙ্কাকুচি ১ টেবলচামচ, মিহি ধনেপাতাকুচি ১ টেবিলচামচ, তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালী: তেল, তিল এবং পাউরুটি বাদে প্রত্যেকটি উপকরণ একটি পাত্রে ঢেলে মিশিয়ে নিন। এবার ১$^{১}/_{২}$ টেবলচামচ করে চিংড়ির কিমা প্রত্যেকটি পাউরুটির দু'পিঠে ভাল করে মাখিয় নিন। তার উপর তিল ছড়িয়ে দিন। প্যানে তেল গরম করে, সাবধানে পাউরুটির একটা পিঠ তেলে দিন। ভাজুন, যতক্ষণ না বাদামি রঙ আসে। এবার পাউরুটি উলটে দিয়ে অন্যপিঠটাও কড়া বাদামি করে ভেজে নিন। ভাজা টোস্ট তেল থেকে তুলে, পেপার টাওয়েলে রেখে অতিরিক্ত তেল ঝরিয়ে নিন। বাকি পাউরুটিগুলোও একইভাবে ভাজুন। সার্ভিং ডিশে



সাজিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন প্রন টোস্ট।

চিজ়ি ব্রকোলি ফ্রিটার্স

উপকরণ: গ্রেট করা ব্রকোলি ১ কাপ, রসুনগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, সেদ্ধ করা মিষ্টি আলু (কুরনো) ১/২ কাপ, মোজ়ারেলা চিজ় ১/২ কাপ, মাখন ১ চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স ১ চা-চামচ, পারমেজ়ান চিজ় ১ টেবলচামচ (বাদও দিতে পারেন), ডিম ১টা, অলিভ অয়েল ২ টেবলচামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন প্রয়োজনমতো।

প্রণালী: মাখনের মধ্যে কুরনো ব্রকোলি দিয়ে ভেজে ঠান্ডা করে নিন। এতে সেদ্ধ করা মিষ্টি আলু, রসুনগুঁড়ো, চিলি ফ্লেক্স, পারমেজ়ান চিজ়, ডিম, মোজ়ারেলা চিজ়, গোলমরিচগুঁড়ো আর নুন দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এই মিশ্রণ হাতের সাহায্যে গোল গোল চ্যাপটা করে গড়ে, অলিভ অয়েল ব্রাশ করা প্যানে ভেজে নিলেই তৈরি চিজ়ি ব্রকোলি ফ্রিটার্স।

স্পাইসি কর্ন দাবেলি

উপকরণ: দাবেলি ব্রেড ৪টে, দাবেলি মশলা ৩-৪ চা-চামচ, কর্ন পেস্ট ১ কাপ, আলুসেদ্ধ ১/২ কাপ, তেল ১ টেবলচামচ, তেঁতুলের টকমিষ্টি চাটনি স্বাদমতো, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন ও চিনি



চিজ়ি ব্রকোলি ফ্রিটার্স



স্পাইসি কর্ন দাবেলি



ফিশ বিয়ার ব্যাটার ফ্রাই

স্বাদমতো, লঙ্কা-রসুনের চাটনি প্রয়োজনমতো, রোস্ট করা পিনাট $^{১}/_{২}$ কাপ, ঝুরিভাজা $^{১}/_{২}$ কাপ, বেদানা ২ টেবলচামচ।
প্রণালী: প্যানে তেল গরম করুন। গরম তেলে কর্ন পেস্ট ও আলুসেদ্ধ দিন। তাতে একে একে দাবেলি মশলা, নুন, চিনি, লঙ্কার গুঁড়ো ও তেঁতুলের টকমিষ্টি চাটনি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার আঁচ কমিয়ে মিশ্রণটিকে একটু নেড়ে নিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিন। দাবেলি ব্রেড মাঝখান বরাবর কিছুটা কেটে নিন। তাতে রসুনের চাটনি ভাল করে মাখিয়ে নিন। কর্নের মিশ্রণ ব্রেডের মাঝখানে মাখিয়ে নিন। ব্রেডের উপরে তেঁতুলের চাটনি দিন। চারিদিকে ঝুরিভাজা ও বেদানা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন স্পাইসি কর্ন দাবেলি।

ফিশ বিয়ার ব্যাটার ফ্রাই

উপকরণ: বাসা মাছ ৫০০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো, গোলমরিচ $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, ময়দা ১ কাপ, আদাগুঁড়ো ১ টেবলচামচ, স্মোকড প্যাপরিকা ১ টেবলচামচ, ডিম ১টা (বড়), বিয়ার $^{১}/_{৩}$ কাপ, তেল প্রয়োজনমতো।
প্রণালী: এক ইঞ্চি চওড়া ও তিন ইঞ্চি লম্বা লম্বা করে মাছের টুকরোগুলো কেটে নিন। পেপার টাওয়েলের সাহায্যে মাছগুলোকে শুকনো করে মুছে নিন এবং নুন এবং গোলমরিচ মাখিয়ে রাখুন। বিয়ার ব্যাটার তৈরির জন্য ময়দা, আদাগুঁড়ো, প্যাপরিকা, নুন একসঙ্গে ফেটিয়ে নিন। তাতে কাঁচা ডিম দিয়ে অল্প অল্প চামচ মিশিয়ে পরে মিহি করে ফেটিয়ে



মৌরলা পেঁয়াজু

নিন। এবার এই ব্যাটারে একটা করে মাছ ডুবিয়ে তেলে ৩ থেকে ৪ মিনিট ধরে ভেজে নিন। তেল ঝরিয়ে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ফিস বিয়ার বাটার ফ্রাই।

মৌরলা পেঁয়াজু

উপকরণ: পরিষ্কার করে জল ঝরানো মৌরলামাছ ৩০০ গ্রাম, পেঁয়াজ (স্লাইস করা) ১ কাপ, কাঁচালঙ্কাকুচি ২ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ টেবলচামচ, আদা-রসুনবাটা ১ চা-চামচ, চালগুঁড়ো



১ টেবলচামচ, বেসন ৩-৪ টেবলচামচ, গরম করা তেল ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, ধনেপাতাকুচি ১/২ কাপ, নুন ও চিনি প্রয়োজনমতো।

প্রণালী: সমস্ত উপকরণ একসঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। কড়াইতে তেল গরম হলে মিশ্রণটা পিঁয়াজির মতো করে লাল লাল করে ভেজে তুলে নিন। তৈরি মৌরলা পেঁয়াজু।

মাশরুম ফিশ কেক

উপকরণ: নুন আর গোলমরিচ দিয়ে



মাশরুম ফিশ কেক

সেদ্ধ করা ভেটকিমাছের ফিলে ৩০০ গ্রাম, রসুন-লঙ্কার কিমা ২ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ২ টেবলচামচ, মাশরুমকুচি ৩ টেবলচামচ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবলচামচ, মাখন ২ টেবলচামচ, নুন ও চিনি স্বাদমতো।
প্রণালী: প্যানে $^{১}/_{২}$ চা-চামচ মাখন গরম করে তাতে একে একে রসুন-লঙ্কার কিমা, পেঁয়াজকুচি, মাশরুমকুচি, নুন ও চিনি দিয়ে ভেজে নিন। মিশ্রণটা ঠান্ডা হলে, সেদ্ধ করা মাছে মেশান। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর ছোট ছোট করে মিশ্রণ নিয়ে গোল গোল চ্যাপ্টা করে মাখনে ভেজে সাজিয়ে দিন মাশরুম ফিশ কেক।

গুজিয়া

গুজিয়ার ডো তৈরির উপকরণ: ডো তৈরির জন্য: সাদা ময়দা ১ কাপ (১২০ গ্রাম), ময়দা ১ কাপ (১২৫ গ্রাম), নুন $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, জল $^{১}/_{৩}$ থেকে ১/২কাপ, ঘি ২টেবলচামচ। পুর তৈরির জন্য: শুকনো রোস্টেড ওটস ১$^{১}/_{২}$ কাপ, খোয়াক্ষীর ১ কাপ, ঘি $^{১}/_{২}$ টেবলচামচ, কাঁচা বাদাম ১০টা, কাজু ১০টা, পেস্তা ১০টা, কিশমিশ $^{১}/_{২}$ টেবলচামচ, হিং $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, তেল প্রয়োজনমতো, কাঁচালঙ্কাকুচি সামান্য।
প্রণালী: সাদা ময়দা ও সাধারণ ময়দা, হিং



একটি পাত্রে ঢেলে নিন। প্যানে ঘি গরম করুন, যতক্ষণ না গলে যায়। প্রথমে চামচের সাহায্যে, তারপর হাত দিয়ে ঘি ময়দার সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিন। পরিমাণমতো জল দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এবার ডো-টাকে ৩০ মিনিটের জন্য ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।
প্রণালী: পুর তৈরির জন্য খোয়া কুরিয়ে নিন। বাদাম ও কিশমিশ মিহি করে কেটে নিন। খোয়াটা অল্প আঁচে নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না লেগে আসছে। গ্যাস বন্ধ করে, পুর সম্পূর্ণ ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিন। এরপর এতে শুকনো রোস্টেড ওটস, হিং, কাঁচালঙ্কাকুচি, বাদামকুচি ও কিশমিশ যোগ করুন। ডো-টাকে দুটো সমান ভাগ করে মাঝারি টুকরো করে কেটে নিন। তালুর সাহায্যে মাঝারি টুকরোগুলোকে বলের আকারে গড়ে, পাত্রের মধ্যে রেখে ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে

রাখুন। বেলনচাকির উপর কিছু ময়দা ছড়িয়ে দিন। ময়দার বলগুলোকে মাঝারি আকারের বেলুন। চারধারে জল ব্রাশ করুন। গোলের অর্ধেক অংশে ১ থেকে $১^{১}/_{২}$ চামচ খোয়া যোগ করুন। খুব বেশি পুর দেবেন না, নয়তো গুজিয়ার আকার দিতে অসুবিধা হবে, তেলে দিলে গুজিয়া ভেঙে যাবে। এবার সাবধানে দু'ধার জুড়ে, অল্প চেপে নিন। গুজিয়া বেক করলে গুজিয়া কাটারের সাহায্যে বাড়তি অংশগুলোকে কেটে নিন। ভাজলে অবশ্য বাড়তি অংশগুলোকে কাটবেন না, নাহলে পুর বেরিয়ে যেতে পারে। তার বদলে ধারগুলোকে ভাঁজ করে করে মুড়িয়ে নিন, তা হলে গুজিয়াগুলোকে দেখতেও সুন্দর হবে, তেলে ভাজতেও সুবিধা হবে। এইভাবে গুজিয়া তৈরি করে একটা পাত্রে রাখুন। ভেজা কাপড় দিয়ে গুজিয়া ঢেকে রাখুন, যাতে ডো-টা শুকিয়ে না যায়।
একটা প্যান বা কড়াইয়ে গুজিয়া ভাজার জন্য তেল গরম করুন। ভাজার আগে তেলের তাপমাত্রাটা দেখে নিন। তার জন্য একটি ডো তেলে দিন। যদি ডো-টা আস্তে আস্তে তেলের উপরে ভেসে ওঠে, বুঝবেন তেলের তাপমাত্রা ঠিক আছে। যদি ডো-টা উপরে না উঠে আসে বুঝবেন তেল ঠিকঠাক গরম হয়নি। যদি ডো-টা খুব তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসে, বুঝবেন তেল বেশি গরম হয়ে গেছে। তেল ঠিকঠাক গরম হয়ে গেলে গুজিয়াগুলোকে তেলে ছাড়ুন। একটা কড়াইয়ে বেশি গুজিয়া দেবেন না। ২ থেকে ৩টে করে গুজিয়া মাঝারি আঁচে ভাজুন। একটা পিঠ ভাজা হয়ে গেলে উলটিয়ে নিন এবং উলটো পিঠটাও কড়া করে ভেজে নিন। যতক্ষণ না গুজিয়ার রঙ বাদামি না হয় ততক্ষণ ভাজুন। এবার টিসুপেপারের সাহায্যে তেল ঝরিয়ে নিন। এইভাবে সমস্ত গুজিয়াগুলোকে ভেজে নিন। গুজিয়া সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে একটি এয়ারটাইট পাত্রে রেখে দিন। পরিবার ও অতিথিকে পরিবেশন করুন বাড়ির তৈরি গুজিয়া।
এইভাবেই ঝটপট বানিয়ে ফেলুন বর্ষার স্ন্যাকস।

যোগাযোগ : ৯০৩৮৮৯৫৪৫৬
সংকলনে: দেবলীনা অধিকারী, পৃথা বসু
ছবি: অভিজিৎ বিশ্বাস


গুজিয়া



আত্মবিশ্বাস ও আবেগের বাংলাদেশ

একটি রেখায় দু'টি দেশ মানচিত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আত্মায় সেই দেশের মানুষেরা একাত্ম। বাংলাদেশের সদ্য নির্মিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধন তাই এদেশের মানুষের কাছেও একটি বিশেষ উদ্‌যাপন। এই দিনটি কেন 'বিশেষ', অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন দেবদীপ পুরোহিত।

ইট-পাথর-স্টিল-সিমেন্ট দিয়ে তৈরি একটা সেতু একটা জাতির জন্য কী করতে পারে, গত মাসে পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের সময় বাংলাদেশ না গেলে জানতে পারতাম না। আপাত দৃষ্টিতে একটা সেতু এক ধরনের অবকাঠামো, যা একটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পদ্মা সেতুর উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের একুশটি জেলার সঙ্গে দেশের বাকি অংশের সংযোগ নিবিড়ভাবে স্থাপিত হয়েছে এবং তার অর্থনৈতিক সুফল কেবল ওই অঞ্চলের ৬ কোটি মানুষই নন, সারা


নির্মীয়মাণ পদ্মা সেতু (ফোটো : উইকিমিডিয়া কমন্স)

দেশের মানুষই ভোগ করতে পারবেন। খরস্রোতা পদ্মার পারে দাঁড়িয়ে ফেরির জন্য ঘণ্টার পর-ঘণ্টা অপেক্ষা না করে হুস করে ৬ মিনিটে এপার থেকে ওপার চলে যাওয়ার আনন্দে বাংলাদেশ আজ উদ্বেল। অর্থনীতিতে বৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত হবে, সেই স্বপ্নে বিভোর বাংলাদেশের বাংলাদেশের মন্ত্রী-আমলা। নিজের চোখে দেখে এসেছি পদ্মা জাতীয়তাবাদের সেই অনন্য নিদর্শন। সেতু উদ্বোধনের মাহেন্দ্রক্ষণে মন্ত্রীপরিষদের সচিব খান্দেকার আনোয়ারুল ইসলাম আবেগের তাড়নায় কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ কন্যা সাইমা ওয়াজেদকে নিয়ে প্রোটোকলের বেড়াজাল ভেঙে সেলফি তোলেন। লাখো-লাখো মানুষ পদ্মার দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন, কখন সেতু খুলে দেওয়া হবে সর্বসাধারণের জন্য। উদ্বোধনের স্মরণীয় মুহূর্তে নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের মাঝে চলে যুদ্ধবিমানের কসরত আর 'জয় বাংলা'-র অনুরণনে মুখরিত হয় পরিবেশ। বোঝার চেষ্টা করেছি, এত আবেগ, এত আনন্দ কেন? কেবল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি-র জন্য? অর্থনীতির বৃদ্ধির হার বেড়ে যাবে বলে বাঙালি জাতির এত উদ্বেল হওয়া? উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার বক্তব্যে উত্তরের একটা হালকা ছোঁয়া ছিল। ''অনেক বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে আর ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে প্রমত্তা পদ্মার বুকে আজ বহু-কাঙ্ক্ষিত সেতু দাঁড়িয়ে আছে। এই সেতু শুধু ইট-সিমেন্ট-স্টিল-লোহার কংক্রিটের



উদ্‌যাপনের নানা মুহূর্ত





বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় তৈরি হওয়ার কথা ছিল এই সেতুর, কিন্তু নানাবিধ বেনিয়মের অভিযোগ ওঠায় এই প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায় ওই সংস্থা, যা অবশ্যই ছিল চূড়ান্ত অপমানের।

একটি অবকাঠামো নয় এ সেতু আমাদের অহংকার, আমাদের গর্ব, আমাদের সক্ষমতা আর মর্যাদার প্রতীক। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবেগ, আমাদের সৃজনশীলতা, আমাদের সাহসিকতা, সহনশীলতা আর জেদ।'' ভুল বলেননি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। পদ্মা সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিকূলতা সামলাতে হয়েছে ওঁর সরকারকে। বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় তৈরি হওয়ার কথা ছিল এই সেতুর, কিন্তু নানাবিধ বেনিয়মের অভিযোগ ওঠায় এই প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ায় ওই সংস্থা, যা অবশ্যই ছিল চূড়ান্ত অপমানের। দেশের বিরোধীরা খোঁটা দিয়ে বলেছিল, 'এই সেতু ভেঙে পড়বে।' দুই যুগ আগে সেতুর পরিকল্পনা হলেও তা নির্মাণে দেরি হওয়ার কারণে মাঝে-মাঝেই গঞ্জনার সম্মুখীন হতে হয়েছে শেখ হাসিনার আওয়ামি লিগ সরকারকে। প্রতিকূলতার সামনে কিন্তু মাথা নত করেননি হাসিনা, নিজের টাকায়, নিজের সেতু নির্মাণ করেছেন বাংলাদেশের মানুষ। তাই বাংলাদেশের মানুষ সেতু উদ্বোধনের পরে সোচ্চারে বলেছেন, ''হ্যাঁ, আমরা পারি।'' এই দাবির মধ্যে মিশে আছে এক আলাদা আবেগ আর অভিমান, আর সেটাই পদ্মা জাতীয়তাবাদ।

বিগত ১১ বছরে কর্মসূত্রে বারবার বাংলাদেশ গিয়েছি। সিলেটের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, ঢাকার প্রাসাদোপম অট্টালিকা, চট্টগ্রামের আধুনিক বন্দর, কুষ্ঠিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি বা কক্সবাজারের সীমাহীন সৈকত—অনেক কিছুই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আমায় যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'বাংলাদেশ কেন আমায় মুগ্ধ করে,' তার উত্তরটা কিন্তু হবে বাংলাদেশের মানুষ আর তাদের আবেগ, যাতে মিশে আছে কিঞ্চিৎ অভিমান। 'দেশে এলেন, জানালেন না?' 'বাসায় এসে খেলেন না?' 'ঢাকা, চট্টগ্রাম করে চলে গেলেন, সুনামগঞ্জের হাওর দেখলেন না?'—আবেগ আর অভিমানে মোড়া এই প্রশ্নগুলো বারবার আমাকে অপ্রস্তুত করেছে। এই অতিথি পরায়ণতার কাছে বারবার আমাদের আবেগপ্রবণ ও দুর্বল হয়ে পড়তে হয়। ভারতবর্ষে পালিত হচ্ছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর। এই 'স্বাধীনতা'-র আড়ালে থাকা সব রক্তপাত, সংঘর্ষ, যন্ত্রণা, ক্ষয়ক্ষতি সব সহ্য করেছে দুই বাংলার মানুষ। ভিতরে-ভিতরে তাদের আবেগকে আজও বিচ্ছিন্ন করা যায়নি। তাই এদেশ থেকে কেউ সীমা পেরিয়ে ওদেশে গেলে বা ওদেশ থেকে কেউ এলে সবটাই 'নিজের লোকের ঘরে ফেরা' বলে মনে করে মানুষ। কষ্টের মতোই আনন্দও সমানভাবে বণ্টিত হয় তাদের মধ্যে। তাই সকলের সঙ্গে দেখা না করতে পারার অপরাধবোধ আমাকে বিষণ্ণ করেছে। হিসেব করে দেখেছি, সব পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হলে প্রায় ৪৫ দিন বাংলাদেশে থাকতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের যে মানুষদের চিনি, তাদের খুশি করতে হলে পরিব্রাজকের মতো ঘুরতে হবে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা এই দেশের আনাচকানাচে। খুলনা, রাজশাহী, কুয়াকাটা, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, বান্দারবান, সেন্ট মার্টিন বা কক্সবাজার—যেখানেই যান না কেন, নৈসর্গিক সৌন্দর্যই সব নয়। চিনতে হবে বাংলাদেশের মানুষ, আর তাদের অভিমানমিশ্রিত আবেগ। পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পরে কাজের সূত্রে কক্সবাজার যেতে হয়েছিল, আর সেখানেই সমুদ্রসৈকতে আলাপ হল ১৩ বছরের শাহিনের



কক্সবাজারের সমুদ্রসৈকতে নৌকার সারি



উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সঙ্গে। তাক লাগিয়ে দেওয়া সমুদ্রসৈকতে তখন সূর্যাস্তর সময়, হাতে একটা ক্যামেরা নিয়ে ছোট্ট ছেলেটি পর্যটকদের ছবি তুলে দিচ্ছে পাঁচ টাকার বিনিময়ে।
সংসারে অনেক অনটন বলে, ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলে কিছু রোজগার করার চেষ্টা করতে হয় ছোট্ট ছেলেটাকে। কিন্তু মুখে সরল হাসি আর তা দিয়ে অনর্গল কথাও বলে চলেছে শাহিন চাটগাঁইয়া ভাষায়। কলকাতার মানুষ জানতে পেরে তার চোখে-মুখে হাজার প্রশ্ন। পাসপোর্ট নেই, কিন্তু শাহিন কলকাতা ঘুরতে আসতে চায়। ঘুরতে আসার টাকা সঙ্কুলান কেমন করে হবে, তাও জানে না।
ফোন নম্বরটা দিয়ে বললাম ‘‘যদি কোনওদিন আসতে পারো, যোগাযোগ কোরো, কলকাতা ঘুরিয়ে দেব।’’ তেরো বছরের ছেলের সেই অনাবিল হাসি ভুলব না। তারপরেই চোখের নিমেষে শাহিন উধাও। ফিরে এল মিনিটদুয়েক পরে। হাতে দুটো চিপসের প্যাকেট।
‘‘আপনি অতিথি, খান,’’ দুটো প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল শাহিন। অনটনের সংসারে বড় হওয়া একটি ছেলের এই আতিথেয়তা মুগ্ধ করেছিল আমায় সেই সায়াহ্নে।
গত বছর কেরানিগঞ্জে ঘোষদের বাড়িতে এক দুপুরে এমনই আতিথেয়তার স্বাদ পেয়েছিলাম। ঢাকার ধানমুণ্ডিতে কল্লোলের বাড়িতে নৈশভোজের দাওয়াতে, বীথির তৈরি করা এত রকম পদ সামনে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল। সব খেতে পারিনি বলে দুই ভাবী-ই অভিমান করেছিলেন। কর্মব্যস্ততার এই আধুনিক সমাজে আশপাশের মানুষ যখন অতিথি আসার খবরে প্রমাদ গোনেন, বাংলাদেশের মানুষের অতিথিবাৎসল্য প্রত্যেক বার আমায় নতুন করে অবাক করেছে। বাড়িতে ডেকে না খাওয়াতে পারার আক্ষেপ রান্না করে খাবার পৌঁছে দিয়ে মিটিয়েছেন এক নতুন বন্ধু। তার সামনে সব খাবার খেয়ে এবং পরেরবার তার বাড়িতে যাব এই অঙ্গীকার করার পরেই মুক্তি পেয়েছি।
অতিথির প্রতি এই অধিকারবোধের মধ্যে একটা আবেগ আছে, ঠিকমতো করে না খেতে পারলে বুকভরা অভিমানের সামনে দাঁড়াতে হয়। অভিমান আর আবেগে মোড়া এটাই বাংলাদেশ। যে দেশের মানুষ ইট-পাথর-সিমেন্ট-স্টিলের তৈরি সেতু নিয়ে আবেগে ভাসেন। যারা দেশের ক্ষমতা নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন, তাদের অভিমানভরা গলায় জানিয়ে দেব, ‘‘হ্যাঁ, আমরাও পারি।’’
সত্যিই বাংলাদেশ পারে।
ছবি: লেখক



মাতৃত্ব আর সিনেমা অবলীলায় সামলাচ্ছেন তিনি। নতুন ছবি ‘ধর্মযুদ্ধ’ মুক্তির আগে খোলামেলা আড্ডায় শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। মুখোমুখি মধুরিমা সিংহ রায়।

“কোনও চরিত্রের এফেক্ট থেকে গেলে ভাল লাগে”

অনেকদিন আগে ‘ধর্মযুদ্ধ’র ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু কোভিড-লকডাউন পেরিয়ে অনেকটা সময় লেগে গেলেও অবশেষে মুক্তি পেল। কেমন লাগছে?

হ্যাঁ, অবশেষে রিলিজ় হচ্ছে। দু’বার রিলিজ় হতে হতে আটকে গিয়েছিল ছবিটি। এবার থার্ড টাইম। তাই মনে মনে খুব এক্সাইটেড!

‘ধর্মযুদ্ধ’ নামটা শুনেই হয়তো অনেকে ভাববেন এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ছবি। বিশেষত এখন চারদিকে যেভাবে ধর্ম নিয়ে অস্থিরতা। কিন্তু তা তো নয় শুধু...

এটা মনুষ্যত্বের ছবি, হিউম্যানিটির ছবি। যাঁরা শিখতে চায়, যাঁদের মনের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন থাকে, তাঁরা এই ছবি থেকে হয়তো প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবেন। একজন মানুষ যখন জন্মান, তখন তো সে জানে না তার ধর্ম কী, জাত কী, পদবি কী। আজ ইউভান কিন্তু জানে না ও খ্রিস্টান, না পার্সি, না হিন্দু না মুসলিম...আমরা ওকে বলব তারপর ও সেই ধর্মের নিয়ম পালন করবে। কিন্তু এখন ও শুধুই একজন মানুষ। আর আমাদের জার্নি যখন শেষ হয়ে যাবে, আমরা শেষ বিছানায় শুয়ে থাকব, তখনও আমাদের পরিচয় শুধু মানুষই। এই ছবির গল্প এই বার্তা নিয়ে।

‘পরিণীতা’র পরে ‘ধর্মযুদ্ধ’। অভিনেত্রী হিসেবে বারবার নিজেকে ভাঙছেন। দর্শকদের প্রত্যাশাও বাড়ছে...

‘মুন্নি’ (‘ধর্মযুদ্ধ’ ছবিতে চরিত্র) হিসেবে আমাকে দেখার পর সেই প্রত্যাশাটা আরও বাড়বে মনে হয়। সেই চেষ্টাই আমরা করেছি। ২০১৯-এ শুট করেছিলাম। সে সময়ে আমি প্রেগন্যান্ট ছিলাম না। ওই সময়ে দাঁড়িয়ে একজন ন’মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার চরিত্র

করা মোটেও সহজ বিষয় ছিল না। একজন প্রেগন্যান্ট মহিলা কীভাবে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও তার সন্তানকে বাঁচায়, সেই নিয়ে গল্প। যখন বেঁচে থাকাটাই গুরুত্বপূর্ণ, তখন কী আর তার জাত-ধর্ম কিছু মনে থাকে! আরও একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল এই ছবির ডায়লেক্ট। কখনওই এরকম উচ্চারণে কথা বলিনি আগে। প্রথম প্রথম খুব টেনশনে থাকতাম, পারব কিনা। রাজ খুব সাহায্য করেছে। বলেছিল, শুটিংয়ে ওই টোন না এলেও, ডাবিংয়ে শুধরে নিতে পারব। ওই চাপটা চলে যাওয়ায়, খোলামনে অভিনয় করতে পেরেছি। আর ছবিতে কতজন পাওয়ারফুল অভিনেতা...স্বাতীলেখাদি, ঋত্বিকদা, সোহম, পার্নো। ছবিটা যেরকম সকলের বেঁচে থাকার গল্প বলে, শুটিংয়েও আমরা সেভাবেই সকলে একে অপরের পারফরম্যান্স দিয়ে সারভাইভ করার চেষ্টা করছিলাম। একটা ঘরের মধ্যে অনেকটা অংশ শুটিং হয়েছে। সেখানে এতজন বাঘা-বাঘা অভিনেতা। পুরো থিয়েটারের মতো লাগত। এই অভিজ্ঞতা সারাজীবন মনে রাখার মতো।



“কোনও স্ক্রিপ্ট শোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাকে একটা ‘কিক’ দেয়, তাহলে হ্যাঁ বলে দিই। সাধারণত আমি স্ক্রিপ্ট এক লাইন শুনেই বলি আমি করব। যদি বলি, একটু সময় দিতে, তাহলে ওই স্ক্রিপ্টের মধ্যে সেই স্পার্ক নেই। বাণিজ্যিক ছবির স্ক্রিপ্ট শুনেও যদি এই ‘কিক’ পাই, তাহলে হ্যাঁ বলব।”

ডায়লেক্টের জন্য ওয়র্কশপ করেছিলেন?

হ্যাঁ ওয়র্কশপ করেছিলাম। এছাড়া আমার নিজস্ব প্রসেস আছে প্রস্তুতির। আর যখন সেটে থাকি, এক-দু'দিনের মধ্যেই ওই চরিত্রে ঢুকে পড়ি। ওই মেক-আপ, পরিবেশ, পোশাক সবমিলিয়ে আমি ওই চরিত্রটা হয়ে উঠি।



এই ছবি মাল্টিস্টারার। একসঙ্গে একাধিক অভিনেতা থাকলে কি কোনও চাপ থাকে বাকিদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার? বা নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার?

ওই যে বললাম, একে অপরের পারফরম্যান্সের মধ্যে সারভাইভ করতে হবে (হাসি)। কিন্তু কখনওই মনে হয় না, কারওর চেয়ে কাউকে ছাপিয়ে যেতে হবে। কারণ, আমি মনে করি একটা দৃশ্য তখনই ভাল হয় যখন একাধিক শিল্পী সমষ্টিগতভাবে খুব ভাল কাজ করেন। শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবলে চলবে না। তবে মনে হত, যাঁদের সঙ্গে পারফর্ম করছি, তাঁদের যেন লেট ডাউন না করি।

রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকেন বলে সেটে পরিচালক হিসেবে মেলাতে কখনও অসুবিধে হয়?

না একেবারেই নয়। রাজকে আমি অনেকবছর ধরে চিনি। প্রথম থেকে ওকে একজন পরিচালক হিসেবেই পেয়েছি। আমি জানি ওর এনার্জি কীরকম থাকে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হওয়ার পরে হয়তো ওকে আরও ভালভাবে চিনতে পেরেছি, ওর প্যাশনটা বুঝতে পেরেছি। আর আমি প্রফেশনালিজ়মে বিশ্বাস করি। আমি নিজে একজন ডিরেক্টরস আর্টিস্ট। আমি যখন অভিনয় করতে যাই, তখন এক সেকেন্ডের জন্যও মানুষটার দিকে তাকিয়ে মনে হয় না ও আমার হাজ়ব্যান্ড। অনেকে ভাববেন বানিয়ে বলছি, কিন্তু এটাই সত্যি। ওর ক্ষেত্রেও সেটাই। আর এরকম যতদিন থাকবে, ততদিনই নিজেদের সেরা কাজটা দিতে পারব।

রাজ সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত। এই ছবিতে আপনার সহকর্মী সোহম, পার্নোও। এঁদের থেকে কখনও পরামর্শ পেয়েছেন রাজনীতিতে আসার?

না। কাজ করি যখন রাজনীতি নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। আমার রাজনীতিতে জয়েন করা নিয়ে পরামর্শও পাইনি।

‘পরিণীতা’র পরে আবার ঋত্বিকদার সঙ্গে কাজ করলেন...

এই ছবিতে আমার বিপরীতে সপ্তর্ষি। ঋত্বিকদার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এই ছবিতে। তবে প্রথম দিন যখন ঋত্বিকদা ঢুকছিল, আমার মনে হল এই তো বাবাইদা আসছে! আমি স্বাতীদির সঙ্গে প্রথম কাজ করলাম। এত থিয়েটার দেখেছি ওঁর, সেখানে একসঙ্গে অভিনয় করা বিশাল পাওনা। প্রথমদিনের শুট ছিল ওঁর সঙ্গে, টেনশনে ছিলাম। বাট শি ওয়াজ় সো মডেস্ট, সো ডাউন টু আর্থ। একজন মানুষ এই বয়সেও কী এনার্জেটিক! খুব মিস করছি ওঁকে।

কোনও চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গেলে সেখান থেকে বেরতে তো সময় লাগে...

আমি একটু মেথড অ্যাক্টিং করি। আমার ভাল লাগে কোনও চরিত্রের এফেক্ট যদি থেকে যায়। একটা চরিত্রে ঢুকে গিয়ে তাকে ফিল করতে ভাল লাগে। হয়তো আমি কোনও ইমোশনাল সিন করছি। কিন্তু আমার জীবনে ঘটা কোনও খারাপ ঘটনার কথা ভেবে আমি ওই সিন করি না। যখন বাবাইদা চলে গিয়েছে, মেহুল বাবাইদার জন্যই কেঁদেছে। দ্যাট ওয়াজ় নট অ্যাট অল মি। আমার কোনও কথা ভেবে কাঁদিনি। আমরা নিজেদের জীবনেও এক-একটা ভূমিকা প্লে করি। যদি

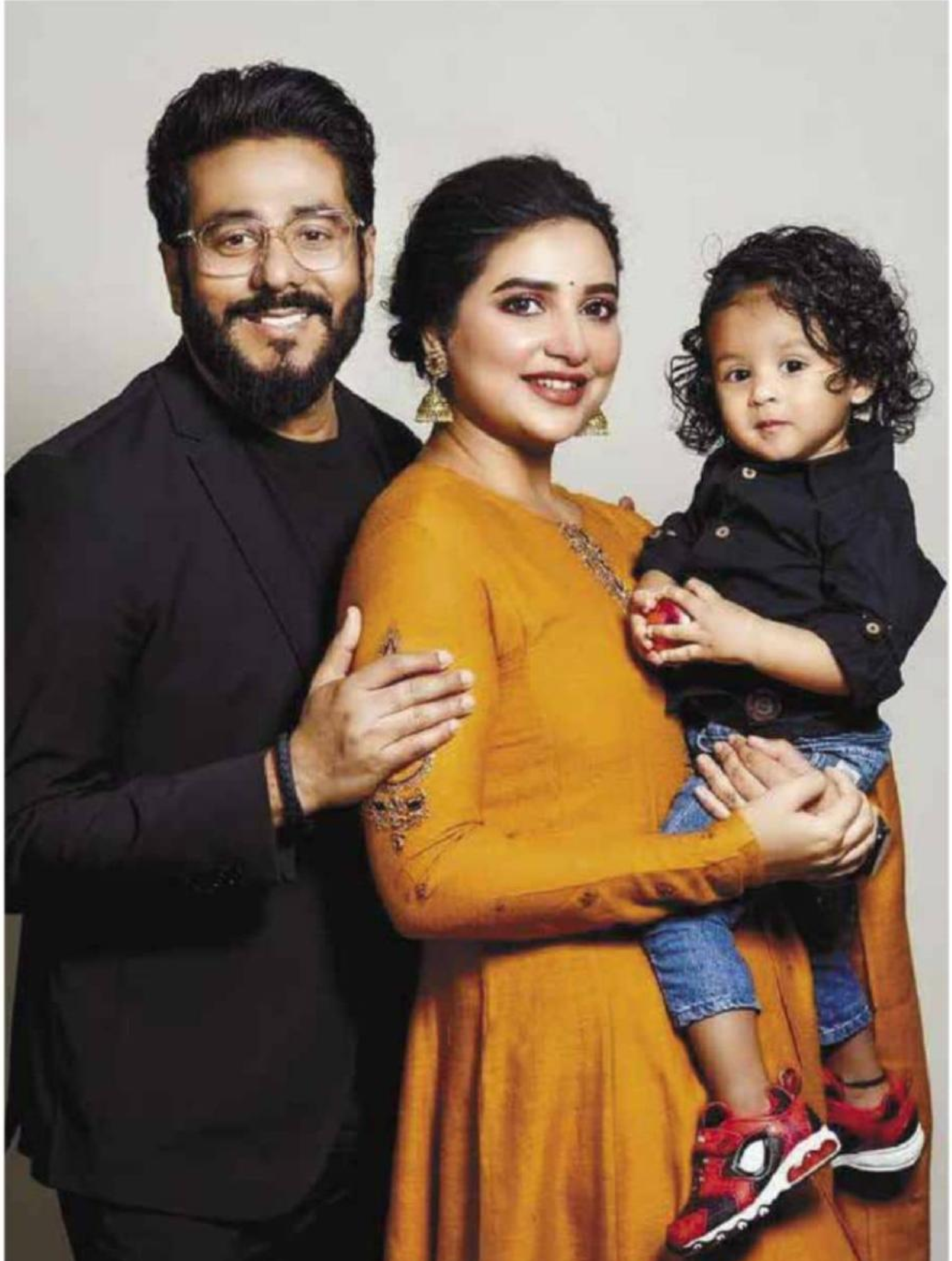
কাজটা ভাল না হয়, অবশ্যই আমার মন খারাপ হবে। কিন্তু সেটা আমি ছেলের সামনে দেখাতে পারব না। আমরা ওভাবে অভ্যস্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটা শিখে গিয়েছি। আমি যখন শুটের জন্য বাড়ি থেকে বেরই, ওই চরিত্র হয়ে বেরই।

একটা সময়ে আপনি বাণিজ্যিক ছবির অন্যতম সফল নায়িকা ছিলেন। এখন কনটেন্ট-ধর্মী চরিত্রেও একইরকম সফল। এরপরের কাজের নিরিখে কি কনটেন্টকেই প্রাধান্য দেবেন বেশি?

কোনও স্ক্রিপ্ট শোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাকে একটা 'কিক' দেয়, তাহলে হ্যাঁ বলে দিই। সাধারণত আমি স্ক্রিপ্ট এক লাইন শুনেই বলি আমি করব। যদি বলি, একটু সময় দিতে, তাহলে ওই স্ক্রিপ্টের মধ্যে সেই স্পার্ক নেই। বাণিজ্যিক ছবির স্ক্রিপ্ট শুনেও যদি এই 'কিক' পাই, তাহলে হ্যাঁ বলব। এরপর 'বিসমিল্লা' আসছে। পুজোয় 'বৌদি ক্যান্টিন' আসছে। 'ডক্টর বক্সী' দিওয়ালিতে রিলিজ় হবে বোধহয়। শুটিং করছি 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর, ওয়েব সিরিজ়। পুজোর পরে ইন্দ্রদীপদার নতুন ছবি 'মেঘপিওন'-এর শুটিং শুরু হবে।

আপনি এখন ওয়র্কিং মাদার। দিনলিপি কীরকম?

স্ট্রেস আমি খুব একটা নিই না। মন থেকে যদি কোনও কিছু করতে চাই, তার জন্য বেশি এফর্ট দিতে হয় না। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কাজ-সন্তান কীভাবে এত সহজে সামলাই! কিন্তু ওই মনের ইচ্ছে থাকলেই সব হয়। ফিক্সড রুটিন নেই। এতক্ষণ যেমন বাড়িতে মেক-আপ করছিলাম (সাক্ষাৎকারের দিন), ইউভান আমার সঙ্গেই ছিল। আমার টিমের সবার সঙ্গে নাচ-গান করছিল, খেলছিল। তারপর আমি বেরলাম, এখন ও ঘুমোবে। সন্ধেটা হয়তো আজকে আমাকে পাবে না। কিন্তু ও-ও অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে আমার রুটিনে। ও-ও জানে বাবা-মা কাজে বেরয়। ও-ও এমন ভাব দেখায়, 'আমিও ব্যস্ত, আমারও তোমাদের দরকার নেই (হাসি)'।



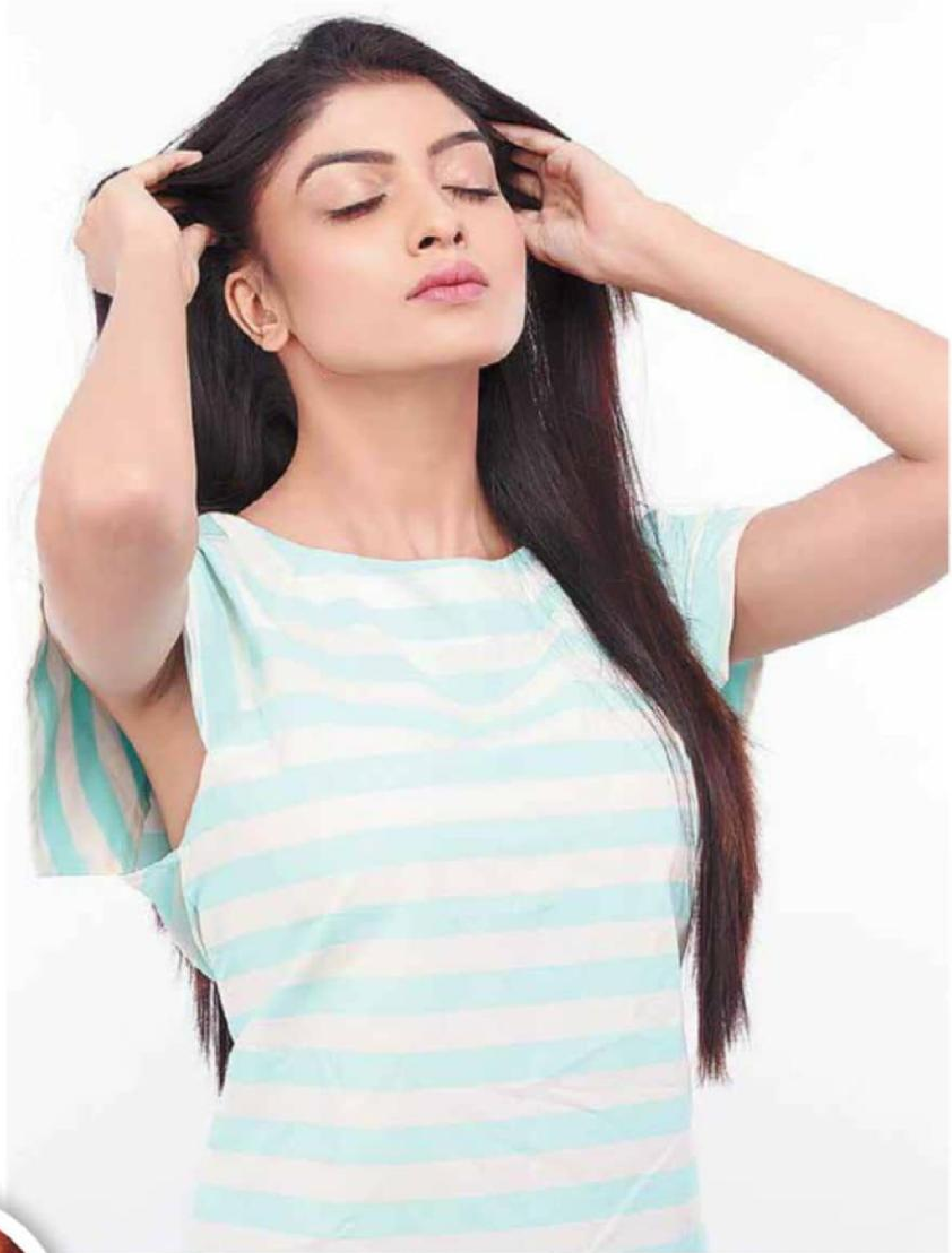


আপনারা দু'জনেই পাবলিক ফিগার। সেই সুবাদে ইউভানও প্রথম থেকেই লাইমলাইটে। ওকে স্বাভাবিক শৈশব দেওয়ার জন্য সচেতনভাবে কোনও চেষ্টা থাকে?

লাইমলাইট থাকবেই। ও এমন পরিবারে জন্মেছে, যেটা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আলাদা করে লাইমলাইটে ওকে রাখা বা না রাখার জন্য কোনও কনশাস এফর্ট দিইনি। হি লিভস আ ভেরি সিম্পল লাইফ। আমরা খুব সাধারণ জীবনযাপন করি। ও-ও সাধারণ জীবনই যাপন করবে। কাজ করি, বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাই। আর-পাঁচজন সাধারণ বাবা-মায়ের মতোই নিজেদের মুহূর্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করি। আমাদেরটা বেশি হাইলাইটেড হয়, এই যা। ও টিভিতে এখন আমাকে দেখে চিনতে পারে (হাসি)। বলে 'ও মাম্মাজি, মাম্মাজি'। রাস্তায় অন্য কারওর হোর্ডিং দেখেও ওটাই বলে (হাসি)। একটু চিনতে শিখেছে আর কী।

মা হওয়ার পরে কাজে ফেরা চ্যালেঞ্জিং ছিল?

একটা গিল্ট ফিলিং হত। ওকে ছেড়ে থাকতে একটু কষ্ট হত। প্রথম প্রথম বেরতেই ইচ্ছে করত না। ইউভানের সাত মাস বয়স থেকে আমি বেরচ্ছি। এখনও খুব বেশি সময় কাজ করলে বাড়ির দিকে মন চলে যায়। এখন নির্দিষ্ট সময়ের পরে কাজ করিও না।





চুলের যত্নআত্তি

চুল ভাল রাখা মুখের কথা নয়! কোন ধরনের সমস্যায় কীভাবে যত্ন নেবেন, কোন কোন উপকরণ বাদ দেবেন, পরামর্শ দিলেন রূপ বিশেষজ্ঞ শেহনাজ় হুসেন।

আমার বয়স ৩৫। চুল স্ট্রেট, মাঝারি দৈর্ঘ্যের। আমার সমস্যা হল, আমার স্ক্যাল্পে প্রচুর ঘাম হয়। ফলে চুলে শ্যাম্পু করার পরের দিনই প্রচণ্ড তেলতেলে হয়ে যায় এবং চুলে দুর্গন্ধও হয় তাড়াতাড়ি। ঘাম কমানোর বা চুল এবং স্ক্যাল্প দুর্গন্ধমুক্ত রাখার কোনও উপায় রয়েছে কি? জানালে বাধিত হব।
সায়ন্তনী সরকার, বাঘাযতীন

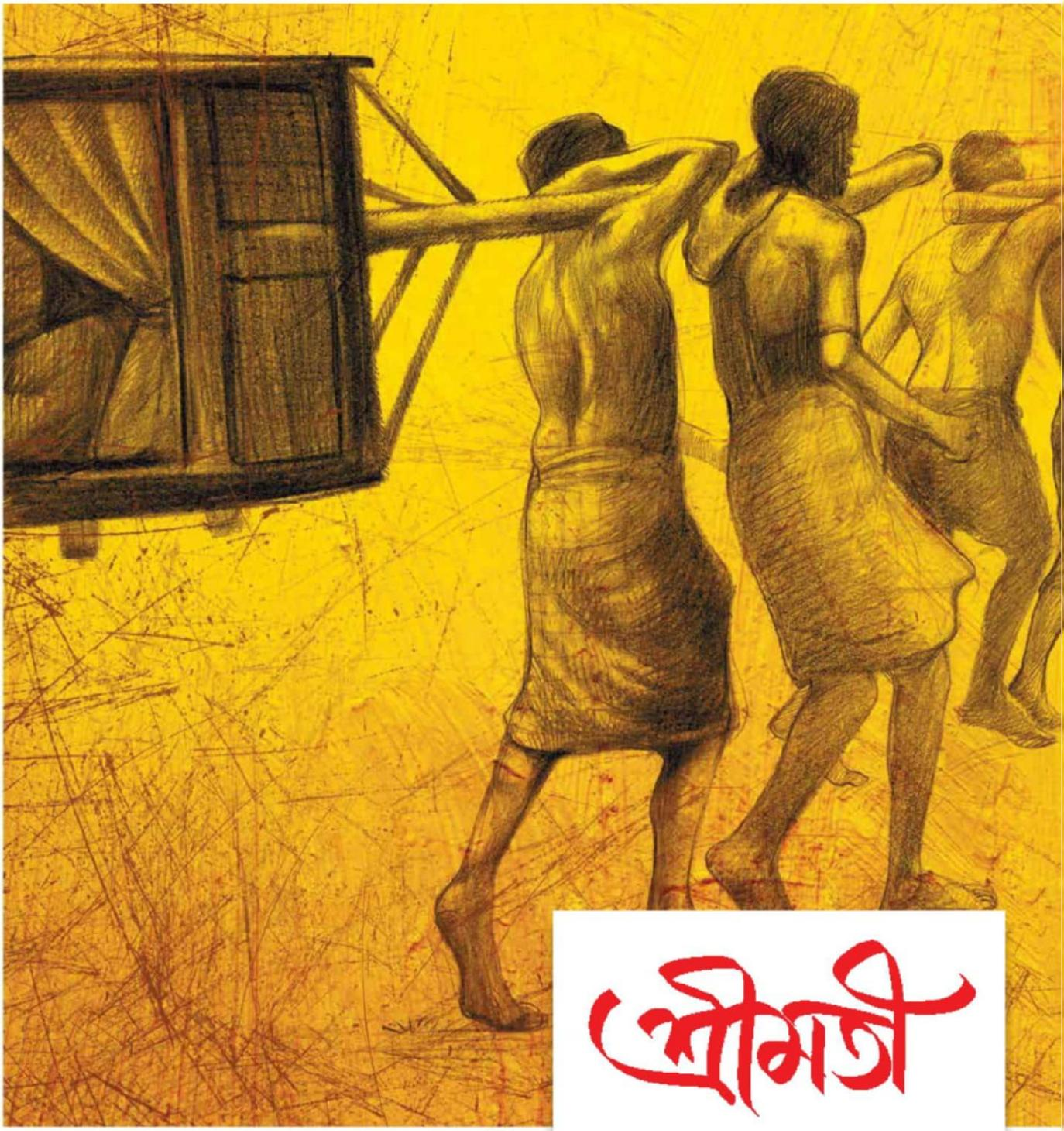
আপনি অল্প শ্যাম্পু ব্যবহার করে নিয়মিত চুল ধোওয়া অভ্যেস করুন। সত্যি বলতে কার কতটা ঘাম হবে, এটা বিভিন্ন শারীরিক এবং লাইফস্টাইলগত কারণের উপর নির্ভর করে এবং সেই পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো সহজ নয়। তার চেয়ে বরং চুল এবং স্ক্যাল্প পরিষ্কার রাখার কাজটা সহজ। প্রতিদিন এক টাকার কয়েনের সমান মাইল্ড শ্যাম্পু অল্প জলে গুলে পাতলা করে তা দিয়ে স্ক্যাল্প এবং চুল মাসাজ করুন। খুব বেশি ফেনা হতে হবে না। শ্যাম্পু করার পর চুল ধোওয়ার জন্যও এমন জল ব্যবহার করুন, যা বাড়তি সুগন্ধ আনবে চুলে। আধকাপ গোলাপজলে একটা পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নিন। পুরোটা এক মগ জলে মিশিয়ে তা দিয়ে শেষ বার চুল ধুয়ে নিন। অথবা পছন্দের পারফিউম বা কোলনের কয়েক ফোঁটা জলে মিশিয়ে তা দিয়েও চুল ধুতে পারেন। এতে স্ক্যাল্পে কুলিং এফেক্টও পড়বে। শ্যাম্পুর পর কন্ডিশনার এবং সেরাম লাগাতে ভুলবেন না।



আমার বয়স ৩০। চুল স্বাভাবিকের থেকে শুষ্ক প্রকৃতির। চুল নিয়ে এমনি কোনও সমস্যা নেই তেমন। তবে একটা প্রশ্ন রয়েছে। অনেক প্রাপ্তবয়স্ককেই দেখি শ্যাম্পু হিসেবে বেবি শ্যাম্পু ব্যবহার করছেন তাঁরা। মাইল্ড শ্যাম্পু হলেও, এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে আমার। প্রাপ্তবয়স্কদের চুলে কি এই ধরনের শ্যাম্পু কাজ করে? সকলে বলেন, এই শ্যাম্পুতে চুল পরিষ্কার হয় অথচ কোনও ক্ষতি হয় না। একথা কি সত্যি?
অর্পিতা ঘোষ, ই-মেল মারফৎ

হ্যাঁ, অনেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই চুলে বেবি শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, কারণ প্রথমত এগুলো সাধারণ শ্যাম্পুর তুলনায় মাইল্ড হয় এবং চুলের পক্ষেও অনেক নিরাপদ। ক্ষতিকর কেমিক্যালের ব্যবহার বেবি শ্যাম্পুতে প্রায় থাকেই না। প্যারাবেন বা সালফেটের কথা শুনে থাকবেন। এগুলো চুলের পক্ষে ভাল নয়, তবে সাধারণ শ্যাম্পুতে অনেকসময়ই উপকরণের তালিকায় এদের নাম থাকে। বেবি শ্যাম্পুতে সাধারণত এই ধরনের উপকরণ থাকে না। ফলে সব দিক থেকে এটি বেশ নিরাপদ অপশন। আপনি বলেছেন, আপনার চুল স্বাভাবিক থেকে শুষ্ক প্রকৃতির। এই ধরনের চুলে, বা যাঁদের চুল খুব শুষ্ক, তাঁদের জন্য বেবি শ্যাম্পু সত্যিই ভাল অপশন। আর এগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের চুলেরও সমান উপকার করে। তবে, এখন অনেক ব্র্যান্ডই প্যারাবেন এবং সালফেট-ফ্রি শ্যাম্পু বানাচ্ছে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। এগুলো ব্যবহার করলেও চুলের ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন পাঠান: sananda@abp.in



শ্রীমতী

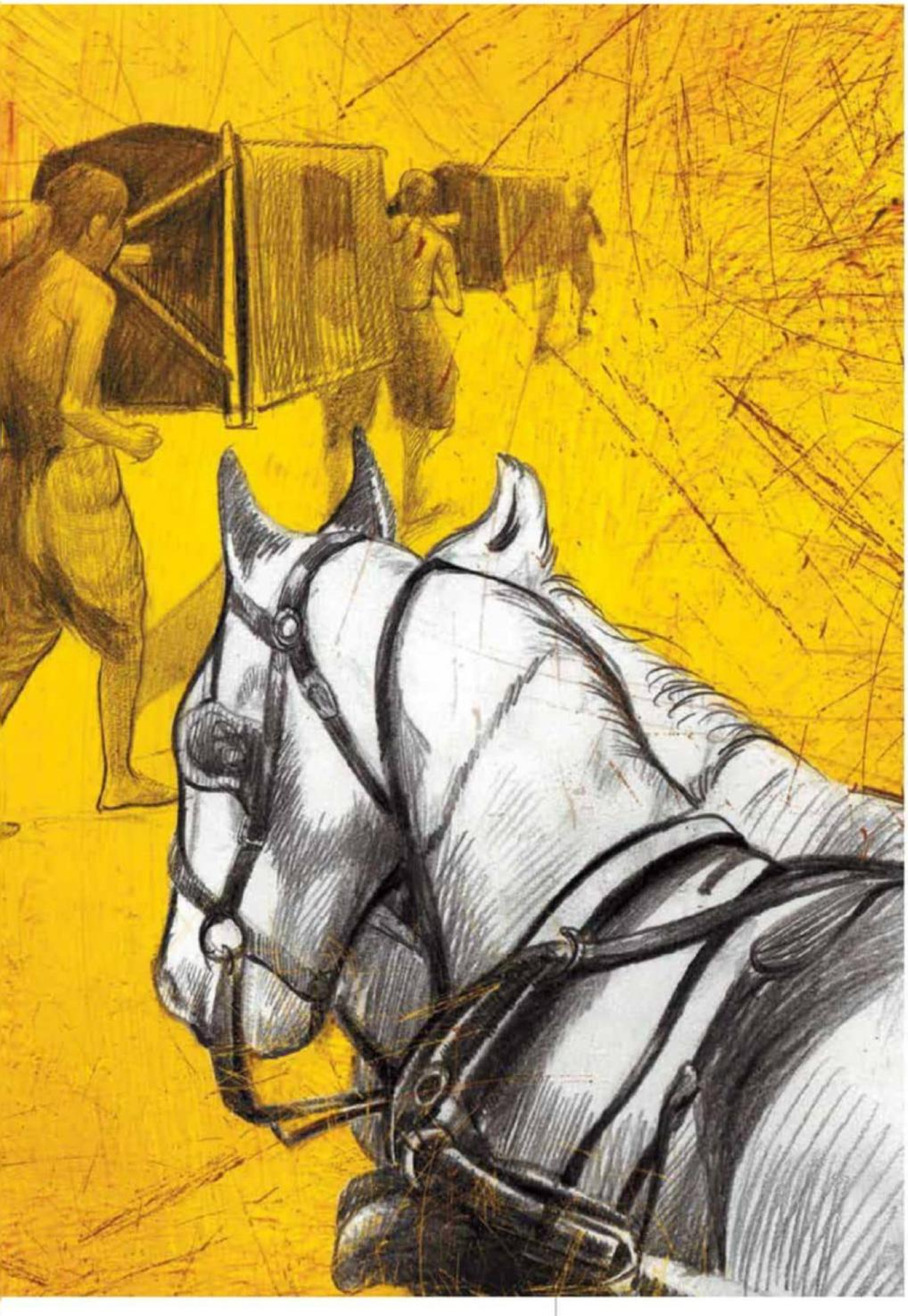
তাপস রায়

আগের ঘটনা

আসরে গান ধরে, শ্রীমতী আর মহানন্দকে মুগ্ধ করে দেন রামনিধি ও মোহনচাঁদ। শ্রীমতী মোহনচাঁদকে বলে, যখন ইচ্ছে তার কাছে চলে আসতে। আখড়াই গানের দল খোলার কথা মাথায় ঘুরতে থাকে রামনিধির। বাগবাজার ও শোভাবাজার একত্র করেই দল খুলতে চান তিনি। শ্রীমতীকে খবর দিতে গিয়ে, তার ব্যবহারে বৈলক্ষণ্য দেখেন তিনি। পরদিন তাঁকে বাড়িতে ডেকে, ক্ষমা চায় শ্রীমতী। তারপর...

{৪}

"কেন কী করেছ তুমি, শ্রীমতী?"
"নিধুবাবু, কাল যে আমি তোমার প্রেমে সন্দেহ করেছি। তোমাকে কষ্ট দিয়েছি।"
"না না, শ্রীমতী। তোমার মতো রূপে, গুণে ঐশ্বর্যশালিনী একজন নারীর সান্নিধ্য আমি যে পাই, তাতেই তো ধন্য হই। বরং আমি



তো মনে মনে মরে থাকি বন্ধু রাজা মহানন্দ রায়ের কাছে। তুমি তাঁরই সম্পদ, আমি সে সম্পদ চুরি করছি।”

“তিনি আর নেই বাবু। গতকালই খবর এসেছে রাজা মহানন্দ রায় আমাদের মায়া ত্যাগ করে পরম ব্রহ্মে লীন হয়েছেন। বাবু, সেজন্য গতকাল আমি নিজের ভেতর ছিলাম না। এক নিঃসঙ্গ বিধবাকে নতুন জীবন দেওয়া, তার জীবনকে সাজিয়ে দেওয়া। বাবু, আমার খুব মনে পড়ছে যে!’’

শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, স্মার্ত পণ্ডিত রাধাবিনোদ ভট্টাচার্য, স্ত্রীর হাতের ঢালতে থাকা জলধারায় হাত-পা-মুখ প্রক্ষালন করতে করতে উচ্চৈঃস্বরে মনুর শ্লোক উচ্চারণ করছিলেন, “অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী /দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা উর্ধ্বং রজঃস্বলা।”

“শুনহ হে শ্রীমতীর মা, একেবারে রাজযোটক। আমাদের ভট্টাচার্য পরিবারের পালটি ঘর। এ-ও রাঢ়ি ব্রাহ্মণ।”

শ্রীমতীর মা একবুক ঘোমটা টেনে রেখেছেন। তাঁর কথা বলা মানায় না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছেন। হাতের বাউটি, চুড়ির ঝম ঝম শব্দে খুশি জানান দিচ্ছেন। শ্রীমতীর মা জানেনই তো তাঁর কর্তা খুব করিৎকর্মা। কাশম বাজারের জমিদার মহারাজ লোকনাথের দরবারে মুহুরির কাজ করেন। আগে কিছুদিন ছিলেন নবাবের দরবারে এক ইংরেজের মুনশি। শুধু তো সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত বলে রাধাবিনোদের দর, তা নয়। ফার্সি ভাষা না জানলে কি রাজ দরবারে হিসেবরক্ষকের চাকরি জুটত! না, জুটত না। তখন হয়তো টোল খুলে বসতে হত পণ্ডিতমশাইকে। সেই পণ্ডিতের এত দর হত না। মাঝে মাঝে তো বৃষ্টিবাদলার দিনে রাজবাড়ির পালকি এসে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায় পণ্ডিতমশাইকে!

শ্রীমতীর মা জানেন তাঁর কর্তাকে রাজামশাইও খুব খাতির করেন তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য। তিনি মুখ্যু মেয়েমানুষ, কোন কথার কী উত্তর, জানবেনই বা কী! ফলে একদম শুরু থেকেই তিনি চুপচাপ থাকেন। তবে পণ্ডিতমশাইয়ের চোখে তাঁর স্ত্রী হচ্ছে স্বর্গের অপ্সরা। ফলে সুযোগ সুবিধা পেলেই তিনি চারটি গহনা দিয়ে সেই অপ্সরাকে সাজিয়ে তোলেন আর নিজেই মুগ্ধ হয়ে দেখেন।

মায়ের বরন, গড়ন, সব পেয়েছে মেয়ে। একেবারে ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো ঘর আলো করে থাকে। আর সে কথা ভট্টাচার্যমশাই দিনান্তে একবার রাজাবাবুর কানে তোলেন। সুন্দরী মেয়েটার বিবাহ হচ্ছে না। বিবাহযোগ্য পাত্র পাচ্ছেন না। তিনি ঠিক করেছিলেন ওই যে কুলীন, বিবাহব্যবসায়ী— ওদের হাতে মেয়েকে কিছুতেই তুলে দেবেন না। এক-একটা ঘাটের মড়া তিরিশ-চল্লিশটা বিয়ে করার পরেও আবার বিয়ে করার জন্য ঘুরঘুর করে। তারা জানে কাশিমবাজারের রাজা লোকনাথের দরবারের মুহুরিকে যদি শ্বশুর বানানো যায়, তো আর অন্ন সংস্থানের জন্য খেরোর খাতা খুলে এবাড়ি-ওবাড়ি যেতে হবে না।

কিন্তু পণ্ডিতমশাই ওইসব পক্ককেশ, গলিতচর্ম, কুৎসিত আকৃতির লোকজনকে বাড়ির ভিতরেই ঢুকতে দিতেন না। প্রথম থেকেই খাপ্পা। বাড়ির বাইরে থেকেই দূর দূর করে তাড়াতেন। তিনি মনে মনে এদের ঘৃণা করতেন। এই বিয়ের ব্যবসা যাতে করতে না হয়, সে জন্য পণ্ডিত পরিবারের ছেলে হয়েও তিনি দরবারি ভাষার শিক্ষা গ্রহণ করেছেন অনেক পরিশ্রমে।

নিজের ঘরে ঢুকে হাত-পা মুছে, চিঁড়ে-খই-দইয়ের আহার গ্রহণের পর হুঁকা টানতে টানতে গৃহিণীকে বললেন, “চিন্তা কোরো না, তোমার রূপসী মেয়েকে কোনও কুৎসিত

বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি না। বয়স মাত্র যোলো। উচ্চ চাকরি করে ইংরেজের দরবারে। রাজামশাই এই সম্বন্ধ এনেছেন। তবে সে প্রবাসে থাকে।”
কথার শেষ অংশটুকু বলার সময় গলায় উত্তেজনা একটু কমে এল। রাধাবিনোদ ভট্টাচার্য দু’বার গলাখাঁকারি দিয়ে সামলে নিলেন। মেয়েটা সেই দূরে এলাহাবাদে চলে যাবে। ইচ্ছে করলেই তো আর গো-গাড়িতে চেপে ফট্ করে দেখে আসা যাবে না! দীর্ঘশ্বাস চেপে তিনি বললেন, “শুনহ হে শ্রীমতীর মা, এটুকু তো আমাদের মেনে নিতে হবে। মেয়ে সুখে থাকবে, ভাল বর, ভাল পরিবার পাবে— এর জন্য নিজেদের বুকে এটুকু পাথর তো রাখতেই হবে।”

“কী হল বাবু, তুমি আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছ কেন! তোমার মদের গ্লাস তো ধরাই রয়েছে। খেতে খেতে গল্প শোনো।”
শ্রীমতীর কথার ঝোঁকে কিছুই খেয়াল ছিল না। রামনিধিকে যে মাঝে মধ্যে বলতে হয়, খাও। না হলে সে এমন ভুলো মানুষ, যে ঘণ্টার পর-ঘণ্টা সামনে মদের গ্লাস, মাংসের টুকরো বা বাদাম, আখরোট পড়েই থাকে।



কী বড় বড় থাম সে বাড়ির! দোতলা বাড়ি। ঢুকতেই ঢোল আর সানাইয়ের কানফাটানো আওয়াজ। আমি ভয়ে পালকির দরোজা বন্ধ করে দিই।

শ্রীমতীর জীবনের কথা একমনে শুনছিলেন রামনিধি। শ্রীমতী যে খুব বড় বংশ থেকে এসেছে, বা তার বাবা রাজকর্মচারী ছিলেন— কিচ্ছুই জানতেন না রামনিধি। তিনি তো হাঁ করে শুনবেনই।
শ্রীমতী তার নিধুবাবুর হাত হাতে নিয়ে বলল, “খাও, বাবু। খেতে খেতে শোনো।”
রামনিধি শ্রীমতীর চোখে চোখ ফেলে দেখেন, সে চোখে কী আর্তি! তিনি মদের গ্লাস ঠোঁটে নিয়ে বললেন, “বলো শ্রীমতী। আমি শুনছি। তুমি বলো তোমার বেদনার কথা।”
“আমার মায়ের গলা সেই প্রথম আমরা শুনলাম। তার বুকফাটা কান্নার সে স্বর। সেই কান্না বুকে নিয়ে, চোখে নিয়ে আমি অচেনা এক যুবকের সঙ্গে বজরায় কাশিমবাজারের নদীতে ভাসলাম। বাইশ দাঁড়ি বজরা। যারা দাঁড় বাইছে সকলে পালোয়ান। তবুও কতগুলো যে দিন আর রাত কেটে গেল জলে! আমার স্বামী খুবই ভাল মানুষ। বজরায় অনেক মহিলা ছিলেন। তাঁরা আমাকে গোটা পথই সব সময় ঘিরে ছিলেন। আমার খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা, সব খেয়াল রাখছিলেন। আর আমার স্বামী ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে এসে সব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।”
“এলাহাবাদ জায়গাটা কেমন? শুনেছি সেখানে অনেক বাঙালি থাকে। আমি কখনও যাইনি শ্রীমতী।
“কাশিমবাজারে আমরা যেখানে থাকতাম, তার চেয়ে অনেক অনেক ভাল। এলাহাবাদের ঘাটে বজরা ভিড়তেই ঝালেদার পালকি এসে হাজির। বেহারারা আমাকে কাঁধে করে দাঁড়িয়ে রইল। আমার পিছনে নাকি ছিল আমার বরের পালকি। তারপর আরও গোটাদশেক পালকির একসঙ্গে হুমনা হুমনা ধ্বনি আমার কানে আসছিল বেশ একটা গানের সুরে। পালকির দরোজা বন্ধ করে দিলেও আমি অল্প ফাঁক করে দেখছিলাম চারদিক। কোন অজানা দেশে এলাম! ভাবতে ভাবতে লোহার বড় তোরণ পেরিয়ে এক বিশাল বাড়ির ভিতর সেই পালকির মিছিল ঢুকে পড়ল। কী বড় বড় থাম সে বাড়ির! দোতলা বাড়ি। ঢুকতেই ঢোল আর সানাইয়ের কানফাটানো আওয়াজ। আমি ভয়ে পালকির দরোজা বন্ধ করে দিই।”
“ভয়ের কী আছে। বিয়েবাড়িতে বাজনা বাজবে না?” রামনিধি যে শ্রীমতীর কথা শুনছেন, তা জানাতে অল্প কথা ফেললেন।
“হ্যাঁ বাজবে। তাই বলে অত বাজনা! এক-একটা পেটমোটা কাড়া নাকাড়ার উপর দমাদম লাঠি পেটাচ্ছিল, মাথায় লাল ফেটি বাঁধা, খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরা ডাকাতের মতো দেখতে মানুষেরা।”
“তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে শ্রীমতী, তোমার স্বামীরা বেশ বর্ধিষ্ণু পরিবারের।”
“বর্ধিষ্ণু তো বটেই। অত বড় বাড়ির দোতলাতেই বৈঠকখানা পেরিয়ে বারান্দায় পা রাখলে করিডোরের দু’পাশে তিনটে করে বড় বড় ছ’খানা ঘর। সে বাড়িতে দু’-দুটো রসুইঘর। একটা নিরামিষ রান্নার, অন্যটা আমিষ। কী নেই বাড়ির ভিতরে! সুদৃশ্য কাঠের কাজ করা পালঙ্ক, চেয়ার, কৌচ, শ্বেতপাথরের টেবিল সব ঘরেই। আমার ঘরের ভিতর ছিল আগুনঘর। উত্তরে শীতকালে তীব্র শীত পড়ে। সে ঘরে দাসী এসে কাঠ গুঁজে গুঁজে আগুন ধরিয়ে যেত। ঘর গরম হত।”
রামনিধি আবার মুখ না খুলে পারলেন না। বললেন, “ফায়ারপ্লেস তো শুনেছি সাহেবদের বাড়িতে থাকে। কুলীন ব্রাহ্মণদের বাড়িতেও ম্লেচ্ছদের ব্যবহারসামগ্রী!”
“কচ্ছি কী, আমার স্বামী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে ব্রিটিশ কোম্পানির কেরানি ছিলেন। আর শুধু কেরানি নাকি! তিনি ব্রিটিশ এজেন্সি হাউসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিজে থেকে কোম্পানি খুলতে পারতেন না। কিন্তু প্রচুর টাকা খাটাতেন ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যুক্ত এজেন্সি হাউসের সঙ্গে। আমাদের বাড়িতে সাহেবদের আনাগোনা লেগেই থাকত সারাক্ষণ। বৈঠকখানায় মাঝে মধ্যেই খানাপিনার সঙ্গে নাচ-গানও হত।”
“শ্রীমতী, তুমি কি সে সব দেখেশুনেই নাচ-গান শিখেছ?”
“না বাবু। আমার স্বামী খুব ভাল মানুষ ছিলেন। অফিস থেকে ফিরে আমার সঙ্গে ইকিরমিকির খেলতেন, লুকোচুরি খেলতেন। অত বড় বাড়ি, কোথায় কোন থামের আড়ালে যে তিনি লুকিয়ে পড়তেন খুঁজেই পেতাম না! তারপর ভয় পেয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললে তিনি হাজির হয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিতেন। তিনি সারাদিন আমাকে ব্যস্ত রাখার জন্য দু’জন মেম দিদিমণি রেখে আমার পড়াশুনো শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর আসতেন দু’জন ওস্তাদ। আমাকে হারমোনিয়াম বাজানো আর কালোয়াতি গান শেখাতে।”
“আমিও তো তাই ভাবি, তুমি কত অনায়াসে অমন কঠিন কঠিন সুর গলায় নাও! তা তো এমনি এমনি হতে পারে না! অনুশীলন ছাড়া এরকম ঠুংরি গাওয়া সম্ভব নাকি!”
“ওরা আমাকে জগতের সেরা সুন্দরী ভেবে একেবারে আতুপুতু করে রাখত। বাড়ির সকলেই মাথায় করে রাখত আমায়। ছুটির দিন আমার স্বামী আমাকে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে এলাহাবাদের নানা জায়গা দেখাতে বেরিয়ে পড়তেন। কাশিমবাজারে থাকতে ঘরের বাইরেটা কেমন তা যেমন জানতাম না, এখানে ঠিক তার উলটোটা হয়েছিল। আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতেই দিতেন না শ্বশ্রুমাতা। বলতেন, গায়ের রং নষ্ট হয়ে যাবে। জানো নিধুবাবু, মেয়েজন্মের যে কী সুখ তা আমি ওই ক’দিনের এলাহাবাদের দিনগুলিতেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার স্বামী এত ভাল মানুষ ছিলেন যে রাতে

16023990

ঘুমোনোর সময় আমাকে রূপকথার গল্প, ভূতের গল্প বলে ঘুম পাড়াতেন। ”
“কিছু মনে কোরো না শ্রীমতী, তোমাদের ভেতর শারীরিক সম্পর্ক কীরকম ছিল?”
শ্রীমতী খানিকটা তো বিব্রত হবেই। মাথা নিচু করল সে। রামনিধি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। এই প্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি। তিনি বললেন, “ঠিক আছে শ্রীমতী, বলতে হবে না।”
“না নিধুবাবু। আজ আর আমার কিছুই গোপন করার নেই। আমার স্বামী এমন চমৎকার মানুষ ছিলেন, শিক্ষিত মানুষ ছিলেন, তিনি নিজেই বলতেন, মেয়েরা পরিণত না হলে শারীরিক সম্পর্ক করা উচিত নয়। আর তো মাত্র ক’টা দিন, তোমার রক্তভাঙা রোগটা এলেই আমরা সে সব করব। না হলে শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকী মৃত্যুও হতে পারে।”
রামনিধি মনে মনে ভাবলেন একদম ঠিক। তাঁর প্রথম দুই স্ত্রী এই অল্প বয়সে সন্তানধারণ করতে গিয়েই তো অকালপ্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের মৃত্যুর জন্য তিনি এই মুহূর্তে নিজেকে দায়ী করলেন। মনে মনে হিসেব কষে দেখলেন, তাঁর তৃতীয় পত্নীর বয়স বেশি। পাঁচ পাঁচটা সন্তান বিয়োলেও তো সে বহাল তবিয়তে আছে। নিজেকে সামলে নিতে রামনিধি বললেন, “খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য হয়েছিলে শ্রীমতী। তা এখানে কী করে এলে?”
“বাবু, অত সুখ আমার কপালে যে লেখা নেই। দেখলে না, রাজা মহানন্দ আমায় রানির সম্মানটুকু ছাড়া সব দিয়েছিলেন, কিন্তু কেমন সব আলো নিভে গেল!”
“না শ্রীমতী, আগে তুমি তোমার স্বামীর কথা বলো। পরে রাজা মহানন্দর কথা শুনব।”
“আর কী বলব নিধুবাবু! তখনও আমার বয়স চৌদ্দ বছর হয়নি। একদিন দুপুরে শুনলাম, আমার স্বামী প্রয়াগে যাওয়ার পথে নৌকোডুবিতে মারা গেছেন। ”
এই পরিণাম শোনার জন্য রামনিধি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়ল। তবে প্রশ্ন করা ঠিক হয়নি। শ্রীমতীর কষ্টের জায়গা! রামনিধি চুপ, শ্রীমতীও চুপ বেশ কিছুক্ষণ। শ্রীমতীই নীরবতা ভাঙল, “এই কাশিমবাজারে থাকলে সেদিনই আমার শেষ দিন ছিল। স্বামীর মৃতদেহ আমার কোলে চাপিয়ে দিয়ে চিতায় আগুন লাগিয়ে ‘যা সতী স্বর্গে যা’ বলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারত। কিন্তু আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুবই উন্নত ভাবনার আর এগিয়ে থাকা মানুষ। শ্বশুর, শাশুড়ি নিজেদের ঘরে আমাকে লুকিয়ে রেখে বাড়ির গেটে পাহারা বসিয়ে দিলেন। কোম্পানির সাহেবদের বলে লাল টুপিপরা সড়কি হাতে কোম্পানির পুলিশ এনে তিনমাস পাহারায় রাখলেন। ততদিনে আমার বাপের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে। বাবা এসে আমাকে নিয়ে এলেন শ্বশুরবাড়ির ভাড়া করে দেওয়া বজরায়। তারপর এই কাশিমবাজারে এসে আমার দুঃখের দিন শুরু হল।”
“কেন, কেন! নিজের জায়গা। নিজের বাড়ি। দুঃখের দিন কেন হবে!”
“দিনের বেলা ঘাটে বজরা ভিড়লেও বাবা বজরার দাঁড়িদের অনুরোধ করে, কিছু টাকা নিজের থেকে দিয়ে রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। রাত নামলে বড়সড় একটা কাপড়ে আগাগোড়া নিজেকে মুড়ে বাড়িতে ঢুকলাম। বছরখানেক সব ঠিক ছিল। কিন্তু আমার মা নিজের চোখের উপরে বিধবা মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পারছিলেন না। আমার যৌবন ফুটছে। সাদা শাড়িতে, একবেলা পাথরের থালায় শাক-পাতার অন্নগ্রহণ। একাদশীতে তেষ্টায় মরে যায় মেয়ে, তবুও জল খেতে পারে না। মা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁর তো বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। একদিন গলায় দড়ি দিলেন রসুইঘরে। ”
“না, আর বোলো না শ্রীমতী। আর আমি নিতে পারছি না।”
“কিন্তু বাবু, তোমাকে ছাড়া আর আমি কাকে বলব! মায়ের আত্মহত্যাও বাবা তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি আর নিজের সংযোগ খাটিয়ে ঢাকা দিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু মায়ের শ্রাদ্ধের দিন আমাদের আত্মীয়স্বজনরা এসে বিধবা বেশে আমাকে দেখে অবাক। কুলীনের বিধবা পতির সঙ্গে সহমরণে যাবে, সেটাই তো রেওয়াজ। এ বাড়ির অন্নগ্রহণ তো সম্ভব নয়! গ্রামে হট্টগোল বাধিয়ে দিল নিকট সম্পর্কের এক মামা। তাঁর দাবি, শ্রীমতীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। যে বৃদ্ধ কুলীন একদিন আমাকে বিয়ে করতে এসে বাবার কাছে তাড়া খেয়েছিল, সে-ই লোকজন খেপাচ্ছিল তখন।”
শ্রীমতী যেন সেদিনের ঘটনার ভেতর ঢুকে পড়েছে। রামনিধি দেখলেন, সে হাঁপাচ্ছে। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। বললেন, “শ্রীমতী, তুমি একটু জল খাও। একটু ঠান্ডা হয়ে নাও। অতটা উত্তেজিত হয়ো না।”
শ্রীমতী বড় করে শ্বাস নিয়ে, রামনিধির হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে পুরো জলটা খেয়ে নেয়। মনের ভেতর যে আগুন জ্বলছিল তা যেন নিভে আসে।
“নিধুবাবু, তুমি জানো, সেদিন আমার বাবা আর আমাকে একসঙ্গে ঘরে ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল ওরা। আমার বাবা খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রাজবাড়িতে। সেখান থেকে সৈনিক এসে বাবাকে আর আমাকে বাঁচায়। দু’-চারজনকে ধরেও নিয়ে যায় রাজকর্মচারীর উপর আক্রমণের অপরাধে।
‘‘কিন্তু সে যাত্রা বাঁচলেও প্রতিবেশীরা আমাদের একঘরে করে রাখল। বাবা যখন কাছারিতে যেতেন, ভয় পেতেন। একজন মাত্র বাগাল ছেলে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। তার ভরসায় আমাকে বাড়িতে রেখে কাজে মন দিতে পারতেন না। তিনিও হঠাৎ করে কলেরায় মারা গেলেন।”
“তাহলে মহানন্দ রায়ের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হল কী করে? উনি তো কাশিমবাজারের ধারেকাছে থাকতেন না। যতটুকু জেনেছি ওঁর বাবা মুর্শিদাবাদের নিজামতের দেওয়ানি করতেন, পরে সেই কাজ তিনিও করেন। উনি তো থাকতেন গঙ্গার ওপারে কুঞ্জঘাটায়।”
“নিধুবাবু, বাবা মারা যাওয়ার পর প্রায় রাতেই আমাদের বাড়ির চারপাশে লোকজনের কথাবার্তা, জড়ো হওয়ার শব্দ টের পেতাম, আর ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম। ওই বাগাল ছেলেটিই একদিন খবর আনল, অমাবস্যার রাতে আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে, শেকল তুলে দিয়ে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে মাতব্বরেরা। সে-ই আমাকে বুদ্ধি দিল, চুপি চুপি ভোর হওয়ার আগেই যেন টোপলার ভিতর নিজের যা কিছু আছে তা নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। ঘাটে মাঝি আর নৌকো সে-ই ঠিক করে রাখবে।”
“মানে তুমি নৌকোয় চেপে পালালে। তোমার সঙ্গে সেই ছেলেটি কি ছিল?”
“হ্যাঁ ছিল। অনেক দিন, মানে বছরখানেক সে আমাকে আগলে রেখেছিল।”
“তুমি ওই ছেলেটির সঙ্গে ঘর বাঁধলে?”
“না না বাবু। সে আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। আমার মুখের দিকে কোনওদিন মুখ তুলে চায়নি। রাজা মহানন্দ রায়ই ওকে আমার সঙ্গে রেখেছিলেন বছরখানেক।”
“কিন্তু মহানন্দর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কীভাবে, সেটা তো বলো।”
“সেদিনই মাঝি নৌকো থেকে গঙ্গার অন্য পাড়ে যখন নামিয়ে দিল, একজন সৌম্যদর্শন পুরুষ সঙ্গে দু’-তিনজন চাকর নিয়ে স্নানের জন্য গঙ্গার ঘাটে আসছিলেন। অপরিচিত আর ঘোমটা টানা বিধবাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কারা, কোথায় যাচ্ছি।”
“ভাগ্যিস ও রকম সদাশয় একজন মানুষের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। গুন্ডা-বদমায়েশদের হাতে পড়োনি!”
“ঠিক তাই। আমার মনেও তো ভয় তাড়া করে ফিরছিল। অচেনা জায়গায় কোথায়

যাব তো জানি না। কিন্তু এলাহাবাদে থাকার সময় আমার স্বামী আমাকে মেমদের কাছে ইংরেজি শিখিয়ে আমার ভিতর এক ধরনের সাহসও ভরে দিতে পেরেছিলেন। আর এই মানুষটিকে দেখে আমার একদম খারাপ মানুষ মনে হয়নি। আমি তাঁকে সব খুলে বললাম। তিনি এতটা আর্ত হলেন আমার কথায়, যে স্নান করলেন না। ফিরে চললেন। আমাকে এক গৃহস্থবাড়ির দোতলায় চারটি ঘরের ভাড়ার বন্দোবস্ত করে দিয়ে বললেন, সেই বাগাল ছেলেটিকে যেন সঙ্গে রাখি।"

"জগদীশ্বরের অশেষ কৃপা, তুমি এরকম একজন মানুষের দেখা পেয়ে গেছিলে,'' রামনিধি কপালে হাত ছুঁইয়ে নেন একবার।

শ্রীমতী বলতে থাকে, "নতুন জায়গায় এলাম বটে। কিন্তু আমার মন থেকে কিছুতেই কাশিমবাজারের ওই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা মুছে যায়নি। বরং মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতাম, কারা যেন আমাকে বাড়িতে আটকে রেখে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।"

"তুমি কলকাতায় এলে কী করে? আবার পালিয়ে এসেছিলে নাকি?"

"না না। আমি একদিন রাজাবাবুকে বলেছিলাম আমার আতঙ্কের কথা। তিনি বললেন, ক'টা দিন সবুর করো। তোমাকে নতুন ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার খবর ওরা পেলেও সেখানে গিয়ে কোনও হুজ্জুতি করতে পারবে না।"



তিনি অন্য ধরনের মানুষ। অনেক উঁচু মানুষ। আজ তাঁর মৃত্যুর খবরে আমাকে আবার সেই ভয় তাড়া করছে। আমার অর্থের অভাব নেই আজ, কিন্তু আশ্রয়টুকু ঘুচে গেল।

"তারপর তোমার রক্ষাকর্তাই একসময় তোমার ভক্ষক হয়ে উঠল?"

"না নিধুবাবু, না। অমন কথা বোলো না। তিনি অন্য ধরনের মানুষ। অনেক উঁচু মানুষ। আজ তাঁর মৃত্যুর খবরে আমাকে আবার সেই ভয় তাড়া করছে। আমার অর্থের অভাব নেই আজ, কিন্তু আশ্রয়টুকু ঘুচে গেল। মাথার উপর থেকে আকাশ সরে গেল।

''হ্যাঁ বাবু, সে আমার আকাশ ছিল। তোমাকে বলছি বাবু। এই বিরাট বাড়িটি আমার নামে কিনে চাকর-বাকর, পরিচারিকা দিয়ে ঘিরে আমাকে রেখে মহানন্দ রায় কলকাতায় নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোথায় যান?' তিনি অল্প হেসে বললেন, 'আমি গান শুনতে যাই। যেখানেই শুনি ভাল বাঈজি এসেছে, আমি চলে যাই। ঠুংরি, গজ়ল শুনি। আমি বললাম, আমি কি আপনাকে একটা গান শোনাতে পারি? তিনি আমার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টি ফেলে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'আচ্ছা শোনাও'। খালি গলাতেই আমি আগ্রা ঘরানার একটা সপাট তানের ঠুংরি ছেড়ে দিলাম। গান শেষ করে দেখলাম রাজা কাঁদছেন। আমি উঠে গিয়ে আঁচল দিয়ে তাঁর চোখ মুছিয়ে দিতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন।"

"কেন কেন, কাঁদলেন কেন! তুমি জিজ্ঞাসা করোনি শ্রীমতী?"

"পরে করেছিলাম। কিন্তু তখন তো আমি আমার ভিতর ছিলাম না। সেদিন প্রথম আমার সতেরো বছরের যৌবন কোনও পুরুষের ছোঁয়া পেল। আমার স্বামী তো আমার বন্ধু ছিলেন। আগেই বলেছি বাবু, স্বামীর ঘরে আমি অক্ষতযোনি ছিলাম। আমি জানতামই না শরীর কী জিনিস। কিন্তু বিধবা হয়ে কাশিমবাজারে আসার পর থেকে যখন আমার শরীরে রক্তভাঙা অসুখ এল, আমি বুঝতে পারছিলাম শরীর কী। আমি নিজে নিজেকে পিষ্ট করতাম। চাইতাম, আমার এই যৌবন কারও হাতে ছিন্ন হোক, পিষ্ট হোক। কিন্তু বিধবা মেয়েমানুষ, কী করে মেটাব শরীরের চাওয়া! রাজা মহানন্দ আমাকে জড়িয়ে ধরায় তাঁর মাথা আমার দুই বুকের মাঝে। আর ঠিক তখনই আমি বুঝতে পারলাম পুরুষের শরীর কী!"

রামনিধি হাসতে হাসতে বললেন, "পুরুষের শরীর কী! নেকড়ে না বাঘের মতো!"

"তুমি রঙ্গ কোরো না। আমার তো তখন মরণদশা! লাজ-লজ্জা নেই, আমি তো তখন দেবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে নিজে তৃপ্ত হতে চাইছি। হ্যাঁ বাবু, তিনি কোনওদিন নিজে থেকে আমার গায়ে হাত দেননি। তিনি আমাকে সুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কখনওই আমার কাছ থেকে কিছু চাইতেন না। শুধু গান শুনতে চাইতেন। আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে থাকতেন। তিনিই তো আমার গান-বাজনার শখকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য এখানে সবরকমের ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছেন।"

রামনিধি শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে আছেন। শ্রীমতীর মুখে এখন বিষাদের জায়গায় কী এক প্রসন্ন উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়েছে। মুখমণ্ডলে রক্তাভা বেড়ে গিয়েছে।

"জানো তো নিধুবাবু, আমার মুখে কে যেন সেদিন কথা বসাল। বললাম, 'রাজা, আপনার ঘরে যান। আমি আসছি।'

আমি সময় নিইনি। আমি সময় নিতে পারছিলাম না। নিজেকে সমর্পণের জন্য ছটফট করছিলাম। দাসীকে দিয়ে তাঁর ঘরে অম্বুরি তামাকের ফরসি পাঠিয়ে দিয়েছি। দাসী বেরিয়ে যেতেই আমি পানের মিষ্টি গন্ধ মুখে নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকলাম। আমার বাড়িতে সবসময় ফুল আর মালা থাকে। আমি শাড়ির কোঁচড়ে করে ফুল এনে ছড়িয়ে দিলাম পালঙ্কে। অল্প শীত নেমেছে কলকাতায়। একটা ভারী কাঁথার নীচে আর ছড়ানো ফুলের উপরে দু'জনে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে একটা গোটা স্বপ্নের মতো রাত কাটালাম। আমার যৌবন রাজা মহানন্দের পায়ে নিবেদন করলাম।"

রামনিধি গাত্রোত্থানের আয়োজন করতে করতে বললেন, "বুঝেছি শ্রীমতী। আজ তোমার সেই বিরাট আশ্রয় সরে যাওয়ায় তুমি নিজেকে অসহায় ভাবছ। কিন্তু জেনো, তোমার নিধুবাবু, যে কোনও কাজে যখন দরকার হবে তোমার কাছে হাজির হয়ে যাবে। অত উদ্বিগ্ন হয়ো না।"

"আর একটু বসো বাবু। আমি খুব খুশি হয়েছি, তুমি আবার নতুন করে গানবাজনায় ঝাঁপাচ্ছ। আমার খুব সমর্থন থাকবে। তোমার দরকার হলে বলবে, আমি দল চালানোর কিছু খরচাপাতি দেব। তাতে আমার মনে হবে আমি নিধুবাবুর লোক। নিজের মনে সাহস বাড়বে।"

রামনিধি খুব অবাক হলেন। রাজা মহানন্দ মারা যাওয়ায় তো শ্রীমতীর অর্থের জোগানে টান পড়ার কথা। সে আবার কী করে পয়সাকড়ি দেবে আখড়াই-এর দলের জন্য! শ্রীমতী বুঝতে পারে। রামনিধির চাউনিতেই সংশয় ভরা ছিল। শ্রীমতী বলল, "বাবু, আমি এমনি এমনি দেব না। তুমি তার বদলে আমার কিছু কাজ করে দেবে। তাতে তোমার আপত্তি থাকার কথা নয়।"

রামনিধি মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললেন, "কী রকম! মানে আমার মতো অপদার্থ লোক তোমার কী কাজে লাগতে পারে!"

"বাবু, আমি জানি তুমি বেশ কিছু টাকা

এজেন্সি হাউসে লাগিয়েছে। তারা ৭ থেকে ১০ শতাংশ সুদ দেয়। সেই টাকায় তোমার সংসার দিব্য চলে যায়। আমারও কিছু ধনসম্পদ আছে, আমি তা ব্যবসা বা এজেন্সি হাউসের কাছে রাখতে চাই। যাতে আমার খরচাপাতি সব সেখান থেকেই উঠে আসে।"
রামনিধির এবার অবাক হওয়ার পালা। সে এজেন্সি হাউসের কাছে পেনশনের টাকা রেখেছে তা তো কাকপক্ষীরও জানার কথা নয়! বড়ই গোপন সে কাজ। কেবল জয় মিত্র জানে। তার বাবাকে ধরেই তো যোগাযোগটা করা গিয়েছে। কিন্তু শ্রীমতীর এত ধারণা হল কী করে!
"শোনো নিধুবাবু, আমার স্বামী শুধু তো কোম্পানির চাকরি করতেন না। তিনি এজেন্সি হাউসের সঙ্গে ব্যবসাও করতেন। কিন্তু চাকরি করতে করতে নিজের নামে ব্যবসা করা যায় না বলে টাকা খাটাতেন।"
"আচ্ছা, এবার বুঝেছি। কিন্তু কত টাকা খাটাতে চাও?"
"ধরো পাঁচ লাখের মতো।"
রামনিধি এবার ঘামতে লেগেছেন। বলে কী শ্রীমতী! তিনি তো মাত্র দশ হাজার খাটিয়েই পরিবারের খরচ তুলে ফেলেন। পাঁচ লাখ তো অনেক টাকা!
শ্রীমতী রামনিধিকে থমকাতে দেখে বুঝতে পেরেছে। বলে, "দ্যাখো, এ টাকা আমার নয়। রাজা মহানন্দ রায় রাখতে দিয়েছিলেন। কখনও প্রয়োজনের সময় তিনি নিয়ে নিতেন হয়তো। কিন্তু তিনি যখন মারা গেছেন আমি টাকাটা তো ফেলে দিতে পারি না। আবার আমার সামনে থাকলে যদি খরচ করে ফেলি! মানে, ওই টাকাটা বেশ কিছুদিন সুরক্ষিত রাখতে হবে। যদি কোনওদিন রাজা মহানন্দের ছেলেরা এসে সে টাকা চায়, আমি যেন তা ফিরিয়ে দিতে পারি।"
"এ তো অনেক টাকা। তোমাকে ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে। কোন ব্যবসায় লাগালে মার নেই, তা দেখতে হবে। যেমন অনেক এজেন্সি হাউস এখন জাহাজব্যবসায় যুক্ত হয়েছে। এ দেশ থেকে নানা জিনিস পত্র সাগরপারে নিয়ে যেতে অনেক জাহাজ দরকার। দু'-তিনটে কোম্পানির নাম তো আমি জানি। ওই যে 'ফেয়ারলি ফার্গুসন অ্যান্ড কো', 'হগ ডেভিডসন অ্যান্ড কো', 'মেসার্স পামার অ্যান্ড কো'। এরা বাজার থেকে টাকা তুলে জাহাজ বানানোর বরাত দেয়। আর নীলচাষ, নীলব্যবসার সঙ্গেও অনেক হাউস জড়িত। আবার আজকাল বেশ কয়েকটা কোম্পানি আফিং ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছে চিনের সঙ্গে। এদের টাকা ধার দিলে ১০ শতাংশ সুদ পাবেই। আর যদি তা না চাও, 'আলেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানি' হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক নামে একটা ব্যাঙ্ক খুলেছে, সেখানে টাকা রাখো।"
"কিন্তু বাবু, এ সব বড় বড় ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত কি সামলানো যাবে! তার চে আমি বলি কী, ছোটখাটো কারবারে টাকা খাটানো যায় না! ধরো কেউ বাজার কিনবে কোম্পানির কাছ থেকে। ওই যে বাগবাজারের গোকুল মিত্র ধর্মতলায় বাজার কিনলেন। তেমন কাউকে ধরে যদি বাজার কেনা যায়? আমি যা জানি, দেওয়ান বারাণসী ঘোষ কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিজস্ব যা বাজার ছিল, তা মাত্র ২১০০০ সিক্কা টাকায় কিনেছিলেন। তার একটারই দাম এখন এক-দুই লাখ হবে। বা কারও গদি আছে হাটখোলায়, বড়বাজারে। তিসি, পাট, ময়দা, চিনির ব্যবসা। তাকে কিছু টাকা শর্ত দিয়ে দাও। তার ব্যবসা বড় হবে। আমাদেরও বেশি টাকা ঘরে আসবে। বাবু, আমি চাইছি এক জায়গায় টাকাটা না দিয়ে, ভাগ ভাগ করে দিতে। তাতে কোনও ব্যবসা ডকে উঠে গেলে যেন আমাদের পুঁজি সব একসঙ্গে মারা না যায়। মানে আমি কম ঝুঁকি নিতে চাইছি।"
"দারুণ শ্রীমতী! তোমার তো খাসা বুদ্ধি! আচ্ছা আমি বাগবাজারের দেওয়ান সাহেবকে বলে একটা বাজার তোমার নামে কেনার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। শ্যামবাজার আর শোভাবাজার তো নবকৃষ্ণদেব ইজারা নিয়ে নিয়েছেন। শুনেছি চিৎপুর রোডে নয় বিঘে ছয় ছটাক জায়গায় পাকা দোকানঘর সহ এডোয়ার্ড টিরেটা বাজারটি বিক্রি করে করে দেবেন। সেটার দাম ধরা হয়েছে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা। সেটা কিনে তোমার নামে হবে 'শ্রীমতী বাজার'।"
"না না। মেয়েমানুষের নামে বাজার হয় নাকি! আর আমি বিধবা মেয়েমানুষ। রাজার রক্ষিতা। আমার চালচুলোর ঠিকঠিকানা নেই। আমি কোনও দেওয়ান, রাজা নই। আমার নামে বাজার হতে পারে না। তুমি তার চে তোমার নামেই কেনার ব্যবস্থা করো। নাম হবে নিধুবাবুর বাজার।"
"নামটা শুনতে তো খারাপ লাগছে না শ্রীমতী। কিন্তু তা হলে তোমার টাকাকড়ি হয়তো আর ফেরত এল না! আমার দ্বিতীয় পুত্রটি, মানে ওই জয়গোপাল এমন চৌখস হয়েছে, বলার নয়। সে হাটখোলায় গিয়ে এ গদির মাল ও গদিতে বিক্রি করেই কারবারি হয়ে গিয়েছে। বিনা পুঁজিতে কারবার, বুঝেছ? তারপর যদি দেখে আমার নামে বাজার, সে তো তোলাবাজ হয়ে যাবে! রোজ নিজেই শুল্ক তুলবে। তোমার ঘরে আর টাকা ফিরবে না। ওই বাজার তোমার নামেই হবে। দরকারে শ্রীমতীর নামে কিনে, বোর্ডে শ্রীমানী নাম ঝুলিয়ে দেওয়া হবে!"

"ব্যাপারটা আর কতদিন ঝুলিয়ে রাখবে হরু ঠাকুর! ওদিকে তো নিধু মাতব্বর হয়ে উঠেছে। সে তো সব পেশাদারি কবিদলের দফারফা করে ছাড়ল। তুমি একটা বিহিত করো! ওদের গানের লড়াইতে গিয়ে মধ্যস্থতা করার সময় ওদের বাগবাজারের দলকে তুমি বসিয়ে দাও তো! তোমার উপরেই তো বিচারের ভার থাকে। দাও, ওকে টসকে দাও। দু'-চারবার ঘা খেলে পিছু হটবে, আর মুখ দেখাবে না।"
"কিন্তু নিত্যানন্দ, কী করে কী করি বল তো! যাঁরা গাওনা দেন তাঁরা তো সব নিধুর দলের গান শুনতে পাগল।"
"সে আমি বুঝি না ঠাকুর। আমরা কি তবে না খেয়ে মারা যাব! আচ্ছা এক কাজ করো, তুমি একবার অ্যান্টনি কবিয়ালকে নিয়ে নিধুর মুখোমুখি ছেড়ে দাও তো। শুনেছি তার যেমন রূপ, তেমন গলা। আর একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে ঠাকুর। ওই সাহেব কবিয়ালের এক সুন্দরী মেয়েছেলে আছে। তাকে নিধুর গায়ে লাগিয়ে দাও। নিধুর তো আবার একটু ইয়ের দোষ আছে! তখন সাহেবের সঙ্গে লাঠালাঠি করে নিধু মরবে।"
"আমি বলি কী নিত্যানন্দ বৈরাগী, তুই গানবাজনার ভিতর না থেকে কোনও ডাকাতের দলে ঢুকে যা। তাতে মেলা পয়সা। কলকাতার দক্ষিণে এক তাবড় ডাকাত আছে, মনোহর বাগদি। তুই তার দলে ভিড়ে পড়। লাঠালাঠি না করতে পারিস, রান্নাবান্না কর। শুনেছি তার বউ নেই। এক বুড়ি পিসি রান্নাবান্না করে দেয়। সেখানে গিয়ে রান্না করলে রোজ রাতে লুঠের বখরা পাবি।"
"এত বড় কথাটা তুমি বলতে পারলে ঠাকুর! আমার সঙ্গে ডাকাতের তুলনা!"
"কী বলব বল! কবে থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছিস। হালসিবাগানে আর কেউ গান শুনতে আসছে না। তা আমি কী করতে পারি! তুই তো বাগবাজারের বিপরীতে জোড়াসাঁকো দলে আছিস। আমি কি বুঝি না কিছু? তুই এসেছিস, যাতে আসছে পূর্ণিমায় রাজকৃষ্ণ দেব রায় বাহাদুরের বাড়ির গাওনায় তোদের দলকে জিতিয়ে দিই। ওটি হবে না বাপু! যার যা ন্যায্য, সে তাই পাবে। এদিক ওদিক না ঘুরে তোরা আরও ভাল করে গান বাঁধ, মহড়া দে দিকি। নিশ্চই জয় পাবি।"

(ক্রমশ)
অলংকরণ: সৌমেন দাস



স্লো বিউটি রেজিম

সম্প্রতি সৌন্দর্যের জগতে সাড়া ফেলেছে এই মুভমেন্ট। স্লো বিউটি রেজিমের গুরুত্ব কী? কীভাবেই বা তা সামিল করবেন দৈনন্দিন রূপরুটিনে? রইল সব তথ্য।



আধুনিক বিশ্বে 'সাস্টেনেবল' নামক শব্দবন্ধটির গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বাড়ছে। পৃথিবীর সুস্থতার কথা ভেবে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই আজ সাস্টেনেবিলিটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সৌন্দর্য বা ফ্যাশন পরিমণ্ডলে যেমন দিনদিন গুরুত্ব বাড়ছে সার্কুলার ফ্যাশন মুভমেন্ট, বিওয়াইও বা ব্রিঙ্গ ইওর ওন লাইফস্টাইল, মিনিম্যালিজ়ম বা জ়িরো ওয়েস্ট ডেভেলপমেন্টের, তেমনই সম্প্রতি আর-একটি 'ট্রেন্ড' সাড়া ফেলেছে বিশ্বে, যার পোশাকি নাম 'স্লো বিউটি'। সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে বর্তমানে যে হারে এথিক্যাল বা ক্লিন বিউটি ব্র্যান্ডের জনপ্রিয়তা বাড়ছে, তাতে এটুকু বলাই যায় যে, সাস্টেনেবল বিউটির প্রতিও এখন ক্রেতাদের আকর্ষণ বাড়ছে বই কমছে না। তাঁদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে এবং তারই প্রতিফলন ঘটছে প্রসাধনী কেনার ক্ষেত্রে। এককথায় সাস্টেনেবিলিটিও এখন মেনস্ট্রিম বিউটির অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে শুধুমাত্র প্রসাধনী বা নিত্যব্যবহার্য প্রডাক্ট কেনার ক্ষেত্রেই যে শুধু 'স্লো বিউটি'-র কথা মাথায় রাখবেন, তা নয়। দৈনন্দিন রূপচর্চা বা সেল্ফ কেয়ার রেজিমেও স্লো বিউটির সমান ভূমিকা রয়েছে, যা বুঝতে গেলে এই বিষয়ে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান থাকা জরুরি। আজকাল অনেকেই প্রডাক্টে

কোন ধরনের উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে বা ত্বক আর চুলের পক্ষে তারা ক্ষতিকর কিনা, এই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু এর বাইরে যেটা জানা জরুরি, তা হল, যে প্রডাক্ট কিনছেন তা কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে, কীভাবে তৈরি হচ্ছে বা প্যাকেজিংয়ের জন্য কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে ইত্যাদি। একটা ব্র্যান্ড কীভাবে প্রডাক্ট তৈরি করছে, সেই

> শুধুমাত্র সাস্টেনেবল ব্র্যান্ডকে প্রাধান্য দেওয়া বা মাস-প্রোডিউসড বিউটি প্রডাক্ট ব্যবহার করার মধ্যেই স্লো বিউটি সীমিত নয়। আভ্যন্তরীণ ভাল থাকাও স্লো বিউটির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।





সম্পর্কে সচেতনতা যত বাড়বে, ততই প্রডাক্ট কেনা থেকে তা ব্যবহার করা পর্যন্ত প্রতিটা বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হবে সকলের। মূলত এই সচেতনতার উপর ভিত্তি করেই স্লো বিউটির সূত্রপাত। কীভাবে রোজকার রূপচর্চায় এই ‘ট্রেন্ড’কে সামিল করবেন, সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে স্লো বিউটি সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

স্লো বিউটি কী?

রিডিউজ়, রিইউজ়, রিসাইকল... মূলত এই নীতিই স্লো বিউটির ভিত। অর্থাৎ, যে প্রডাক্ট কেনা হচ্ছে, তার সঠিক ব্যবহার, প্যাকেজিং বা অন্যান্য নন-রিসাইকেলেবল অংশের পুনর্ব্যবহার এবং যথাযথ রিসাইকল, এই সার্কুলার অ্যাপ্রোচই স্লো বিউটির বৈশিষ্ট্য। আরও সহজ করে বললে, ইকো-ফ্রেন্ডলি প্যাকেজিংয়ে পাওয়া যায় এমন অ্যাক্টিভ উপকরণে সমৃদ্ধ গুণগত মানের প্রডাক্ট ব্যবহার করা, যা দৈনন্দিন রূপচর্চাকে যথাসম্ভব সিম্পল রাখতে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে ত্বকের ধরন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা ‘টেন-স্টেপ বিউটি রুটিন’-এর চক্রব্যূহে পা না দিয়ে কোন ধরনের প্রডাক্টে প্রকৃতপক্ষে ত্বক উপকৃত হচ্ছে, তা বুঝতে হবে। তার জন্য প্রতিটা প্রডাক্টকে সময় দিতে হবে। যত ভাল মানের প্রডাক্টই হোক, তা রাতারাতি ত্বকে আমূল পরিবর্তন আনবে, এটা ধরে নেওয়া বৃথা। তাছাড়া প্রত্যেকের ত্বক আলাদা। ত্বক-বিশেষে একই প্রডাক্টে আলাদা প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এটা মনে রাখতে হবে। সব মিলিয়ে, এক অনন্য, ব্যক্তিনির্ভর এবং সাস্টেনেবল সেল্ফ-কেয়ার প্র্যাকটিস গড়ে তোলাই স্লো বিউটির মূল লক্ষ্য।



ক্লিন স্কিনকেয়ার রুটিনের ঊর্ধ্বে...

তবে শুধুমাত্র সাস্টেনেবল ব্র্যান্ডকে প্রাধান্য দেওয়া বা কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল মাস-প্রোডিউসড বিউটি প্রডাক্ট ব্যবহার করার মধ্যেই স্লো বিউটি সীমিত নয়। আভ্যন্তরীণ ভাল থাকাও স্লো বিউটির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অর্থাৎ, নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যেস, ব্যালান্সড ডায়েট, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, মানসিকভাবে ভাল থাকাও এক্ষেত্রে সমান জরুরি। কারণ, বাহ্যিক উপস্থিতির সঙ্গে এসবের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। একটার সঙ্গে আপস করে অন্যটা সম্ভব নয়। তাছাড়া এখন সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে, বিউটি প্রডাক্ট কেনার ধুম সাংঘাতিক বেড়েছে। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দেখা ‘হল’ ভিডিওর জনপ্রিয়তা যত বাড়ছে, ততই আরও বেশি প্রডাক্ট কেনার ঝোঁক বাড়ছে সকলের। অজান্তেই কখন যেন আমরা নেগেটিভ শপিং সাইকলে ঢুকে পড়ছি, যার কোনও শেষ নেই। প্রডাক্টের





নতুন কোনও প্রডাক্ট বা কোনও বাড়তি স্টেপ দৈনন্দিন রুটিনে সামিল করার আগে ভেবে দেখুন, আদৌ তার প্রয়োজন রয়েছে কিনা।

পর প্রডাক্ট কিনছি, অথচ কোনওটারই সঠিক ব্যবহার করছি না, উপরন্তু খরচও বাড়ছে, এর চেয়ে অস্বাস্থ্যকর বিউটি প্র্যাকটিস কিছু নেই। সবকিছুর মধ্যেই একটা ব্যালান্স তৈরি করা জরুরি। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের জন্যই নয়, ভিতর থেকে ভাল থাকার জন্যও যে এই ধরনের অভ্যেস বদলানো জরুরি, তা-ই শেখাচ্ছে স্লো বিউটি।

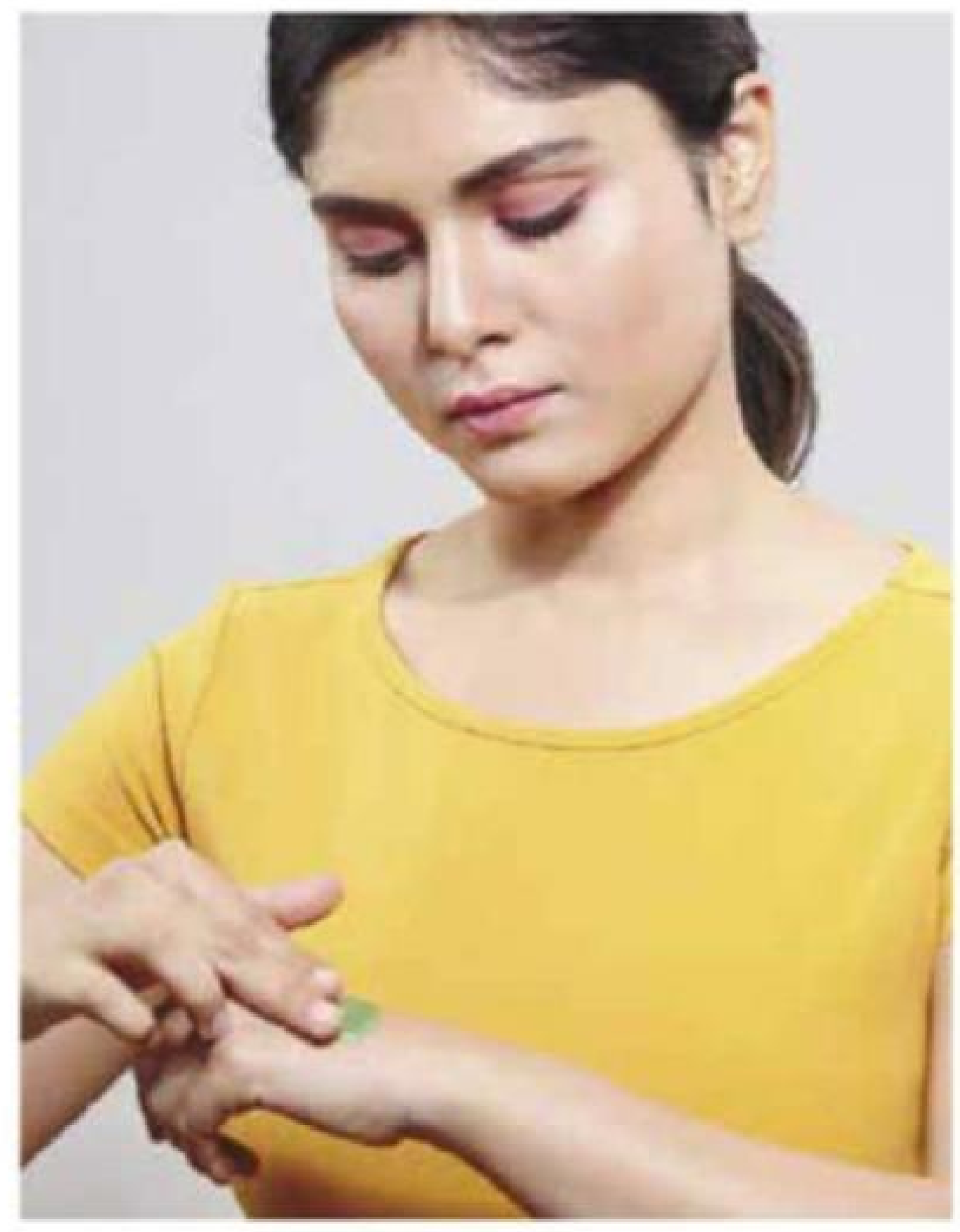
রোজকার রুটিনে 'স্লো বিউটি' প্র্যাকটিস

একবারে বিরাট কোনও পরিবর্তন আনতে চাওয়ার বদলে কিছু ছোট ছোট পরিবর্তন আনার চেষ্টা করুন। কোথায় কতটা ইনভেস্ট করা জরুরি এবং কোন অভ্যেসগুলো অপ্রয়োজনীয়, সেটা বুঝতে শিখুন। কয়েকটা সহজ রুল অ্যাপ্লাই করতে পারেন দৈনন্দিন সেল্ফ-কেয়ার রুটিনে...



১. এসেনশিয়াল সেল্ফ-কেয়ার

এই নতুন মন্ত্রে অভ্যস্ত হওয়া কিন্তু খুব সহজ। নতুন কোনও প্রডাক্ট বা কোনও বাড়তি স্টেপ রুটিনে সামিল করার আগে একটু থামুন। ভেবে দেখুন, আদৌ তার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। অনেকেই রয়েছেন, যারা বিনা চিন্তাভাবনায় একগাদা প্রডাক্ট কিনে ফেলেন। প্রথম ক'দিন খুব যত্ন করে তা ব্যবহার করেন, তারপরই অন্য নতুন প্রডাক্টের প্রতি আকর্ষণ চলে যায়। নিজেই নিয়ম করুন যে, প্রতিটা অপরিহার্য স্টেপ যেমন, ক্লেনজ়িং, টোনিং, ময়শ্চারাইজ়িং ইত্যাদির জন্য একটার বেশি প্রডাক্ট যেন এক সময়ে না থাকে। তার শেল্ফ লাইফ দেখে নিন এবং এক্সপায়ারি ডেটের আগেই তা ব্যবহার করে ফেলুন। একটা প্রডাক্ট শেষ হলে, তবেই নতুন প্রডাক্টে ইনভেস্ট করুন। কোন স্টেপগুলো অপরিহার্য, সেটাও অবশ্য বুঝতে হবে। এখন প্রডাক্টের সংখ্যা তো কম নয়। কার কোনটা জরুরি সেটা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব না হলেও, সবার যে সব প্রডাক্ট জরুরি নয়, এটা বলা যায়। এখন কোরিয়ান টেন স্টেপ রুটিনের কথা হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু সত্যিই কি সুন্দর ত্বক পেতে অতগুলো প্রডাক্ট জরুরি? বা রোজ এত সময় কি আপনি দিতে পারবেন রূপচর্চায়? সব দিক



অ্যারোমাথেরাপির কথা ভেবে দেখতে পারেন। কার্যকরী, ব্যবহার করাও সহজ।



কিছুক্ষেত্রে ঘরোয়া যত্ন, প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভরসা রাখুন।





ক্রুয়েল্টি-ফ্রি, ভেগান প্রডাক্টে ইনভেস্ট করুন, যা পরিবেশের পক্ষেও ভাল।

ভেবেচিন্তে তারপর সিদ্ধান্তে আসুন।

২. প্রাকৃতিক উপাদানই ভবিষ্যৎ

আগেই বলেছি, ত্বকের প্রয়োজন বুঝতে হবে। অবশ্যই প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করার সুবিধে প্রচুর, বিশেষত যদি তা ভেগান এবং ক্রুয়েল্টি-ফ্রি হয়। কারণ তা পরিবেশের জন্য যেমন ভাল, তেমনই কেমিক্যালের ব্যবহার কম থাকায় ত্বকের পক্ষেও তুলনায় নিরাপদ। একইভাবে, প্রডাক্টে কৃত্রিম রং বা পিইজি সারফেকট্যান্টের ব্যবহার রয়েছে কিনা, তা দেখে নিন। সেনসিটিভ ত্বকের জন্য এই উপকরণগুলো একেবারেই ভাল নয়। সবসময় যে বাজার-চলতি প্রডাক্টই কিনতে হবে, এমনটাও নয়। জল, তেল, দুধের মতো ঘরোয়া সাধারণ উপকরণ দিয়েও ত্বকের পরিচর্যা সম্ভব। আর এতে পরিবেশের কোনও ক্ষতিরও আশঙ্কা নেই। এই ধরনের সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া শুধু ত্বকের পক্ষেই নয়, পরিবেশের জন্যও নিরাপদ। স্লো বিউটি প্রডাক্ট বেছে নেওয়া, সাস্টেনেবল ব্র্যান্ডদের প্রাধান্য দেওয়া তো রয়েইছে, সেই সঙ্গে স্থানীয়, ছোট ব্র্যান্ড বা প্ল্যান্ট-বেসড প্রডাক্টে ইনভেস্ট করাও জরুরি।

৩. অ্যারোমাথেরাপির উপর ভরসা রাখুন

দৈনন্দিন রূপচর্চায় স্লো বিউটি ট্রেন্ড সামিল করার খুব সহজ এবং কার্যকরী উপায় অ্যারোমাথেরাপি। এতে মূলত সুগন্ধি তেলের ব্যবহার হয়, যা মন এবং শরীর শান্ত এবং সতেজ রাখতে সাহায্য করে। যদিও বিজ্ঞানের





চোখে এর জনপ্রিয়তা সম্প্রতি বেড়েছে, তবে এর ব্যবহার হয়ে আসছে সেই প্রাচীনকাল থেকেই। আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্র তো রয়েইছে, এছাড়া চিনেও চিকিৎসাবিদ্যায় ভেষজ নির্যাস এবং তেলের ব্যবহারের কথা শোনা যায়। এই এসেনশিয়াল অয়েলের অসংখ্য ধরন রয়েছে এবং প্রতিটির উপকার ভিন্ন। প্রয়োজন-বিশেষে একাধিক এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়েও ব্যবহার করা যেতে পারে। অনিদ্রা, স্ট্রেস, অ্যাংজ়াইটি থেকে শুরু করে জয়েন্ট পেন, ব্যাকটেরিয়া-জনিত সমস্যা, সবেতেই উপকারী ভূমিকা রয়েছে অ্যারোমাথেরাপির।

আশার আলো এই যে, যত দিন যাচ্ছে, তত ক্রেতাদের বাইং হ্যাবিটস বদলাচ্ছে। স্লো বিউটির মতো ট্রেন্ডের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। পৃথিবীকে সুরক্ষিত রাখতে চাইলে, সকলেরই এই ধরনের সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। অল্প অল্প করে শুরু করুন। দেখবেন, বোঝার আগেই স্লো লাইফস্টাইলের অঙ্গ হয়ে উঠেছেন।


মালাই ব্রকোলি

কাবাব বা টিক্কা বানান নতুন স্বাদে! হাতেকলমে শেখালেন ‘চারকোল কাবাবেরি’ ক্লাউড কিচেনের শেফ পোখরাজ সিংহ জাওয়ান্ডা ও মিহির নাফাড়ে।

বাড়িতে অতিথি হাজির। বা ছুটির বিকেলে হঠাৎ প্ল্যান হাউস-পার্টির। বাইরে থেকে স্ন্যাক্স না আনিয়ে, ফ্রিজ থেকে বের করে ফেলুন মাছ, ব্রকোলি, চিকেন, দই। বানিয়ে ফেলুন নতুন স্বাদের কাবাব!

মালাই ব্রকোলি

উপকরণ: বড় সাইজ়ের ব্রকোলি ১টা, দই ৬০ গ্রাম, চিজ় ৫০ গ্রাম, কাজুবাটা ২৫ গ্রাম, কসুরি মেথি ১ চা-চামচ, হেভি ক্রিম ২ টেবলচামচ, আদাকুচি ১ টেবলচামচ, আদা-রসুনবাটা ২ চা-চামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, চিনি ১/৪ চা-চামচ, গরমমশলা ১/৪ চা-চামচ, এলাচগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: ফুটন্ত জলে ব্রকোলি ৬-৮ মিনিট রাখুন। দই, চিজ়, কাজুবাটা ও হেভি ক্রিম ভাল করে ফেটান। তাতে কসুরি মেথি, আদাকুচি, আদা-রসুনবাটা, চিনি, গরমমশলা, গোলমরিচগুঁড়ো, এলাচগুঁড়ো ও স্বাদমতো নুন দিন। পরে এটা ম্যারিনেড হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ব্রকোলি গোল গোল করে কাটুন ও ম্যারিনেড মাখান। ফ্রিজে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। একটি শিকে ব্রকোলির টুকরোগুলো লাগিয়ে তন্দুরে ৮-১০ মিনিট রাখুন। এছাড়াও আভেনে ১৭০° সেন্টিগ্রেড আঁচে ১২-১৫ মিনিট বা প্যানে সরাসরি গ্রিল করেও রান্না করা যেতে পারে। চিজ় সসের সঙ্গে গরম গরম মালাই ব্রকোলি পরিবেশন করুন।




চারকোল বাটার চিকেন

চারকোল বাটার চিকেন

উপকরণ: **ম্যারিনেশনের জন্য:** চিকেন ৫০০ গ্রাম, লেবুর রস ১০ মিলি, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ৫ গ্রাম, নুন ৫ গ্রাম, কসুরি মেথি ১০ গ্রাম, হলুদ ৩ গ্রাম, তেল ১০ মিলি, আদা-রসুনবাটা ১৫ গ্রাম, দই ১২০ মিলি। **গ্রেভি তৈরির জন্য:** মাখন ৩০ গ্রাম, আদা-রসুনবাটা ৫ গ্রাম, দারচিনি ১টা (২ ইঞ্চি), এলাচ ২টো, লবঙ্গ ২টো, কাঁচালঙ্কা ২টো, টোম্যাটোবাটা ৪টে (৪০০ গ্রাম), কাজুবাদাম ১৫টা, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গরমমশলা ৩ গ্রাম, কসুরিমেথি ১ চা-চামচ, চিনি ৩ গ্রাম, হেভি ক্রিম ১০০ মিলি, ধনেপাতা ২ টেবলচামচ।

প্রণালী: লেবুর রস, নুন, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো, দই, হলুদগুঁড়ো, তেল, কসুরি মেথি ও আদা-রসুনবাটা দিয়ে ভাল করে চিকেন

ম্যারিনেট করুন। ঢাকা দিয়ে চিকেন ফ্রিজে ১-২ ঘণ্টা রেখে দিন। কাজুবাদাম ও টোম্যাটো একসঙ্গে মিশিয়ে, পেস্ট তৈরি করুন। ম্যারিনেটেড চিকেন ভাল করে আভেনে বা তন্দুরে বেশি আঁচে রান্না করুন, যাতে বাড়তি জল বেরিয়ে যায়। চিকেনের সাইজ় বুঝে মোটামুটি ২৫ মিনিট রান্না করুন। প্যানে মাখন হালকা গরম করে তাতে দারচিনি, লবঙ্গ ও এলাচ দিন। আদা-রসুনবাটা, কাঁচালঙ্কা দিয়ে হালকা গন্ধ না বেরনো পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। প্যানে কাজু-টোম্যাটো পেস্ট, শুকনোলঙ্কাগুঁড়ো, নুন, চিনি দিন। গ্রেভি একটু ছেড়ে না আসা পর্যন্ত রান্না করুন। গ্রেভিতে পরিমাণমতো জল দিন। আগে থেকে তৈরি করে রাখা চিকেন, কসুরি মেথি, গরমমশলা দিন ও ২-৩ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। আভেন বন্ধ করে উপর থেকে ক্রিম ছড়িয়ে দিন। স্মোকিনেস আনার জন্য চিকেনের পাত্রের থেকে কিছুটা ছোট মাপের অন্য একটি পাত্রে চারকোলের একটা টুকরো জ্বালান। চিকেনের পাত্রের মধ্যে প্লেস করুন। চারকোলের উপরে ৪-৫টা লবঙ্গ ও সামান্য ঘি ছড়িয়ে দিন। ধোঁয়া বেরনো শুরু হলে পাত্র ঢাকা দিয়ে রাখুন। ৩-৪ মিনিট পর ঢাকনা সরিয়ে চারকোলের পাত্রটা তুলে নিন। ধোঁয়ার গন্ধমাখা কাবাব পরিবেশন করুন।


গোয়ান ফিশ রেকেডো টিক্কা

গোয়ান ফিস রেকেডো টিক্কা

উপকরণ: কাঁটা-ছাড়ানো বড় মাছ ৬ পিস (প্রতিটি ৬০ গ্রাম), কাশ্মীরিলঙ্কা ১০ গ্রাম, আদা ১০ গ্রাম, রসুন ১০ গ্রাম, গোটা জিরে $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, গোলমরিচ $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, দারচিনি ১টি (১ ইঞ্চি), গোটা মেথি $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, গোটা সরষে $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, হলুদ $^{১}/_{৪}$ চা-চামচ, চিনি ১ চা-চামচ, ভিনিগার ১০০ মিলি, নুন স্বাদমতো, কোকোনাট ফেনি (বাদও দিতে পারেন)।

প্রণালী: আদা, রসুন, কাশ্মীরিলঙ্কা, গোটা জিরে, গোটা মেথি, গোলমরিচ, দারচিনি, গোটা সরষে, হলুদ, চিনি, ভিনিগার, নুন, কোকোনাট ফেনি ব্লেন্ড করে, ম্যারিনেড তৈরি করুন। উপকরণগুলো ভিনিগারে আগের রাত থেকে ভিজিয়ে রাখতে পারেন ভাল পেস্টের জন্য। মাছের পিসগুলোকে ভাল করে ম্যারিনেডে মাখান ও ঘণ্টাদুয়েক ফ্রিজে রাখুন। শিকে ম্যারিনেটেড পিসগুলিতে লাগিয়ে তন্দুরে ১০-১৫ মিনিট গ্রিল করুন। প্যানেও গ্রিল করা যেতে পারে। লাল হয়ে এলে লেবুর রস, জিরেগুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।


বালুচি দই কাবাব

বালুচি দই কাবাব

উপকরণ: জল-ঝরানো দই ২০০ গ্রাম, ছোট পেঁয়াজ ১টা, ধনেপাতাকুচি ২ টেবলচামচ, কাঁচালঙ্কাকুচি ২টো, আদাকুচি ১০ গ্রাম, রসুনকুচি ১০ গ্রাম, পাউরুটি ৪ পিস, জল ৪ টেবলচামচ, গোলমরিচ ১ চা-চামচ, তেল, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী: একটি পাত্রে জল-ঝরানো দই, পেঁয়াজকুচি, আদাকুচি, রসুনকুচি, ধনেপাতাকুচি, লঙ্কাকুচি মিশিয়ে ভাল করে মাখুন। নুন ও গোলমরিচ মেশান। পাউরুটির ধারের অংশ কেটে বাদ দিন। একটা করে টুকরো জলে ভিজিয়ে, রোলিং পিনের সাহায্যে পাতলা করে ফ্ল্যাট করুন। এক টেবলচামচ দইয়ের মিশ্রণ রুটির মাঝে দিন। চারধারে অল্প জল দিয়ে, মসলিন কাপড়ের উপর রেখে ভাল করে মুড়ে নিন। দু'দিক দিয়ে ব্রেডগুলো কাবাবের পুর সহ রোল করুন এমনভাবে, যাতে ভেঙে না যায়। ডিপফ্রাই করে, পরিবেশন করুন।

দেখলেন তো, কাবাব খেতে ইচ্ছে করলেই রেস্তঁরা অনলাইনের শরণ নিতে হয় না?

যোগাযোগ: ৭৪৩৯৯৯৯৭৬০



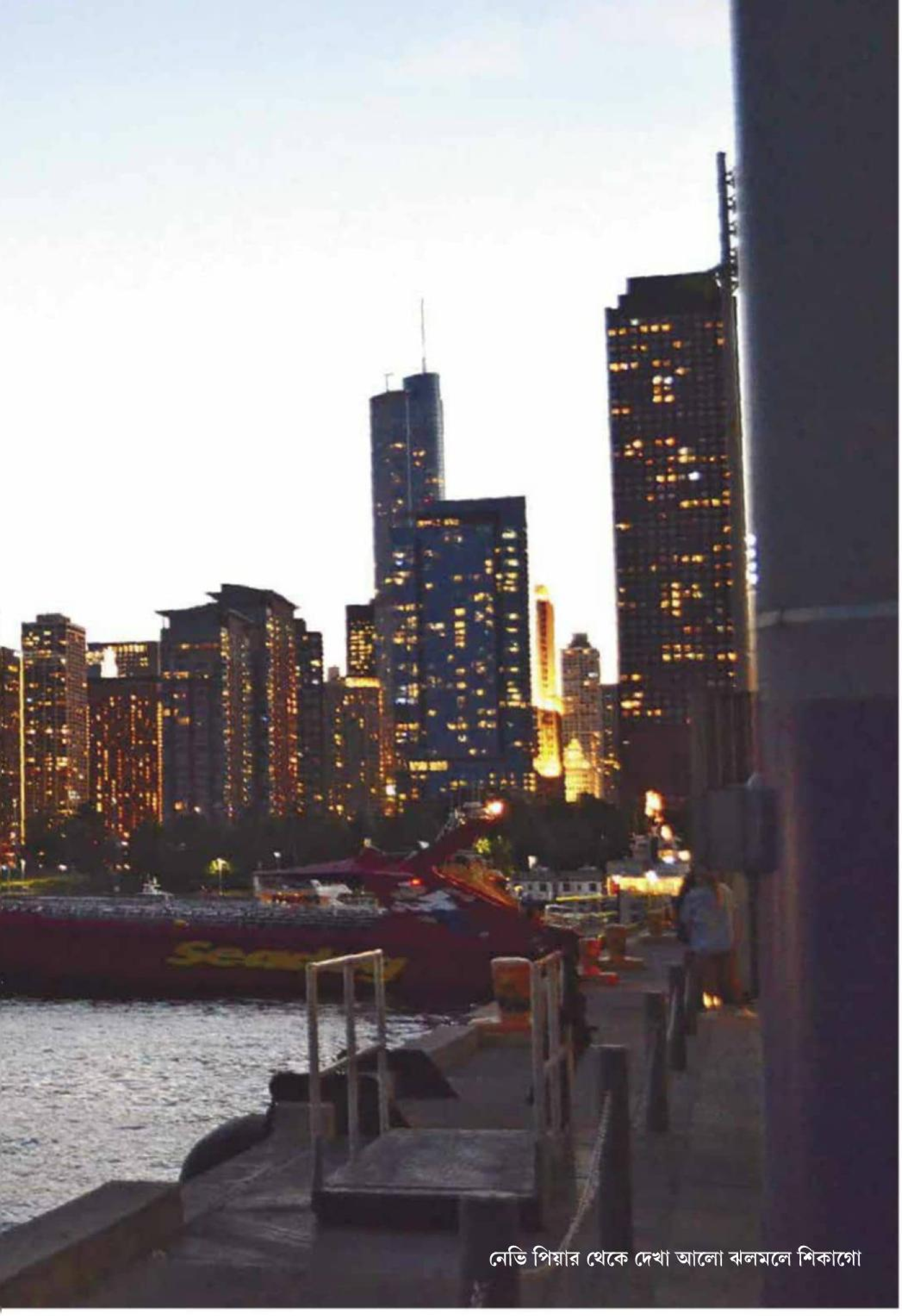
ধনেপাতায় থাকে ভরপুর ভিটামিন সি যা আমাদের চোখের জন্য খুব উপকারী। এছাড়া রক্ত থেকে সব অশুদ্ধি বের করে দিতেও সাহায্য করে ভিটামিন সি।



ঐতিহ্য আর আধুনিকতার শিকাগো

পরিচিত নাম 'উইন্ডি সিটি'। মিশিগান নদীতীরে অবস্থিত এই শহরেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই আবেগ বুকে নিয়ে শিকাগো ঘুরে এলেন সুমনা চক্রবর্তী।

গরম পড়তেই প্লেনের টিকিট কেটে বসলাম শিকাগো যাব বলে। শিকাগো বেড়ানোর একেবারে যথার্থ সময় হল গরমকাল মানে মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস। সেপ্টেম্বরের পর থেকেই হাওয়ায় লাগে কাঁপন, হেমন্তের হাত ধরে জাঁকিয়ে বসে ঠান্ডা, তার সঙ্গে আকাশের বুক থেকে ঝরে পরে বরফকণারা, যা গোটা শহরের বুকে সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়। তাই বেছে নেওয়া গরমকালকেই। শিকাগো শহর হল আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। শিকাগো মানেই মোহময়ী নীল মিশিগান নদী, যাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আকাশচুম্বী অট্টালিকা এবং মন্ত্রমুগ্ধকর স্থাপত্য। এছাড়া এখানে দেখা মেলে 'সু' ডাইনোসরাসের। ১৯৯০ সালের ১২ অগস্ট সুসান হেনড্রিকসন সাউথ ডাকোটা থেকে এই টিরানোসরাস রেক্স-এর ফসিল আবিষ্কার করেছিলেন। আবিষ্কারকের ডাক নাম ছিল সু, তাঁর নামেই ডাইনোসরাসের নামকরণ হয় Sue। বর্তমানে সু-এর স্থায়ী বাসস্থান হল শিকাগোর ফিল্ড মিউজ়িয়াম। শিকাগো শহরটাকে আদ্যপ্রান্ত উপলব্ধি করতে গেলে সপ্তাহখানেক সময় হাতে নিয়ে যাওয়াই ভাল। প্লেনে যেতে যেতেই এক শিকাগোবাসীর সঙ্গে আলাপের মাধ্যমে জানতে পারলাম, কী কী দর্শনীয় স্থান রয়েছে সেখানে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিলেনিয়াম পার্ক, ক্লাউড গেট, আর্ট মিউজ়িয়াম, ১০৩ তলা উইলিস টাওয়ার বা স্কাই ডেক, আর্ট মিউজ়িয়াম, মিশিগান রিভারের ধারে নেভি পিয়ার আর সর্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা মঞ্চ ও সভাস্থল। শিকাগো শহরে এয়ারপোর্টের কাছেই নিয়েছিলাম হোটেল। বুক করে নিয়েছিলাম একটি রেন্টাল কারও। দুপুর দুটোর ফ্লাইট সান দিয়াগো থেকে। শিকাগো পৌঁছনোর কথা রাত দশটায়। কিন্তু বাঁধ সাধল খারাপ আবহাওয়া। গরমকালে শিকাগোতে ঝড়,

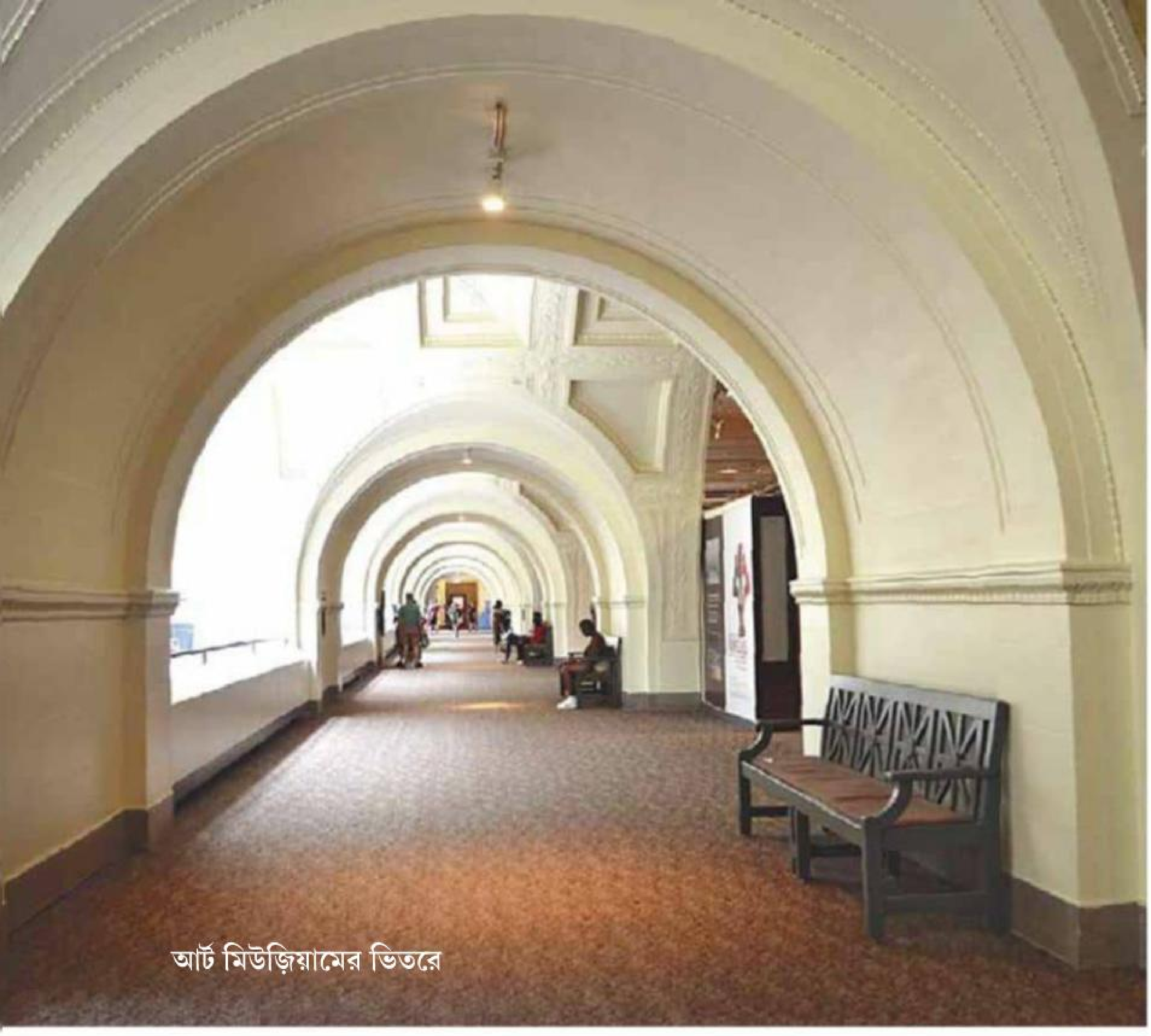


নেভি পিয়ার থেকে দেখা আলো ঝলমলে শিকাগো

বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির দেখা মেলে। প্লেনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঘটতে চলেছে। দেখলাম মিশিগান নদীর উপর দিয়ে ও'হেয়ার এয়ারপোর্টে প্লেন নামতে গিয়ে হঠাৎ করে আবার উপরের দিকে উঠে চলেছে। পাইলট টিংটাং শব্দ করে জানিয়ে দিলেন, অত্যন্ত বাজে আবহাওয়ার জন্য প্লেন ল্যান্ড করতে পারছে না। প্লেন নিয়ে পাইলট বাইবাই করে নদীর উপর ঘুরতে লাগল। আতঙ্কে প্লেনের মধ্যেই সবাই হইহই করে উঠলাম। চোখ বুজে ডাক দিলাম আমাদের দেবদেবীদের। মনে মনে বললাম, বিপদ থেকে রক্ষা কর। মিনিটকুড়ি পর বৃষ্টির রেশ একটু কম হওয়াতে বিমানবন্দরে এসে নামলাম। সেই রাত হোটেলেই রাত্রিযাপন। পরদিন সকালবেলা হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে আমাদের গন্তব্য ছিল মিলেমিয়াম পার্ক, আর্ট মিউজ়িয়াম ও তার সংলগ্ন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা স্থল। গাড়ি নিয়ে চলতে শুরু করলাম মিলেনিয়াম পার্কের উদ্দেশে। শিকাগো শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে সবুজের সমারোহ। এখানে শীতের বরফগলা জল আর গরমের সময় উষ্ণ আবহাওয়ার দরুন গাছগুলির রং গাঢ় সবুজ ও সতেজ। রাস্তার দু'ধারে শুধুই সবুজের সমারোহ। কিছু কিছু গাছের সারা অঙ্গে আবার সাদা ফুল রাজকন্যের মুকুটের মত উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। সুন্দর সাজানো শহর, চলতে চলতে দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। মিনিটচল্লিশ ড্রাইভ করে এসে উপস্থিত হই মিলেনিয়াম পার্কে। এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করে কলম্বাস রোডে এসে দাঁড়ালাম। এখানেই স্বামীজির বক্তৃতা স্থল, যা এখন 'আর্ট ইনস্টিটিউট অফ শিকাগো' নামে পরিচিত। টিকিট কেটে জানতে পারলাম স্বামীজির ভাষণ স্থল দুপুর দুটোয় বন্ধ হয়ে যায়। তাই ওটি সর্বপ্রথম দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেন গাইড। ঝাঁ চকচকে আর্ট ইনস্টিটিউটের ভিতরে কিছুটা পথ অতিক্রম করে দাঁড়াই সভাকেন্দ্রে। দেওয়ালের গায়ে স্বামীজির ছবি লাগানো। সভাস্থলে পা রাখতেই শরীর জুড়ে রোমাঞ্চ খেলে গেল। মনে তখন একটাই উপলব্ধি। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আজ রাস্তাঘাট ও যানবাহন সহজলভ্য। কিন্তু ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ যে কী কষ্টসাধন করেছিলেন, তা আমাদের কল্পনার অতীত। গাইড এসে সভাস্থলের দরজা খুলে দিলেন। গ্যালারির মতো করে চেয়ার পাতা। সভা মঞ্চ হালকা বাদামি রঙের কাঠ দিয়ে মোড়া, সঙ্গে আছে ঝকঝকে পর্দা ও পোডিয়াম। পোডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার লোভ সামলাতে পারলাম না। তুলে ফেললাম বেশ কয়েকটা ছবি। দেশ বিদেশ থেকে ঘুরতে আসা বহু পর্যটকদেরও



মিশিগান নদী



আর্ট মিউজ়িয়ামের ভিতরে





ডাইনোসরের জীবাশ্ম

ছবি তুলে দিলাম। তাঁরাও আমারই মতো রোমাঞ্চিত এবং আজকের দিনের সাক্ষী হতে পিছপা নন মোটেই। এরপর গোটা আর্ট ইনস্টিটিউট ঘুরে দেখলাম। সেখানে আমাদের দেবদেবীদের বিভিন্ন সময়ের স্থাপত্য রয়েছে। এছাড়া রয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহিত পেন্টিং। এগুলো স্পর্শ করা একদমই নিষেধ। ছড়িয়েছিটিয়ে প্রচুর গার্ড রয়েছে তা পর্যবেক্ষণের জন্য। আর্ট ইনস্টিটিউটের ঠিক অপর প্রান্তেই অবস্থিত মিলেনিয়াম পার্ক। এটিকে শহরের প্রাণকেন্দ্র বলা যেতে পারে। আছে সুদৃশ্য আকাশচুম্বী অট্টালিকা। এই মিলেনিয়াম পার্কেই আছে আর-এক ভারতীয় অনীশ কপূরের ডিজ়াইন করা স্থাপত্য 'ক্লাউড গেট'। ১২ ফিট উঁচু এর খিলান বা আর্চ, আর পৃষ্ঠতলে তরল পারদের প্রলেপ দেওয়া বলে শিকাগো স্কাই লাইনের প্রতিফলন এটিতে দেখা যায়। ভ্রমণপিপাসুরা নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখার জন্য ভিড় করেন এখানে। দুপুরের রোদ্দুরে পৃষ্ঠতল গাঢ় নীল রং ধারণ করে। ক্লাউড গেট এক সত্তায় পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই প্রতিনিধিত্ব করে। এই চিন্তাধারা থেকেই এটির ডিজ়াইন করেছিলেন ডিজ়াইনার অনীশ কপূর। ভয়ঙ্কর সুন্দর এই ক্লাউড গেট দেখে ভারতীয় হিসেবে সত্যিই গর্ব বোধ করছিলাম। দিন শেষ, রোদের তেজও শরীরকে বেশ ক্লান্ত করে তুলেছে। তাই শিকাগো শহরের বিখ্যাত ডিপ ডিশ পিৎজ়া তুলে নিয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম। এখানকার এই পিৎজ়া অন্য যে কোনও পিৎজ়ার থেকে একদমই আলাদা। শিকাগো ঘুরতে এলে এই



ফিল্ড মিউজ়িয়ামের অন্দরে

পিৎজ়ার রসাস্বাদন একবার করতেই হবে। পরেরদিন ঠিক করলাম গাড়ি করেই প্রথমে গোটা শিকাগো শহরটা দেখে নেব। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সংস্কৃতি প্রচলিত। খাদ্যাভ্যাস, কথাবার্তা সবকিছুই এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে বদলে যায়। এমনকী গাড়ি চালানোর ধরনও। ব্যস্ত শহর বলে এখানকার মানুষ দ্রুত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই ছবির মতো সুন্দর শহরে ইতিউতি গাড়ি চালিয়ে ঘুরতে মন্দ লাগে না। গরমকালে দিনের বেলায় এখানে তাপমাত্রা বেশ প্রবল। তাই সঙ্গে জল রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। তবে বিকেলের দিকে গরম কমে যায়। এখানে হাওয়া চলে বেশ দ্রুত বেগে। তাই শিকাগোকে Windy City বলা হয়। এসে পৌঁছই মিশিগান নদীর গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা নেভি পিয়ারে। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল নামছে শহরে। ম্রিয়মান সূর্যের আলো উচ্চ অট্টালিকার গায়ে খেলে বেড়াচ্ছে, আর তার প্রতিফলন ঘটেছে মিশিগানের ঢেউ খেলানো নদীর জলে। টলটলে নীল জলে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ছোট ও বড় নৌকা। জলের ধারে পথচারীদের হাঁটার জন্য আছে সুদৃশ্য পথ, ক্লান্ত পথিকদের জন্য আছে বসার জায়গা। এর সংলগ্ন রয়েছে শপিং মল, ফাস্টফুডের দোকান আর ভ্রমণার্থীদের মন ভাল করার জন্য রয়েছে লাইভ মিউজ়িকের ব্যবস্থা। কিছু নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়, যা নিয়ে যায় নদী পরিভ্রমণে, আর কিছু নৌকা পিয়ারের ধারে নোঙর করা থাকে। এগুলো রেস্তরাঁ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। টিকিট কেটে প্রবেশ, সান্ধ্যকালীন খাওয়াদাওয়া ও পার্টি চলে এই নৌকাগুলিতে। হাঁটতে হাঁটতে দেখছিলাম নৌকাগুলোতে উপচে পড়ছে ভিড়, ভেসে আসছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের রেশ, তাতে হালকা চালে শরীর দোলাচ্ছেন মানুষ। ধীরে ধীরে পিয়ারের গায়ে সন্ধে নেমে আসে, মিটিমিটি আলো জ্বলে ওঠে পিয়ার জুড়ে। মিশিগানের গা থেকে ভেসে আসতে থাকে ঠান্ডা হাওয়া, গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে এই মনকারা দৃশ্য উপভোগ করতে থাকি। রাত ন'টা নাগাদ ফিরে আসি হোটেলে। পরের দিনের প্রথম গন্তব্য ফিল্ড মিউজ়িয়াম, যেখানে 'সু' থাকে। এছাড়া যাব দেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ভোটে জেতার





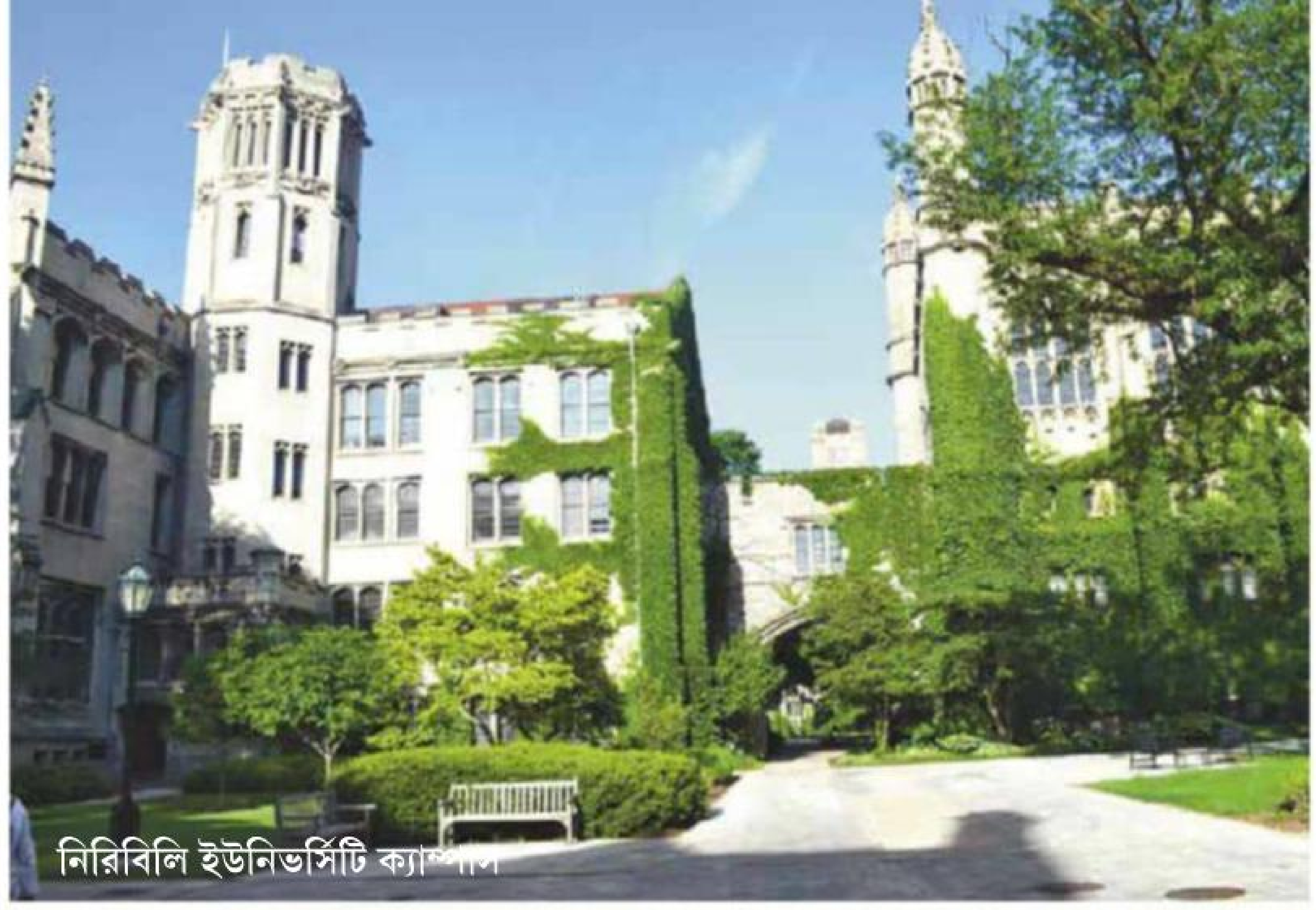
এই মঞ্চেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ

পর যেখানে প্রথম সমাবেশ করেছিলেন, সেখানে। তারপর শহরের উচ্চতম (১০৩ তলা) অট্টালিকাপরিদর্শন, যা এখানে উইলিস টাওয়ার বা স্কাই ডেক নামে পরিচিত।

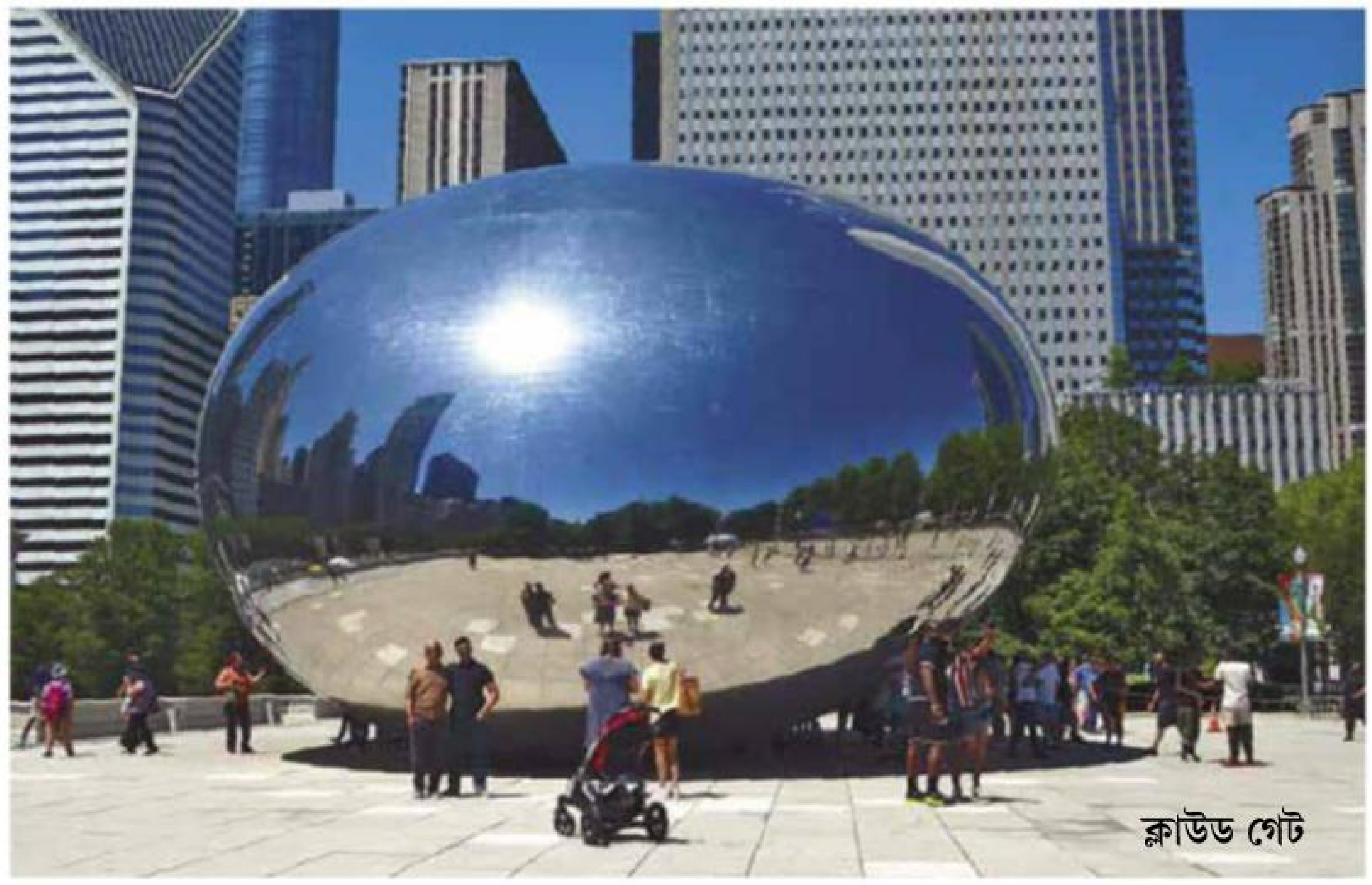
আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছি ফিল্ড মিউজ়িয়াম দেখব বলে। দেরিতে এলে এখানে গাড়ির জন্য পার্কিং পেতে খুব সমস্যা হয়। তাছাড়া এই ফিল্ড মিউজ়িয়াম ঘুরে দেখতেও প্রায় ঘণ্টাচার-পাঁচেক সময় লাগে। মিউজ়িয়াম-সংলগ্ন এলাকা জুড়ে একটি রিভার ওয়াক রয়েছে। মানে নদীর চারিধার সিঁড়ির আকারে বাঁধানো। এই পথ ধরে পদব্রজে শিকাগোবাসীরা নদীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে হাঁটেন, পরিবার নিয়ে সময় কাটান। স্বাস্থ্যসচেতনরা এই উন্মুক্ত জল ও পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় প্রাণায়াম বা যোগা করেন। গাড়ি পার্ক করে আমরাও রিভার ওয়াক সেরে নিয়ে ফিল্ড মিউজ়িয়ামে প্রবেশ করলাম। বেশ অনেকগুলো



অট্টালিকায় ঘেরা ঝাঁ চকচকে শহর



নিরিবিলি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস



ক্লাউড গেট

ফ্লোর, এবং প্রত্যেকটা ফ্লোরেই আছে বিভিন্ন দেশের বাছাই করা আর্কিটেকচার, পেন্টিং, অতীত থেকে বর্তমান সভ্যতার নিদর্শন এবং সবথেকে নজরকাড়া ডাইনোসর মিউজ়িয়াম। ঝাঁ চকচকে হলঘরের মধ্যে কাঠের পাটাতনের উপরে লম্বায় ৪০ ফিট ও উচ্চতায় ১৩ ফিট সুদর্শন 'সু' দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে ঘিরে রয়েছে জনসাধারণের উন্মাদনা ও বিস্ময়। সেলফি তোলার হুড়োহুড়ি। মিউজ়িয়ামের ভিতরেই আছে ফাস্টফুডের দোকান। খিদে পেলে এখানে বসে খেয়ে নেওয়ার সুযোগ আছে। আমরাও এখানে লাঞ্চ সেরে মিউজ়িয়ামের অপর প্রান্তে হেঁটে গেলাম প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের সমাবেশ স্থল দেখব বলে। সবুজ গালিচার মতো বিছানো ঘাস। গোটা মাঠের চারদিকে গাছের সারি, মাঠের একদিকে মিশিগান নদী, অপর প্রান্তে রাস্তা ও লোকালয়। সারাদিন সেখানে কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম স্কাই ডেক দেখব বলে। সন্ধের আগেই ওখানে পৌঁছতে হবে। কারণ ১০৩তলা উপর থেকে সূর্যাস্তের আলোয় গোটা শিকাগো শহরকে দেখতে অপরূপ লাগে। টিকিট কেটে লিফটে করে এক নিমেষেই পৌঁছে গেলাম আমেরিকার তৃতীয় উচ্চতম বিল্ডিং-এর চুড়োয়। একদিক থেকে সেটি বড় বড় কাচের জানলায় মোড়া। সেখান থেকে চোখ ভরে উপভোগ করা যায় শহরের কৃত্রিম সৌন্দর্য। একদিকে অস্তগামী সূর্য, অপরদিকে চোখধাঁধানো শিকাগোর দিগন্তরেখা। আর শহরের বুক চিরে নীল সাপের মত এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে মিশিগান নদী। ঘরের অন্য প্রান্তে আর-একটি কাচের ব্যালকনি রয়েছে, যেখানে দাঁড়িয়ে গোটা শহরকে পিছনে রেখে ভ্রমণার্থীরা স্মরণীয় মুহূর্ত ক্যামেরায় বন্দী করে রাখতে পারে। উপরে আছে গিফট শপ, মনের মতো কিছু পছন্দ হলে কিনে রাখতে পারেন। দেখতে দেখতেই সন্ধে গড়িয়ে রাত নেমে এল চারপাশে। এবার হোটেলে ফেরার পালা। এবারের মতো শিকাগো শহরের ভাললাগাগুলো লিখে ডায়েরি বন্ধ করলাম। কাল ফিরে যাব সান দিয়াগো-তে।

ছবি: লেখক

কীভাবে যাবেন

কলকাতা, মুম্বই ও দিল্লি থেকে প্লেনে শিকাগোর ও'হেয়ার এয়ারপোর্টে নামতে হবে। সেখান থেকে রেন্টাল কার নিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়া যায়। এয়ারপোর্ট ও ডাউনটাউন সংলগ্ন প্রচুর হোটেল আছে। বাজেট অনুযায়ী বুক করে নিতে পারেন।

কখন যাবেন

মে মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস শিকাগো ঘোরার ভাল সময়। শীতকালে না আসাই ভাল। প্রচুর বরফে দর্শনীয় স্থান ঢাকা পড়ে যায়।

কী নেবেন

এখানে গরমকালে গরম বেশ তীব্র এবং মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হয়। তাই ছাতা, টুপি,সানস্ক্রিন, সানগ্লাস, হাঁটার জন্য ভাল জুতো ও জল রাখুন। সন্ধের পর হালকা জ্যাকেট প্রয়োজন হতে পারে।

সানন্দা
বিনোদন

রঞ্জন ঘোষের ছবিতে ঋতুপর্ণা



অক্টোবরের শেষে মুক্তি পাবে রঞ্জন ঘোষের নতুন ছবি 'মহিষাসুরমর্দিনী'। এর আগে 'হৃদমাঝারে', 'রংবেরঙের কড়ি', 'আহা রে'-র মতো ছবি তৈরি করেছিলেন তিনি। ছবির ভাবনা অনেকদিন আগেই রঞ্জনের মাথায় ছিল। তাঁর কথায়, ''দুর্গাপুরে বড় হয়েছি। ওখানে ছোট থেকেই দুর্গাপুজোর সঙ্গে একটা কানেক্ট ছিল। ২০১২-তে 'নির্ভয়া'র ঘটনা পুরো দেশের মতো আমাকেও গভীরভাবে নাড়া দেয়। তখন মনে হয়, একদিকে আমরা এত ঘটা করে দুর্গাপুজো করি, অন্যদিকে আমাদেরই দেশে একটি মেয়ের সঙ্গে এমনটা হয়! তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে কোনও মহিলার উপর নির্যাতন, ডিসক্রিমিনেশনের খবর। এতগুলো বছর ধরে নোটস নিতাম, ভাবতাম। মনে হত, মাতৃগর্ভ থেকে মাতৃত্ব পর্যন্ত একটি মেয়ের উপর কী কী অন্যায় হয়। যেমন ধরুন, আমাদের বাড়িতে হাউজ়হেল্প না এলে বাড়ির বোন-মা-দিদিরা সেই কাজ করবে। এখন হয়তো অনেক কিছু পালটাচ্ছে। তবুও খাপ পঞ্চায়েত হচ্ছে, অ্যাসিড অ্যাটাক-গ্যাংরেপ হচ্ছে। আরও নানা বিষয় নিয়ে মনের মধ্যে প্রচুর ক্ষোভ, ঘৃণা জন্মাচ্ছিল। সেখান থেকেই এই ছবির ভাবনা।'' তবে ছবির মাধ্যমে যে কোনও বার্তা দিতেই হবে এমনটা মনে করেন না তিনি। ''এই গল্পটা লেটার অফ অ্যাপোলজি বলতে পারেন। একটি মেয়ে যদি না বাঁচে, তাহলে পৃথিবী বাঁচবে না, এটাই বক্তব্য'' বললেন তিনি। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে নিয়ে এটি তাঁর তিন নম্বর ছবি। এছাড়া রয়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। থিয়েটার জগতের অসংখ্য মুখ রয়েছেন ছবিতে। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ছবিতে একটি বাড়ির মালিক, তিনি অ্যাস্ট্রোনট হতে চলেছেন। সেই বাড়িতে চারজন ভাড়াটে থাকেন। যে রাতের ঘটনা সেই রাতে কয়েকজন আগন্তুক আসেন সেই বাড়িতে। তারপরেই গল্প মোড় নেয়। শুটিং হয়েছে মূলত চুঁচুড়ায়।



সানন্দা
রিভিউ

গান



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস '২২শে শ্রাবণ' উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হল ওপার বাংলার প্রখ্যাত শিল্পী অদিতি মহসিনের একক সঙ্গীতানুষ্ঠান 'একক অদিতি'। সেনকো গোল্ড ও বেহালা সাংস্কৃতিক সম্মিলনীর যৌথ প্রয়াসে কলকাতার কলাভবনে এদিন গানে গানে স্মরণ করা হয় কবিগুরুকে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই অদিতি মহসিনকে উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে বরণ করা হয়। কথায়, গানে, গল্পে শিল্পী তাঁর সঙ্গীত জীবনের বহু অভিজ্ঞতা দর্শকের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তাঁর জীবনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। শিল্পীর কণ্ঠে বিচিত্র, প্রেম, প্রকৃতি, নাট্যগীতি ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের গানে মঞ্চ মুখরিত হয়ে উঠে। 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে' রবীন্দ্রসঙ্গীতটির হাত ধরে শিল্পী অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন। এরপর একে একে'আমারে তুমি অশেষ করেছ', 'সুখহীন নিশিদিন', 'তুমি কি কেবলই ছবি', 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' ইত্যাদি গান দর্শকের মাতিয়ে তোলে। প্রেম পর্যায়ের শুরুতে পূরবী রাগে 'দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে' গানটি প্রত্যেক দর্শকের মনে দাগ কেটে যায়। বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে কিছু নাট্যগীতি যেমন 'যখন এসেছিলে' (শাপমোচন), 'সকলি ফুরাল, স্বপনপ্রায়' (কালমৃগয়া) ইত্যাদি। দর্শকের অনুরোধেও শিল্পী বেশ কিছু গান পরিবেশন করেন। বাদ্যযন্ত্রের অসামান্য সঙ্গত ও দেবাশিস বসু'র অনবদ্য সঞ্চালনায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতানুষ্ঠানটি সকলের মন ছুঁয়ে যায়।

সানন্দা
কেনাকাটা

দেখুন বাছুন কিনুন

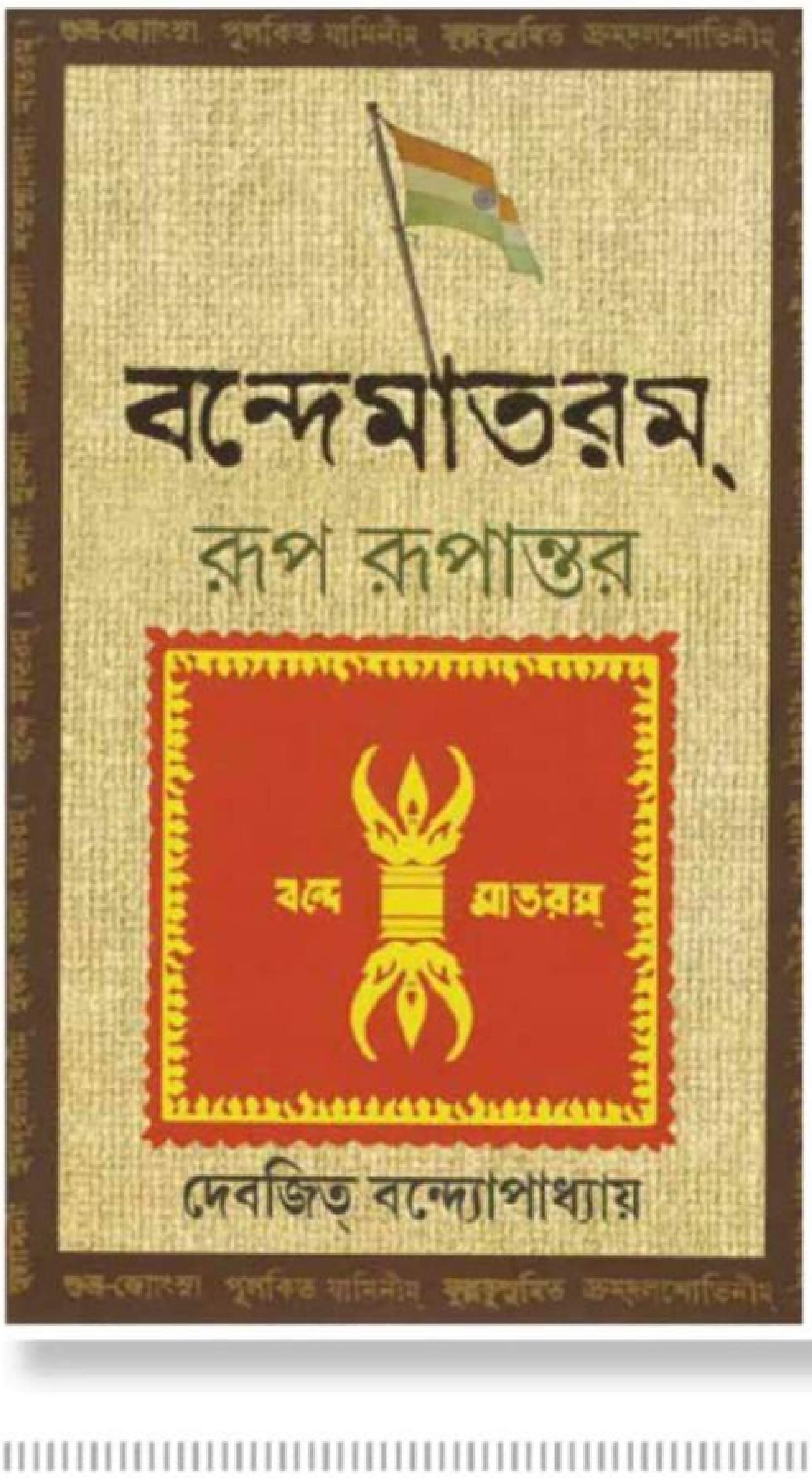
মুম্বইয়ের পাঁচতারা হোটেলে লঞ্চ হল হিরের গয়নার এক্সক্লুসিভ কালেকশন। খুব শীঘ্রই দেশের ফ্ল্যাগশিপ স্টোর ও অনলাইনে পাওয়া যাবে গয়নাগুলো।



মুম্বইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হল ডি বিয়ারস গ্রুপের তিনদিনব্যাপী বর্ণাঢ্য এক ফোরাম। এই ফোরামেই লঞ্চ হল ফরএভারমার্ক অবন্তী কালেকশনের ফার্স্ট লুক। রিং, পেনড্যান্ট থেকে ইয়ারিং... নতুন কালেকশনে রয়েছে সবকিছুই। আধুনিক মেয়েদের কথা মাথায় রেখে স্লিক ও স্মার্ট ডিজ়াইনের গয়নাগুলি ১৮ ক্যারাট হলুদ, সাদা ও রোজ় গোল্ডে উপলব্ধ। সারা দেশের ডি বিয়ারস ফরএভারমার্ক অথরাইজ়ড রিটেলারদের কাছে ও অনলাইনে (www.forevermark.com) কিনতে পারবেন হিরের গয়নাগুলি। আর এসবই ক্রেতারা পাবেন ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে।

সানন্দা
বই

দেশের কণ্ঠস্বরের বহুমাত্রা



বন্দে মাতরম্ রূপ রূপান্তর, **দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়**
পত্রভারতী

বন্দে মাতরম্। নিজেই নিজের পরিচায়ক এই শব্দবন্ধ, দেশের কণ্ঠস্বর, আপামর ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেমের দীক্ষা। সুদূর বঙ্গপ্রান্তে বসে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি যেভাবে জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে, তা ব্যাখ্যাতীত। এই ধ্বনিকে নানাভাবে সৃষ্টি করেছেন বহু মানুষ। তৈরি হয়েছে নানা অনুনাদ। বিদ্যালয় বন্দনা থেকে, থিয়েটার, জনজাগরণ থেকে চলচ্চিত্র, আজ পর্যন্ত বন্দে মাতরম এর যত সুর রচিত হয়েছে, সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ সংকলন করেছেন দেবজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইটিতে। লেখকের অসামান্য পরিশ্রমের নিদর্শন এই বই, যাতে সংকলিত হয়েছে বন্দে মাতরমএর সমস্ত সুরের স্বরলিপিও। লেখা আছে ইতিহাস ও রাগ রাগিণীর বিস্তার। সুরের এই বিস্তার ও জাতীয়তাবাদের এই ধারক ও বাহকের গভীর ইতিহাস, গবেষণা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এই নিরলস প্রয়াসক্ সাধুবাদ জানাতেই হয়।



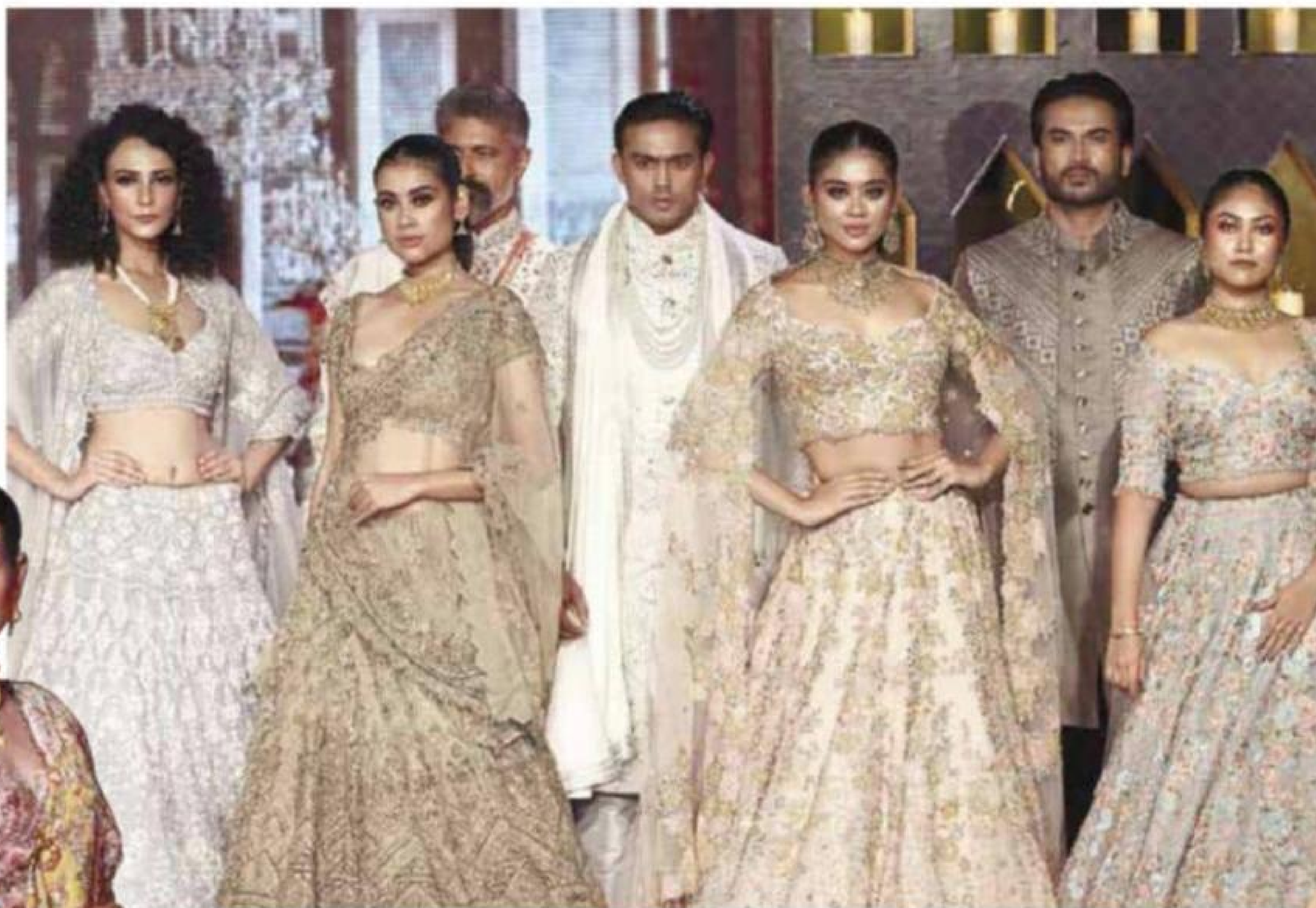




শহরে ঝলমলে বিয়ের আসর

সম্প্রতি শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে অনুষ্ঠিত হল জমজমাট এক ব্রাইডাল ফ্যাশন শো তথা বিয়ের আসর। ঘুরে এলেন মৌমিতা সরকার।

সম্প্রতি শহরে জাকজমক সহকারে সম্পূর্ণ হল বিয়ের অনুষ্ঠান। তবে যে-সে বিয়ে নয়, এ এক অভিনব বিয়ের আসর, যার নাম 'শাদি বাই ম্যারিয়ট বনভয়'। ফেয়ারফিল্ড ওজ়োন কনভেনশন সেন্টারে আয়োজন করা হয়েছিল এই ঝলমলে বিয়ের আসরের। বিয়ে মানেই সাজগোজ, কবজি ডুবিয়ে খাওয়াদাওয়া, গানবাজনা, আনন্দ আর হইহুল্লোড়। এই সব কিছুর আয়োজন ছিল এই অনুষ্ঠানে। 'শাদি বাই ম্যারিয়ট'-এর এই অনুষ্ঠানে ছিল গ্ল্যামারাস ফ্যাশন শো-এর আয়োজনও। কলকাতার খ্যাতনামা মডেলেরা হাঁটলেন র‍্যাম্পে। এনগেজমেন্ট থেকে ব্রাইডাল লুক, বিয়ের সাজের জমাটি ফ্যাশনেবল লুক তুলে ধরা





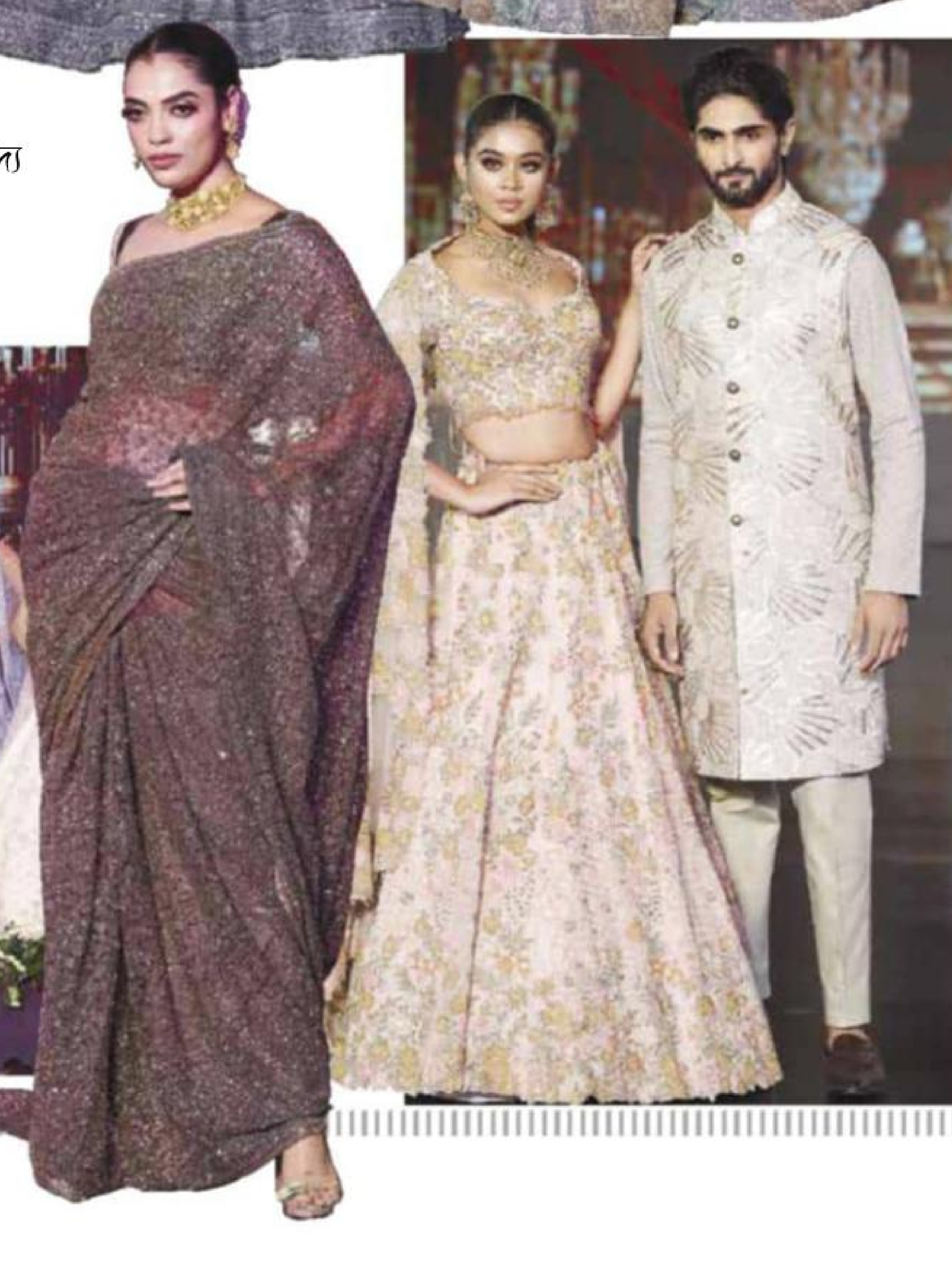




হয়েছিল এই ফ্যাশন শো-এ। ফ্যাশন ডিজ়াইনার পল্লবী পোদ্দার-এর আউটফিটসে সেজে উঠেছিলেন সকলে। ট্র্যাডিশনাল থেকে কন্টেম্পোরারি ব্রাইডাল লুক তুলে ধরা হয়েছিল সেখানে। পুরুষদের পোশাকের কালেকশনে ছিল ফ্যাশন ডিজ়াইনার রাতুল সুদের কালেকশন। র‍্যাম্পে হাঁটলেন অভিনেত্রী নুসরত জাহান, দর্শনা বণিক, রিচা শর্মা, প্রিয়ঙ্কা রতি পাল এবং রবি সাঁউ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেলিব্রিটি শাড়ি ড্রেপার ডলি জৈন। এর পাশাপাশি ছিল সেলিব্রিটি মেকআপ আর্টিস্ট আরতি নাইয়ারের ওয়র্কশপ সেশন। ফেয়ারফিল্ড বাই ম্যারিয়টের ম্যানেজার অভিষেক সচদেবের কথায়, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা বিয়ের এক অভিনব বাসর সাজিয়ে তুলেছেন। শুধু এই শহরের নয়, ভিন্ন রাজ্য ও দেশের মানুষরাও এখানে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করতে পারেন। লোকেশন, মেনু সবেতেই থাকবে অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি লুকই ছিল অসাধারণ। ফ্যাশনেবল অথচ ট্র্যাডিশনাল। আর সেই উপলক্ষে কনভেনশন সেন্টারে যেন চাঁদের হাট বসেছিল সেদিন। সবমিলিয়ে, সত্যিই অনবদ্য এক সন্ধ্যার সাক্ষী থাকল শহর কলকাতা।

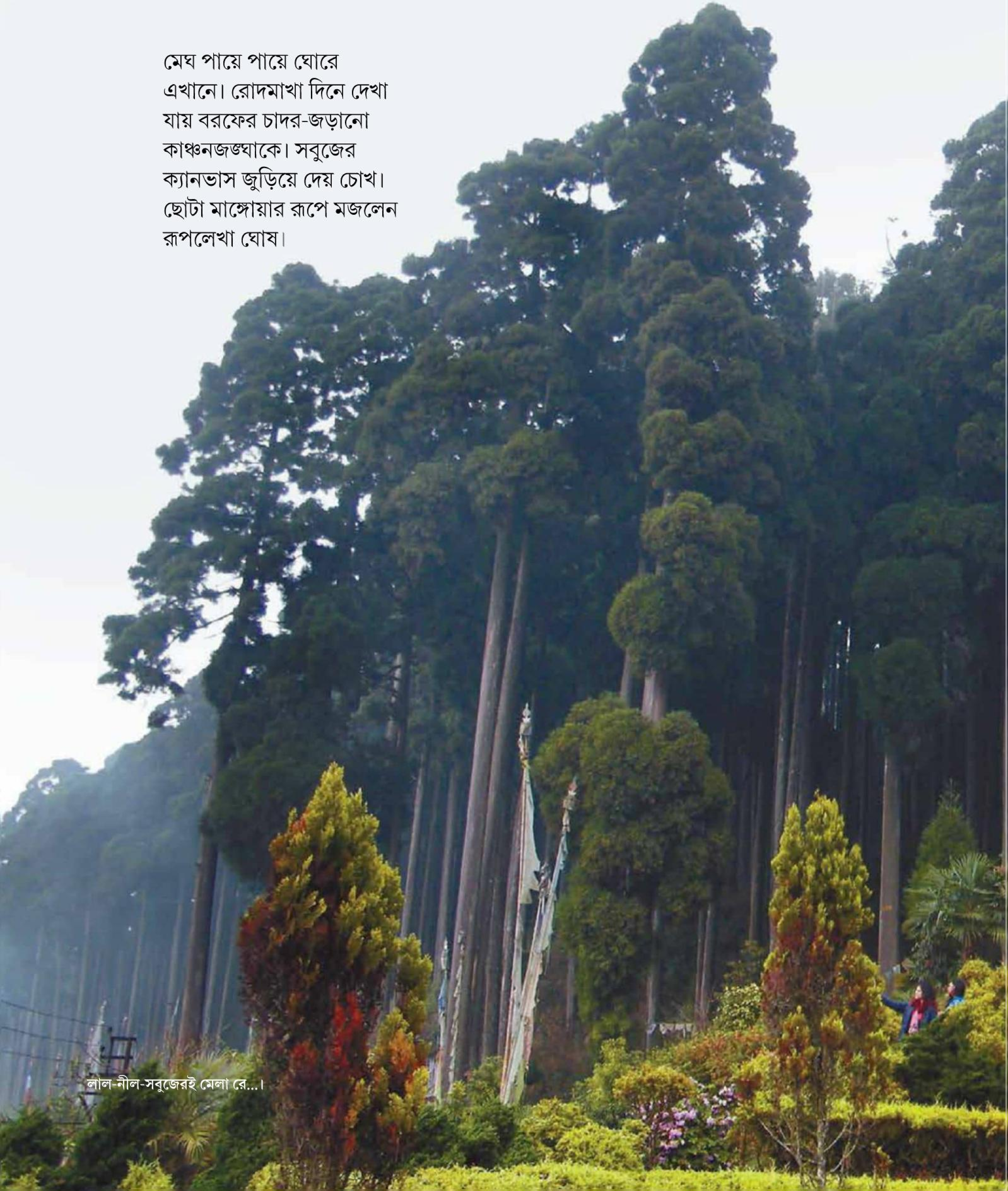
ছবি: সন্দীপ দাস





সময় যেখানে থমকে দাঁড়ায়

মেঘ পায়ে পায়ে ঘোরে এখানে। রোদমাখা দিনে দেখা যায় বরফের চাদর-জড়ানো কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। সবুজের ক্যানভাস জুড়িয়ে দেয় চোখ। ছোটা মাঙ্গোয়ার রূপে মজলেন রূপলেখা ঘোষ।



লাল-নীল-সবুজেরই মেলা রে...।




পাহাড়ের পথে...।

''উও পেশক টি গার্ডেন হ্যায়''— বড়া মাঙ্গোয়ার বারান্দায় বসে দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিতে দিতে রিসর্টের দায়িত্বে থাকা রিনাদিদিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাঁদিকের পাহাড়ের আলোগুলো কীসের। তার উত্তরে সে বলেছিল ওটা পেশক টি গার্ডেন। পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকা একটা চা বাগান। রাত বাড়লে পাহাড়টা আলোয় ঝলমল করে ওঠে। আকাশের তারারা যেন পৃথিবীতে নেমে আসে!

আমাদের গন্তব্য, ছয় হাজার ফিট উচ্চতায় ছোটা মাঙ্গোয়া। দার্জিলিং থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরের এক ছোট্ট জনপদ। সেখানে যাওয়ার আগে বড়া মাঙ্গোয়ায় এক রাত কাটিয়ে গেলাম। মাঙ্গোয়া গ্রামটা ছোট হলেও লেপচারা এটাকে দু'ভাগে ভেঙেছে, ছোটা মাঙ্গোয়া আর বড়া মাঙ্গোয়া। দুটো জায়গার মধ্যে দূরত্ব চার কিলোমিটার আর ছোটা মাঙ্গোয়ার উচ্চতা বেশি।

বড়া মাঙ্গোয়ার রিসর্টের ঘরের কাচের জানলা দিয়ে তাকালে সামনে দেখা যায়, তপস্বীর মতো দু'সারি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। পিছনের সারিটা বেশ ধূসর। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড়ের আলোগুলো দেখে মনে হয় আকাশের গায়ে কেউ যেন হিরের মালা পরিয়ে দিয়েছে। দিনেরবেলা ছোট বসতিগুলো





কুয়াশা যখন...

চোখে পড়ে। রিসর্টের সামনের রাস্তাটা ঢাল বেয়ে উঠে বড় রাস্তায় মিশেছে। বিকেলবেলা স্কুলের ছেলেমেয়েরা জিপে করে হইহই করতে করতে বাড়ি ফেরে। সূর্যের শেষ রশ্মি তাদের হাসির সঙ্গে মিশে যায়।
মার্চ মাসের এক রোদঝলমল দিনে সেবক, করোনেশন ব্রিজ, মহানন্দা স্যাংচুয়ারি, সাতাশ মাইল, রম্বি, কালিঝোরা, তিস্তা বাজার পেরিয়ে চললাম ছোটা মাঙ্গোয়ার


যত আদিম মহা দ্রুম!

দিকে। শিলিগুড়ি শহর পেরতেই পাহাড় হাতছানি দেয়। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর সঙ্গী হয় পান্না-সবুজ তিস্তা। লোয়ার মহানন্দা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারির ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। চারিদিকের ঘন জঙ্গল চিরে বেরিয়ে গিয়েছে পিচের রাস্তা। কোনও কোনও জায়গায় সূর্যের আলো ভাল করে এসে পৌঁছয় না। কালিঝোরার ঝরনা এখন শুকনো। বর্ষায় এর এক অন্য রূপ। তিস্তা বাজারের রাস্তাটা বেশ ঘিঞ্জি। দু'পাশে গায়ে গায়ে সার দেওয়া দোকান। স্থানীয় গ্রামগুলো থেকে মানুষ আসে তাদের ঘর-গেরস্থালির নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করতে। আমাদের ড্রাইভার সৌভিকও দাঁড়াল কয়েক লিটার জল ও রিসর্ট থেকে বলে দেওয়া কিছু খাবারদাবার তোলার জন্য। তিস্তা বাজার পেরোতেই রাস্তাটা হঠাৎ চড়াইয়ের দিকে বাঁক নিল। আবার শুরু হল ঘন জঙ্গল। দিন যখন শেষ হয়ে আসছে, সেই সময় বড়া মাঙ্গোয়ায় পৌঁছলাম।

এখানে দিনের বেলা খুব বেশি ঠান্ডা না লাগলেও রাতের বেলা বেশ ঠান্ডা পড়ে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামনের রাস্তাটা একেবারেই নিঝুম হয়ে যায়। চারিদিক শুনশান। নির্জনে দাঁড়িয়ে থাকে রিসর্টটা। মাঝেসাঝে কোনও এক গাড়ির হেডলাইট অন্ধকার চিরে বেরিয়ে যায়। দিনের আলো থাকার সময় দেখেছি পাহাড়ের ঢাল কেটে নানা সবজি চাষ করা হয়েছে।

রিসর্টের একপাশে বেশ ঘন জঙ্গল আর বাঁশঝাড়। বড়া মাঙ্গোয়ায় আছে এক সুন্দর কমলাবাগান। যে কোনও সময় এখানে


জিরিয়ে নেওয়ার জায়গা...।



সে এক ব্যস্ত দিন...।



ঢুকতে দেওয়া হয় না। চওড়া পিচ রাস্তার একপাশে বাগান, আর একপাশে একটা সাদা বাড়ি। এই বাড়ি লাগোয়া ছোট্ট ফ্যাক্টরিতে কমলালেবুর রস ও বিভিন্ন কমলাজাত খাবার তৈরি ও সংরক্ষণের কাজ হয়। সুন্দর সাদা বাড়িটার সামনের ঘরে সাজানো আছে বিক্রির জন্য কাচের শিশিতে জ্যাম, জেলি, কমলার রস,আর কমলার খোসা দিয়ে তৈরি জিনিস। টাকা মেটানোর কাউন্টারে দেখি ঝুড়ির মধ্যে রাখা আছে বেশ কিছু ছোট কমলালেবু আর তার পাশে একটা ফুলদানিতে সাজানো একটা ডাল,যেটাতে অনেক ছোট
ছোট কমলালেবু হয়ে আছে। দেখতে ভারী সুন্দর!

বড়া মাঙ্গোয়া যাওয়ার পথে পেরিয়ে এসেছি ত্রিবেণী। এখানে রঙ্গিত এসে মিশেছে তিস্তার সঙ্গে। চরে দাঁড়ালে সাদা বালিতে পা ডুবে যায়। নদীর একটা পাড় আগলে রেখেছে পাহাড়। এঁকেবেঁকে দুই পাহাড়ের মাঝে বয়ে চলেছে নদীটা। নুড়িপাথরের উপর বসে থাকলে হাওয়া এসে মনের শহুরে গুমোটটাকে এলোমেলো করে দেয়। চরের বালির উপর সারি দিয়ে ছাই রঙা তাঁবু ফেলা। রঙিন টেবিল-চেয়ার চোখে পড়ে এদিক ওদিক রাখা আছে। এখানকার রিভার রাফটিং পর্যটকদের খুব টানে। দেশবিদেশ থেকে পর্যটকরা আসে ক্যাম্পিং করতে। নদীর
ধারে রাত্রিবেলা,বনফায়ার, বারবিকিউও হয়।

পরের দিন বেরিয়ে , সেই পেশক টি এস্টেট দেখলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই চায়ের বাগান। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে সবুজ গালচে। পিচঢালা রাস্তা সরীসৃপের মতো বাগানটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে। গাছের মাঝে কিছু কিছু জায়গায় আকাশের মেঘ এসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে, যেন কোনওকিছুর অপেক্ষা করছে। ঢালু রাস্তা দিয়ে দলে দলে হেঁটে আসে স্থানীয় মহিলারা, পিঠের টুকরিতে পাতি (চা পাতা) নিয়ে। টুকরির মুখটা প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা, যাতে বৃষ্টি এসে কাঁচা পাতাগুলোকে ভিজিয়ে দিতে না পারে। মহিলাদের পায়ে রঙিন গামবুট, আর মুখে অমলিন হাসি।

বেশ খানিকটা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম ছোট্ট গ্রাম ছোটা মাঙ্গোয়ায়। একফালি লম্বা জমিতে তৈরি হয়েছে এক সুন্দর রিসর্ট। চারিদিকে সবুজের ক্যানভাস চোখ জুড়িয়ে দেয়। শহুরে সব চিন্তা দূরে সরিয়ে রেখে হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা এই গ্রাম। রিসর্টটির একটি দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দাঁড়িয়ে আছে আর অন্যদিকে কালিম্পং পাহাড়। আকাশ



সবুজ রাস্তা সাদা বাড়ি...।

যেদিন পরিষ্কার, সেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। আকাশের গায়ে ছবির মতো আটকে থাকে তুষার চুড়া। কালিম্পং পাহাড়ের সঙ্গে আছে আশেপাশের ছোট ছোট পাহাড়গুলোও। তাদের সামনে গভীর খাদ, চারিদিকে জঙ্গল আর ছোট বসতি। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় বাড়িগুলোর লাল রঙের চাল। একগুচ্ছ মেঘ এসে আটকে থাকে এই খাদে। একদম নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা নদী। সুর্যের আলোতে রুপোর ফিতের মতো চকচক করে। রিসর্টের পাথুরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশা ঢেকে দেয় চারিদিক। একহাত দুরের গাছটাকেও আবছা লাগে। এইরকম মেঘলা দিনে ঘরের জানলা খুললে একঝাঁক উড়ো মেঘ ঢুকে পড়ে। রঙিন কটেজগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপনমনে। সারা রিসর্ট জুড়ে নানাধরনের গাছ, টবে এবং মাটিতে। তার মধ্যে পাতাবাহার ক্যাকটাস, অর্কিড ও বাহারি ফুলের গাছ আছে। একটু বড় গাছগুলো ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। রাত নামে নিঃশব্দ পায়ে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ঢাকা পড়ে যায় অন্ধকারে। অন্যদিকে আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে কালিম্পং পাহাড়। নিচে দেখা যায় ত্রিবেণীর আলো মালার মতো সাজানো। ছোটা মাঙ্গোয়ার রাস্তা দিয়ে বিশেষ গাড়ি চলাচল করে না। হিমালয়ের এই ছোট্ট গ্রাম থাকে আপন খেয়ালে। এখানে ঘুম ভাঙে পাখির গানে। মানুষজন খুব সাদাসিধে, হাসিখুশি ও অতিথিপরায়ণ। মোট দেড়শোটি পরিবারের বাস এই গ্রামে। স্থানীয় মানুষজন চাষবাস করে দিনগুজরান করে। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে সঁপে দেওয়ার বিলাসিতা এই ছোটা মাঙ্গোয়াতেই পাওয়া যায়। রিসর্টের গেটটা পেরলেই পাকা পিচরাস্তা। সেই রাস্তা সোজা খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর পাহাড়ের গায়ে বাঁক নিয়েছে। রাস্তার ধারে সুন্দর উজ্জ্বল রংয়ের কাঠের দোতলা বাড়ি। সূর্য তখন অস্ত যাওয়ার তোড়জোড় করছে। এক মিষ্টি কিশোরীকে দেখলাম, বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওপারের জঙ্গলে ঢুকল। দা দিয়ে একগুচ্ছ ডালপালা কেটে আনল। জানতে চাইলাম কী করবে ওগুলো দিয়ে, বলল ছাগলকে খাওয়াব। নিখুঁত ঘর-গেরস্থালির ছবি দেখা যায় বাড়িগুলোর দিকে তাকালে। স্বচ্ছ কাচের জানলায় ঝুলছে নেটের পরদা, বাড়ির সামনে টবে লাগানো সুন্দর ফুলের গাছ। একপাশে বাঁধা বাড়ির পোষ্যগুলো। বর্ষার সময় ছোটা মাঙ্গোয়া সবুজে ঢেকে থাকে। জায়গাটা এমনই যে, এই গ্রামের যে কোনও জায়গাতে দাঁড়ালেই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা যায়। ছোটা মাঙ্গোয়ার

কাছেই একটি জায়গা, টাকলিং। পায়ে হেঁটেই চলে যাওয়া যায়। বনের মধ্যে দিয়ে সুন্দর পথ আছে। এই গ্রামে আছে একশো বছরের পুরোনো মনাস্টেরি। জায়গাটা যেন স্বপ্নের দেশ। আকাশের মেঘ নেমে আসে মাটিতে। কনিফেরাস গাছগুলো বাধ্য ছাত্রের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের পাতা লুকিয়ে পড়ে মেঘের আড়ালে। শান্ত নির্জন একাকী পরিবেশে যেন নিজেদের মধ্যে কথা বলে। মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই সামনে এসে পড়ে বুদ্ধের আরাধনাস্থল। সাদা মেঘের মাঝে বুদ্ধিস্ট লালনীল পতাকা উঁকি মারে।
ল নামের আর একটি জনপদ আছে কাছাকাছি। সেখানে বেশ কিছু কমলাবাগান আছে। ছোটা মাঙ্গোয়ার জঙ্গলে আছে অনেক ধরনের পাখি। এই পুরো এলাকাটা জুড়েই রয়েছে বাঁশঝাড়। এক একটা বাঁশ এতটাই মোটা যে দুটো হাতের পাতা একসঙ্গে করেও ধরা যায় না। ছোটা মাঙ্গোয়ার আবহাওয়া সব সময়ই খুব সুন্দর। মাঝে মাঝে ঘন মেঘে ঢেকে থাকে চারপাশ। শুধু ঢেকেই থাকে না, মেঘ এসে পায়ে পায়ে ঘোরে। যেদিন সূর্যিমামা উঁকি দেয় সেদিন ঝলমলে আকাশে বরফের চাদর গায়ে দিয়ে হাজির হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা। কখনও কয়েকপশলা বৃষ্টিও হয়ে যায়। রিসর্টের পোষা রাজহাঁসটা ছাড়া থাকলেও নিজের গন্ডির বাইরে বের হয় না।
ছোটা মাঙ্গোয়ায় এলে লামাহাটা, তিনচুলে ও তাকদা তো দেখতেই হয়। আধঘণ্টার পথ পেরিয়ে, ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম লামাহাটায় পৌঁছলাম। সেখানে সরকার থেকে একটা সুন্দর পার্ক বানানো হয়েছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে এই পার্ক। এখানে আছে লম্বা লম্বা পাইন আর ধুপিগাছের সারি। পার্কের ভেতরে পাহাড়ের উপর গাছগুলো এতটাই ঘন, যে সেগুলো বনের রূপ নিয়েছে। পার্কের মধ্যে এক কিলোমিটার মতো ট্রেক করে গেলে মনোরম পরিবেশে একটি জলাধার আছে। এই গ্রামে শেরপা, ভুটিয়া, তামাংদের বাস। পার্কের সামনের পিচরাস্তার ধারেই সার দিয়ে কিছু দোকান, বাড়ি, হোমস্টে।একটি বাড়িতে দেখলাম পূজা-অর্চনা হচ্ছে। বারান্দার সামনে রাখা আছে হোমকুন্ড। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম গৃহের কল্যাণ আর পুর্বপুরুষদের আত্মার শান্তির জন্য এই পুজো করা হচ্ছে। আর একটি বাড়ির বারান্দায় দেখি একটি মাইলফলক, যার গায়ে লেখা আছে সেখান থেকে তিস্তার দুরত্ব। অর্থাৎ যেখানে মাইলফলকটি আছে,সেখানেই বাড়িটি তৈরি হয়েছে।
লামাহাটা থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে আর একটা গ্রাম তিনচুলে। ছবির মতো সুন্দর জায়গা। একসময় এখানে গভীর জঙ্গল ছিল। তিনচুলে থেকে ছোটা মাঙ্গোয়া যাওয়ার বারো কিলোমিটার পথটা বেশ খারাপ।
তিনচুলা এবং লামাহাটার থেকে কিছুটা বড় জায়গা তাকদা। এখানে স্কুল আছে, যেখানে বিশেষ যত্ন নিয়ে তিব্বতি ভাষা সেখানো হয়। এখানে বেশ কিছু বড় দোকানও আছে। তাকদার উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার একশো ফিট। চা বাগান, অর্কিড, পাইনের জঙ্গল নিয়ে এই গ্রাম। পাইনের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যাওয়ার মজাই আলাদা। তাকদা শব্দটা এসেছে 'তুকদা' থেকে। লেপচা ভাষায় যার মানে কুয়াশা। জায়গাটা বেশিরভাগ সময় কুয়াশায় ঢাকা থাকে। এখানে ব্রিটিশদের বেশ কিছু বাংলো আছে, যেগুলোর স্থাপত্য সত্যি নজরকাড়া। আর আছে তাকদা ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্ট। অর্কিড বাগানে অনেক বিরল প্রজাতির অর্কিড দেখা যায় যেগুলো পাহাড়ের অনেক উচ্চতায় থাকে।
ছোটা মাঙ্গোয়া থেকে ফিরে আসার পরেও পাহাড়ের গায়ের মেঘগুলোর মতো মনটা যেন সেখানেই আটকে থাকে। প্রকৃতি বারবার পিছু ডাকে।

ছবি: লেখক


ছবির মতো সুন্দর...



রাহুল মিশ্র-র ফ্যাশন শো



অমিত অগ্রবালের কালেকশন

Glamarous ফ্যাশন উইক

সম্প্রতি রাজধানীর মাটিতে অনুষ্ঠিত হল 'এফডিসিআই ইন্ডিয়া কুতুর' ফ্যাশন উইক। এফডিসিআই ও লোটাস যৌথভাবে আয়োজন করেছিল এই ফ্যাশন উইকের। অনুষ্ঠানে ছিল অমিত অগ্রবাল, অনামিকা খন্না, অঞ্জু মোদী, রাহুল মিশ্র, তরুণ তহলিয়ানি, বরুণ বহেল প্রমুখ ফ্যাশন ডিজ়াইনারদের নতুন কালেকশন। র‍্যাম্পে দেখা গেল রশ্মিকা মন্দানা, রাজকুমার রাও, অদিতি রাও হায়দারির মতো একাধিক ব্যক্তিত্বদের।

ছবি সৌজন্য: সন্দীপ দাস



তরুন তহলিয়ানি-র শো



অদিতি রাও হায়দারি



বরুণ বহেলের শো-এ রশ্মিকা মন্দানা



অনামিকা খন্নার শো-এ রাজকুমার রাও



শিল্পসামগ্রীর সম্ভার

শহরে আত্মপ্রকাশ করল আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের নতুন ডিজ়াইনার স্টোর। বিভিন্ন জায়গার আর্টিজ়ানদের নিজস্ব প্রডাক্ট শোকেস করার প্ল্যাটফর্ম করে দিতে উদ্যোগী এই স্টোর। নানারকম শিল্পসামগ্রীর সম্ভার এখানে পাবেন ক্রেতারা। সব প্রডাক্টই ১০০ শতাংশ সাস্টেনেবল, রিইউজ়েবল ও ইকো-ফ্রেন্ডলি বলে জানালেন স্টোরের দুই কর্ণধার মিত্তু অগ্রবাল ও তনিশি অগ্রবাল। স্টোর লঞ্চের দিন হাজির ছিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, তৃণা সাহা, স্বস্তিকা দত্ত, অর্জুন চক্রবর্তী, ধ্রুব মুখোপাধ্যায়-সহ সিনেমা জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

ডায়েট ক্লিনিক

ডায়েটিশিয়ান রিঙ্কি বিশ্বাস সম্প্রতি ব্যারাকপুরে উদ্বোধন করলেন তাঁর ক্লিনিকের। ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০০০



ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন তিনি। এদিন উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত। ব্যস্ত জীবনেও কীভাবে ভাল থাকা যায়, তার টিপসও তিনি নিলেন ডায়েটিশিয়ানের কাছ থেকে।



মেডিক্যাল বাসের উদ্বোধন

চিকিৎসা ব্যবস্থাকে 'দুয়ারে' পৌঁছে দিতে শহরে উদ্বোধন হল পূর্বভারতের বৃহত্তম মেডিক্যাল বাস 'হসপিটাল অন হুইলস'-এর। ৩২ ফুট দীর্ঘ এই মেডিক্যাল বাসে চক্ষু পরীক্ষা, দাঁত, প্রাথমিক রক্ত পরীক্ষা, ই.সি.জি ও প্যাথোলজিক্যাল সব রকমের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। উদ্বোধনে হাজির ছিলেন ডা. কুণাল সরকার। যাঁর কথায়, ''এই অভিনব প্রচেষ্টা বাংলার অনেক প্রান্তিক মানুষদের পরিষেবা পেতে সাহায্য করবে''। চব্বিশ ঘণ্টা এই মেডিক্যাল বাসে বিভিন্ন শাখার অন্তত পাঁচ থেকে ছ'জন ডাক্তার উপস্থিত থাকবেন। আগামী দিনে শহরের বাইরেও এই পরিষেবা চালু করার ভাবনা রয়েছে।

হ্যান্ডলুম ডে সেলিব্রেশন

সম্প্রতি স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে একটি লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত হল হ্যান্ডলুম শাড়ির ফ্যাশন শো 'দ্য ট্রেজ়ার অফ ইন্ডিয়ান উইভস'। ফ্যাশন ওয়াক, কুইজ় নিয়ে জমজমাট এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টজনেরা। নানা হ্যান্ডলুম শাড়ি, যেমন, টাঙ্গাইল, ঢাকাই, বেনারসি, পৈঠানি সম্পর্কে জানা গেল অজানা অনেক তথ্য। উঠে এল হ্যান্ডলুম কারিগরদের পাশে থাকার কথাও।





স্বাধীনতা দিবসের গান

স্বাধীনতা দিবসের কথা মাথায় রেখে শহরে নানা অনুষ্ঠান চলছে সপ্তাহজুড়ে। তাতেই একটি সংযোজন হল, এক বিশেষ গানের মুক্তি। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশ হল নতুন গান 'জন্মভূমি তোমায় নমি'। কল্যাণ সেন বরাটের সুরে শুভ দাশগুপ্তর লেখা গানটি গেয়েছেন ঝুমকি সেন। গান লঞ্চের দিন উপস্থিত ছিলেন শিল্পীরা স্বয়ং। খাঁচায় বন্দি একঝাঁক পাখি উড়িয়ে গানটির লঞ্চ হয়।